সোভিয়েত
প্রাচ্যের
একটি
গল্প

সোভিয়েত প্রাচ্যের দশটি গল্প

লেখক, চিত্রকর, সুরকার, অভিযাত্রী ও বিজ্ঞানী, সবাইকে অনেক শতাব্দী ধরে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছে প্রাচ্য জগৎ।

এখানে অজানার খোঁজ করেছে কেউ, কাউকে বা ভুলিয়েছে প্রাচ্যের বর্ণসম্ভার, খাপছাড়া প্রকৃতি ...

সোভিয়েত প্রাচ্যের লেখকেরা অনুরাগভরে নিজেদের অঞ্চলের জীবনচিত্র এঁকেছেন, তাঁদের দৃষ্টি কিন্তু সর্বদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুতে নিবদ্ধ — সে বিষয়বস্তু হল মানুষ — বিচিত্র যার ভাগ্য, সনাতন ঐতিহ্য ও কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত যে মানুষ মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য অবিরত লড়ে, যার অতীত অন্ধকার ও বর্তমান উজ্জ্বল, সেই মানুষ।

এ সংগ্রহের দশটি গল্পে ছাপ পড়েছে বিভিন্ন লেখকের; তাঁরা বিভিন্ন জাতিসত্তার লোক, তাঁদের চরিত্র ও পটভূমি ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকে পাঠককে নিজের একান্ত চিন্তাধারার ভাগ দিতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তু, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে গল্পগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। কয়েকটি গীতিধর্মী, কয়েকটিতে আবার সরস ব্যঙ্গের আমেজ।

আর্মেনিয়ার দেরেনিক দেমিরচান'এর লেখা প্রাচ্য কাব্য "চার্গাই" নিজের নামে সার্থক ("চার্গাই" হল আক্রমণের গান)। তুর্কমেনিয়ার নুরমুরাত সারিখানভ'এর "পুঁথি" মানুষের জ্ঞানের মতোই বিজ্ঞ ও দীপ্ত। রুশী লেখিকা ভেরা ইনবের'এর "নর-বিবির অপরাধ" এবং উজবেকিস্তানের আবদুল্লা কাহ্হার'এর "দৃষ্টিদান" অত্যন্ত ট্র্যাজিক। চুকচি লেখক ইউরি রীৎহেউ'এর "একটি মানুষের অদৃষ্ট" এবং বুরিয়াত লেখক দাশিরাবদান বাতোজাবাই'এর "তুমেনের গান" ইত্যাদি গল্প জনগণের প্রতি অনুরাগে ভরপুর।

এই দশটি গল্প প্রাচ্যের মানুষের মহিমা গান, তার নতুন ভাগ্যের জয়গান।

দশটি গল্প খুব বেশি না। কিন্তু উজবেক একটি প্রবাদ আছে: "চাখার জন্য এক পিপে মদ সাবাড় করার দরকার নেই — দু এক গেলাসই যথেষ্ট।"

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

ДЕСЯТЬ НОВЕЛЛ
ПИСАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ВОСТОКА

অনুবাদ: সমর সেন

সূচী

দেরেনিক দেমিরচান

দেরেনিক দেমিরচানের জন্মভূমি আর্মেনিয়া সূর্যালোক ও আঙুরের দেশ, ঝকঝকে স্বচ্ছ হ্রদ ও চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল রঙের দেশ।

দেরেনিক দেমিরচানের (১৮৭৬—১৯৫৬) প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গদ্য ও পদ্যে, নাটক ও ব্যঙ্গ রচনায় সমান হাত তাঁর। তাঁর কাছে রহস্যলোকের দ্বার খুলে দিয়েছে বিষণ্ণ স্মৃতিকবিতা ও উচ্ছল রুবাইয়াৎ, দুইই। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনায় দুটি গুণের সর্বাঙ্গীন ছাপ — দার্শনিকের প্রজ্ঞা ও শিল্পীর সাহস। একবার তিনি বলেন: "বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি জেনেছি যে সাহিত্য ও কলায় কুণ্ঠার স্থান নেই। ওরা হল বিদ্যুতের মতো, আর বিদ্যুৎ তো কুণ্ঠ হতে পারে না।"

কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ("ভার্দানান্‌ক" ইত্যাদি), সমকালের বিষয়ে অনেক ছোট গল্প এবং কয়েকটি দার্শনিক কবিতা লেখেন দেমিরচান। শেষোক্তদের সেরা বোধহয় গদ্য কবিতা "চার্গাই"।

চার্গাই

প্রাচ্য কাব্য

মরুভূমিতে ছন্দ এনেছে উটের দল, তাদের ভার বোঝাই পিঠ নৌকোর মতো দুলছে বালির তরঙ্গে।

যাত্রীরা মরুভূমিতে ক্লান্ত বিরস।

ক্যারাভানের মাথায় রয়েছে 'নার', দলের পাণ্ডা। দুলে দুলে রাজকীয় চালে চলেছে সে। তার পিঠে যৌবনোচ্ছল নিনগিল।

উটের পর উট — দোলন্ত পর্বতমালার মতো দেখতে।

তাদের গলার ঘণ্টাগুলো — সুন্দর, মুখর।

এ-ওকে ডাকছে ঘণ্টাগুলো মুখর প্রতিধ্বনি তুলে।

ঘণ্টাগুলো চলার তালে দুলছে। তাদের ধ্বনিতে যাত্রীরা যেন ঘুম পাড়ানিতে ঝিমিয়ে পড়ছে।

সবার আগে নিনগিল। সমুদ্রের ঢেউ'এর মতো এগিয়ে চলেছে তার উট। পরের উটের পিঠে বুড়ো ঘুমন্ত ইব্রাহিম খাঁ ক্রমশ ঝুঁকে, আরো ঝুঁকে পড়ছে।

বুড়োর পর ভারবাহী উট—পিঠে সুগন্ধি বস্তা, ফুলতোলা গালিচা — উঠছে, নামছে।

তারপর খাঁ-র গোমস্তা আলি নিজাম, ক্ষুদে চিমড়ে-পড়া বাঁদরের মতো।

তারি সঙ্গে তাল রেখে দুলছে কোঁচড়ানো কুচকুচে কালো দাড়িওয়ালা কের্মানশা'র সওদাগর হুসেন।

তাদের পিছনে বুড়ো বুর্হান; মুন্সী ও দার্শনিক সে, আগুনরঙা দাড়ি উদ্ধত, মাথাটা যেন আকাশ ছুঁয়েছে।

তার তালে তাল মিলিয়ে চলেছে সুইডেনের পারস্যাবিদ একজন, ভাষাতত্ত্বে তার দখল।

পিছনে আরো ভারবাহী উট আর মাল, আরো মানুষ আর গালিচা, আর দোলন্ত মুখর ঘণ্টা।

বুড়ো বেড়ালের মতো খাঁ'র চালশে-পড়া চোখ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই কিছুদিন আগে সে তেহেরানে গিয়েছিল চোখের চিকিৎসা ও তিনজন বিপ্লবীর ফাঁসি-কাঠে ঝোলা দেখার জন্য (ওরা তার গুদামে আগুন লাগায়)।

দম বন্ধ হয়ে গেল তিনজনের। লোকে বলে দৃশ্যটা দেখে খাঁ-র বেশ মজা লাগে — ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে তার, বাচ্চার মতো হেসে ওঠে সে। এ দৃশ্য দেখার পর তার মন কয়েক দিন দরাজ থাকে। আর লোকে বলে, তারও দম বন্ধ হয়ে আসছে — দম বন্ধ হয়ে আসছে কেল্লার মতো তার বাড়ির দুর্দান্ত প্রাচুর্যে, শত শত গালিচার রক্তলাল আগুনে, যাতে চোখ প্রায় ঝলসে যায়, আর চাষীদের হাত থেকে কেড়ে-নেওয়া গমের শেষ আঁটিতে, যে আঁটি পড়ে পড়ে পচে গোলায় — এটাও মাথা ঘামানের মতো ব্যাপার বটে ...

উটগুলো চলেছে দুলে দুলে, টুংটাং আওয়াজ তুলেছে দোলন্ত ঘণ্টাগুলো।

এক পিঠ থেকে অন্য পিঠে সওয়ারীদের মধ্যে চলেছে কথা।

'নিনগিল?' — আলি নিজামের গলা। 'ওর বাপ হল চাষা। ওকে দিতে চায়নি কিন্তু খাঁ নিয়ে নিল, ধারশোধ বলে। খাঁ নাকি ওকে ছেলের জন্য নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কে জানে?.. মেয়েটা অনেক কাঁদল কিন্তু চোখের জলে কী ফয়দা! মেয়েটা ফুলের মতো, ভোরবেলায় কাঁদে অস্তরাগে হাসে ... সিনেমা? আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু ওখানে ফতিমাবিবির সঙ্গে মুলাকাৎ হল। লাল হেজার'এ থাকে, বারো বছরের একটা লেড়কি আছে। খাসা মাল বটে!'

খিলখিল করে হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আলি নিজাম ছড়া কাটল:

মহব্বৎ যখন আসে শাহজাদীর মতো,
তখন শরমের ঠাঁই কই?

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। যাত্রীরা ছড়া শুনে যায়।

ঘণ্টাগুলো দুলছে, টুংটাং আওয়াজ।

আবার আলি নিজামের গলা:

'তিনজনকেই লটকে দিল। ব্যাপারটা দেখার আগ্রহ আমার ছিল না, কিন্তু খাঁ জোর করে বললেন ওঁর সঙ্গে যেতে হবে ... তিতিরগুলো — কী করে বলি — আসলে খুব মোটা ছিল না। কিন্তু বাবুর্চি কী করে ওরকমটা বানাল তা নিয়ে সারা সন্ধে আমরা অনেক মাথা ঘামাই... কে কে ছিল? সেই ফরাসী দালালটা, হুজুর আর মনসুর খাঁ। মদটা হুজুরের খাসা লাগে... সত্যি, খুব জমেছিল ... একটা বিপ্লবীর হাত কেটে ফেলল ... না, ও ডাক্তারের কাছে শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। চক পর্যন্ত গিয়ে রক্ত ঝরে মারা গেল। আর একটা আছে বাখতিয়ারিদের কাছে। ওকে ধরার জন্য ওরা ওর অন্য দোস্তকে ঘুষ দিয়েছে... হ্যাঁ ... আমি বললাম মোটরগাড়িতে ফিরে আসি, কিন্তু গাড়ির চেয়ে উট খাঁ-র বেশি পছন্দ। বাড়ির কাছে "শয়তানের কল" নিয়ে আসাটায় ওঁর মা'র আপত্তি। মা'কে খুব খাতির করেন। লোকটা সত্যি খুব ধার্মিক — খাঁটি পীর ... তা ছাড়া রাস্তাটা বড়ো এবড়োখেবড়ো — বাপঠাকুর্দার আমল থেকে একটুও বদলায়নি ... উটের পিঠে যাওয়া অবশ্য সহজ — আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো না করে ...'

দিনের সলতেটা পশ্চিমে টিমটিম করে উঠল, তারপর মারা গেল দিনটা।

শতাব্দীর মতো কুব্জপৃষ্ঠ তামাটে উটগুলো চলেছে তো চলেছে, অনেক যুগের প্রাচীন ও বিষণ্ণ গানের মুখর শব্দ তুলে।

ঢিং! একটা ঘণ্টা ডাকল অন্যটাকে!

ঢং! সাড়া দিল অন্যটা।

বাতাসে ক্ষুদে ক্ষুদে টুংটাং স্রোতের আলোড়ন।

শুয়ে শুয়ে উৎকণ্ঠায় ভাবছে পথটা।

নদীর মতো পথটা, সরু বিষণ্ন নদীর মতো। সহরে গ্রামে গিয়ে পড়েছে, দেশ দেশান্তরে নিয়ে চলেছে দুঃখ ও চিন্তার বোঝা। ক্রমশ চওড়া হয়ে সারা পৃথিবীতে তার বিস্তার। এ পথ ধরে এসেছে বিজেতারা, তারপর মিলিয়ে গেছে দিগন্তরে। কত উটের দল পথ পার হয়ে গিয়েছে, কত গম, গোলাপজল, খুর্মা, রেশম, বিষ, শীলমোহর দেওয়া মৃত্যুদণ্ড, প্রেমের অভিনন্দন। কত আশা, কত দুঃখ ...

নিনগিলের উটের পাশে হাঁটতে হাঁটতে রিজা ভাবছে। চুল উস্কোখুস্কো, গা ধুলোয় ভরা। পায়ের কড়ায় বালি আর পাথরের কামড়। জুতো ছিন্নভিন্ন, ফেনার মতো ফেঁসে গিয়েছে।

রিজা গজর গজর করছে নিনগিলকে নিয়ে:

'শেষ পর্যন্ত একটা কুত্তার হাতে পড়ল। কী আফসোস!' একবার আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রধান উটচালক জবাব দিল:

'নিজের চরকায় তেল দাও গে!'

রিজা ভবঘুরে, কাঁধে একটা থলে। ইঙ্গ-পারসীক তেল কোম্পানিতে সে কাজ করেছে, বান্দার বুশায়ারে কুলি খেটেছে, গিলানে মজুর ছিল। কিন্তু সবার ওপরে সে হল ভবঘুরে। এখন চলেছে উটের দলের সঙ্গে। কোথায়? অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যাবে — হয়ত নতুন দীপ্ত দিনে, হয়ত বা ফাঁসির কাঠগড়ায়। সে একা নয়। ইরানে হাজার হাজার লোক তার মতো ভবঘুরে, গল্প বলে সরাইখানায়। চাষীদের জীবন বা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প বানায় তারা। পয়সাওয়ালাদের পছন্দ নয় এসব গল্প, কিন্তু খাটিয়ে যারা, গরীব যারা তারা শোনে খুশি হয়ে। সোনালি আগুনের লেলিহান জিহ্বা স্পর্শ করেছে শস্যগোলা, রক্ত আর অশ্রুজলের স্রোত বয়েছে — তার গল্প। কথক আর শ্রোতা — দুজনেরই পক্ষে বিপদের খোরাক আছে গল্পগুলোয়।

উটচালক বেজার প্রকৃতির লোক, দুর্ভাগ্য আর সাংসারিক অভিজ্ঞতায় ঝানু। রিজার বিষয়ে সে সাবধান, কিন্তু তার উপর বিরক্ত নয়।

একটু পিছিয়ে পড়ে ইব্রাহিম খাঁ-র উটের পাশাপাশি চলল রিজা। ভুরুর

নিচ থেকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল খাঁ-র দিকে। খাঁ-র মুখটা চিমড়ে-পড়া বেগুনের মতো। খাঁ-র উটের পাশাপাশি চলল সে, চাঁদিটুপিটা মাথার পিছনে হেলানো, হাতজোড়া পিঠের দিকে মোড়া, চাষীসুলভ প্রকাণ্ড কপালে ঘামের বিন্দু — তিক্ত জ্বালা ধরানো বিন্দু।

তারপর চোখ বুজল রিজা। চোখ বুজে দেখল অস্বস্তিকর একটি দৃশ্য। দশ বছরের লেবুরঙা শীর্ণ একটি মেয়ে তুলো তুলছে জমিদারের ক্ষেতে। বড়ো চোখ ছাড়া মেয়েটার আর কিছু নেই — বাকি শরীরটা কঙ্কালসার। জ্বর তাকে শুষে নিয়েছে জোঁকের মতো, রেখে গিয়েছে শুধু চোখজোড়া আর বিষাদ। চোখজোড়ায় জীবন তৃষ্ণা, কিন্তু তাদের কালো দীপ্তি এরিমধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে মৃত্যুর ছায়ায়। বুড়িয়ে গিয়েছে মেয়েটি, যৌবন তার আসেনি।

রিজা যখন তাকে ক্ষেতে রেখে রওনা হয় ঘরমুখো, তখন তাকে এমন দেখায়। রাস্তার ধারে পাথরভাঙা একটা লোক চোখ ঠারে রিজাকে। দেশলাই চাইবার ছুতোয় রিজা তার কাছে গেল।

'গিলানিরা জেলখানায়। "উপকথাকে" ফাঁসি দিয়েছে... "শিখা" আর নেই... তুমিও চলে যাও...'

রিজার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। শুয়ে শুয়ে গোঙায়, কিন্তু সাহায্য চায় না। এক মাস ক্ষেতে যেতে পারেনি। মজুরি মেলেনি, মরণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মরণ আসছে মন্থর পায়ে, তাতে অন্যদের চেয়ে তার নিজেরি বেশি যন্ত্রণা।

মুরগী রাখার জায়গায় গেল রিজা। একটাও মুরগী নেই। দেয়ালের ফাটল থেকে তেলমাখানো একটা ছুরি বের করে থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখল সাবধানে। কিছু কালো তামাক নিল, নিম তেতো তামাক, তার জীবনেরি মতো। রুটির গামলাটা দেখল। খালি। কিছুক্ষণ ভাবল — এক যুগ ধরে ভাবল — তারপর স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করে রিজা কিছু ভেবে পেল না — বলার কথা এত ছিল। বেরিয়ে গিয়ে দারুণ বিতৃষ্ণায় মাটিতে থুথু ফেলল — সে মাটিতে তার জন্য সুখের ফুল কখনো ফোটেনি। বাড়ি থেকে চলে গেল।

সন্ধ্যা নামল। মজুরেরা সবাই যে যার ঘরে ফিরেছে। ঝরণাটার ধারে রিজা রয়ে গেল পা ধোবার জন্য।

সূর্য অস্ত গেল। মরচে-পড়া তামাটে সন্ধ্যা, তারপর মিশমিশে কালো। আর রিজা ঝাঁপ দিল রাত্রের অন্ধকারে, সুদূরে যাবে সে, বিপদসঙ্কুল সুদূরে।

যেতে যেতে মনে পাথরভাঙ্গা লোকের কথা আবার ভাবল:

"গিলানিরা জেলখানায়... 'উপকথাকে' ফাঁসি দিয়েছে... 'শিখা' আর নেই..."

জীবনের গ্রন্থি খুলে যেতে শুরু করেছে। এরপর তার পালা। তারপর অন্যদের, যারা এখন সহরে গ্রামে, ছিন্নবস্ত্রে ছন্নছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পাইপের বিষের মতো তিক্ত তাদের জীবন।

রিজা চলেছে, প্রাণ হাতে নিয়ে। চলেছে হয়ত রক্তঝরানো পথে। আর রক্ত তো জল নয়...

ঢিং ঢং... চমকে উঠল রিজা।

ধূসর বিষণ্ণ উটের পিঠে চেপে ভেসে চলেছে নির্নগিল অলৌকিক জিনিসের মতো, পিছু পিছু চলেছে রিজা, কর্কশ পথে পা ছড়ে যাচ্ছে।

কেন নির্নগিল এত মোহ ধরিয়ে দেয়, কেন রিজার ভেতরটা জ্বলে ওঠে? গনগনে আগুনের মতো উচ্চকিত নির্নগিল উচ্ছ্বাসে বাতাস ভরিয়ে দেয়, সেই জন্য? না, অন্য কোনো কারণে?

ক্যারাভানের ছন্দে সে দুলছে। উটের পিঠ থেকে ধনুকের তীরের মতো অসীম আগ্রহে সে এগিয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে, কী সুন্দর সে। উটের সাথে এক হয়ে গিয়েছে, অখণ্ড জিনিসটি এগিয়েছে কাব্যের মহিমায়।

রিজার দিকে চেয়ে নির্নগিলের মুখে হাসি, কিন্তু 'নার'টা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিস্তর সাজানো হয়েছে জীবটিকে, কিন্তু সমস্ত ভূষণ তার কাছে বিজাতীয়, ভূষণের নিচে ক্রোধের শিখা ধিকধিকিয়ে জ্বলছে। পিঠে সুমধুর বোঝা, গায়ে কত ভূষণ, কিন্তু কিছুতেই তার মনে আনন্দ নেই। সোনালি ঘণ্টা, রেশমের থোপনা — সমস্ত অলঙ্কারে সে বীতস্পৃহ...

গর্বিত সে, দৃঢ়ভাবে সে চলেছে মহাকালের মতো — সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ তার উপর, সে তাকায় না কারুর দিকে।

মাথা তুলে ঘোরাচ্ছে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে, আবার সুদূরে তাকিয়ে আছে, যেন গর্বিত কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা, যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হবে তার মুখ থেকে। চোখ থেকে ঘৃণা ছিটিয়ে পড়ছে তখন। বিদ্বেষভরে চলেছে সামনে, অন্তরে তার গোঙানি। কেন? বোঝা বা তাপের জন্য, না ক্ষুধার্ত ক্লান্ত সে? কেন তা জানা নেই। একবার গর্জে উঠল সে, সুদূরে ছড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার বছরের পুরোনো, ঘৃণার তিক্ত গোঁজান চাপা গর্জন।

সে গর্জনে কিন্তু বিশেষ একটা ছাপ ছিল — গভীর অগাধ বিষাদের ছাপ।

নিজের যন্ত্রণা জানাবার এই-ই একমাত্র উপায় 'নার'এর।

ভাষাবিদ উটটির দিকে ভালো করে তাকাল। ও কী বলছে তার পাঠোদ্ধার কি করা যায়, ধরা যায় ওর বিদ্বেষের কারণ?

মুন্সী-দার্শনিক, আগুনরঙা দাড়ি যার উদ্ধত, তাকে জাগিয়ে দিল ভাষাবিদ:

'উটটা এত মনমরা কেন, মির্জা?'

কথাটা কানে গেল না আগুনদাড়ির। সে সামনে তাকিয়ে ছিল স্বপ্নালু ঝাপসা চোখে।

তার হয়ে জবাব দিল সওদাগর:

'বোঝা বওয়া আর মনমরা হওয়া ছাড়া উটে আর কী করতে পারে?'

দুলে দুলে চলেছে উটগুলো, 'নার'এর ঘণ্টাগুলো টুংটাং করছে, দুলছে নির্নাগিল।

চোখ দিয়ে নির্নাগিলকে দেখিয়ে ভাষাবিদ আবার মুন্সীকে বলল:

'পিঠে কী মধুর বোঝা উটটা যদি জানত!'

আগুনদাড়ি দার্শনিকের মত কপচাল:

বিষণ্ণ রাত্রির শেষে
তার অন্ধকার ডানায় চেপে আসে দিন
গোলাপি হাসি মুখে, বেজায় ফুর্তিতে।
দোস্ত, এই তো হল জীবন ...

অল্প হেসে ভাষাবিদ ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করে বলল, "দোস্ত, এই তো হল জীবন ..."

আর আগুনদাড়ি আবার বলল:

নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ রাত্রি না থাকলে
ভোরের আনন্দ আশীর্বাদ জানত না মানুষ,
দোস্ত, এই তো হল জীবন ...

ভাষাবিদ জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে শুধু যন্ত্রণার পরে আনন্দ পায় জীবন? এটা হেঁয়ালি, মির্জা।'

বিদ্রূপভরে হাসল মির্জা:

কে জানে দুঃখের মধ্যে
জীবন কেন হাসে?
আর যন্ত্রণা পায়
আনন্দের মধ্যে?

ঢিং ঢং আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলল ক্যারাভান।

মির্জা বলল:

আগুন-ফুল যিনি বানান
তিনি গোপন বিষে সেটা ভরান,
সুন্দর হবে বলে। ভেবে দেখো,
সমস্ত সুন্দর জিনিসে কিছু না কিছু বিষ আছে!
বেপরোয়া হাসিতে অশ্রুজলের স্বাদ,
সূর্যালোক আসে অশ্রুমেঘ ভেদ ক'রে।
হাসি কান্নার মিশেল না হলে
জীবনে থাকবে না কোনো সৌন্দর্য ...

আর ক্যারাভান এগিয়ে চলল, দুলে দুলে, ঘণ্টার আওয়াজ তুলে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল মরুভূমি। রিজার কণ্ঠস্বর সেটা। অনেকটা সামনে এগিয়ে সে গলা ছেড়ে গাইছে।

যাত্রীরা তার গান শুনতে লাগল।

এটা 'চার্গাই' — আক্রমণের গান। তাই এ গান এত ভয়ালভাবে সামনে এগিয়ে চলে। এ গানে ক্রোধ আর গর্জন, আঘাত ও বেপরোয়াভাব। এ গান ভয়ঙ্কর, যুদ্ধের আহ্বান এতে।

এ গান শুনে ক্যারাভান চলে অন্যভাবে। অন্যভাবে ঘণ্টাগুলো বাজে — ঢং ঢং... অন্যভাবে দুলে দুলে চলে উটেরা।

তার ভয়ঙ্কর গান শেষ করল রিজা পরিহাসের সুরে। তারপর ক্রুদ্ধভাবে গুমরে উঠে থুতু ফেলল। রাস্তায় ক্যারাভানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল:

'গিলানিরা জেলখানায়, "উপকথাকে" ফাঁসি দিয়েছে, "শিখা" আর নেই... হায় নির্নাগিল!..' নির্নাগিলের দিকে চেয়ে চোখদুটো ঝলকে উঠল।

'কী গাইছিস, দোস্ত?' জিজ্ঞেস করল আলি নিজাম।

'এই একটা গান...'

'চোর ডাকাতের গান।'

'হতে পারে। তবু পথের গান তো। হাঁটছি তো হাঁটছি পথের আর শেষ নেই, গাইলে মনে হয় রাস্তা ফুরিয়ে গেল।'

দম্ভের একটা হাসিতে আলি নিজামের পাপদুষ্ট নাক কুঁচকে উঠল:

'রাস্তার শেষ কেন চাস? হেঁটে চল্।'

'তুমি উটের পিঠে, তাই পরোয়া কর না। মাটিতে নামলে টের পাবে।'

'হাঁটায় দোষটা কী শুনি?'

'কিছু না। জুতো মোজা বিলকুল ক্ষয়ে যায়, পায়ের চামড়া বেরিয়ে পড়ে।'

'ক্ষয়ে যাক, নতুন চামড়া আবার গজাবে।'

'শেষ পর্যন্ত দিল ক্ষয়ে যায়, আর দিলের চামড়া বলে কিছু নেই।'

'তাহলে দিলও ক্ষয়ে যাক। দিল নিয়ে তোর কী হবে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল আলি নিজাম, তার অনুসরণ করল কের্মানিশা'র সওদাগর হুসেন।

আর ক্যারাভান এগিয়ে যেতে লাগল, ঘণ্টাগুলো দোলন্ত, মুখর।

'অনেক হয়েছে!.. এবার তাঁবু খাটানো যাক!' বলল ইব্রাহিম খাঁ। ক্যারাভান সাধারণত রাত্রে চলে, কিন্তু খাঁ-র বিশ্রাম দরকার। রাত্রের ঠাণ্ডায় রসিয়ে রসিয়ে কফি খেতে হবে, ঘুমিয়ে নিতে হবে একঘুম। প্রাসাদ এখনো অনেক দূরে।

প্রধান উটচালক 'নার'এর লাগাম টেনে ধরে রাখল। ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে অন্যান্য উটগুলো দল পাকিয়ে থামল। শেষ হল ঘণ্টার গান। শুধু মাঝে মাঝে শব্দের এক একটা ফোঁটা ঝরছে বালিতে।

'বোস্!'

হাঁটু গেড়ে বসল উটগুলো, ছোট ছোট পাহাড়ের মতো।

ক্লান্তিতে নিদ্রালু যাত্রীরা নামল বালিতে।

রাস্তা ছেড়ে তারা একটা জায়গায় কম্বল আর মাদুর বিছোল বালিতে। ইব্রাহিম খাঁ-র জন্য তাঁবু পাতা হয়েছে।

'নার'এর পিঠ থেকে সহজ ভঙ্গীতে নির্নাগিল নেমে খাঁ-র তাঁবুর গালিচা-বিছানো ফুলের বাগানে ঢুকল। তাঁবুটা হাত বাড়িয়ে গ্রাস করল তাকে।

যাত্রীরা — আগুনদাড়ি, আলি নিজাম, সওদাগররা আর সুইডেনের ভাষাবিদ বসল আগুন ঘিরে।

একটু দূরে আস্তানা গাড়ল উটচালকেরা।

নিস্তব্ধতা। কান পেতে আছে মরুভূমি। শুধু জপমালার খুটখুট শব্দ। আগুনের হিসহিসানি।

'নার'কে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। দড়ি দিয়ে চাবকে ওরা ওকে হাঁটু গেড়ে বসাবার চেষ্টা করল, কিন্তু উটটা ছটফটিয়ে গর্জাতে লাগল।

'হাঁকছে এমনভাবে যেন ভয়ানক লাগাতে চটে আপত্তি জানাচ্ছে, প্রতিবাদ জানাতে চায়। গলায় কী একটা অশান্তি ফুটে উঠেছে,' ভাষাবিদ চিন্তা করে বলল।

কের্মানশা'র সওদাগর হুসেন নিজের বোঝায় হেলান দিয়ে বসে বলল, 'অশান্তি নয়। পিঠে বোঝা থাকুক না থাকুক, পেট ভরা বা খালি থাকুক, উট গর্জাবেই। গর্জন শুধু,' ধোঁয়া বুক ভরে নিয়ে তারপর ছেড়ে আবার বলল, 'আর কিছু নয়। কখন যে গর্জাচ্ছে সেটা পর্যন্ত ওরা জানে না। এমন কি নিজেদের গর্জন ওরা শোনে না পর্যন্ত।'

'কিন্তু ওটা কিছু একটা চাইছে,' ভাষাবিদ বলল।

অন্য এক সওদাগর জপমালা ঘোরাতে ঘোরাতে তারি সঙ্গে মাত্রা রেখে কথাগুলিকে সাজিয়ে যেন বলল:

'হাজার হাজার বছর কিছু চেয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না কী। ক্যারাভানের সঙ্গে ঘুরেছে হাজার হাজার বছর। উটের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় ওরা কী চিজ আমরা জানি। কিন্তু ওদের জানে না কেউ। কিছু বলা যায় না ওদের বিষয়ে...'

জপমালার খুটখুট শব্দ।

'উট হল চুপচাপ জানোয়ার, কখনো আপত্তি জানায় না। গর্জনটা ওর অন্তরের জিনিস নয়। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস না জিরিয়ে, খাবার না চেয়ে উট চলে। কোনো খাঁক নেই, চুপচাপ। মনের কথাটা কখনো প্রকাশ করে না... দেখে মনে হবে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। ওদের ঘুম মানে একটুখানি গড়িয়ে নেওয়া শুধু। এমন কি মারা যাবার সময়েও নিজেকে ধরা দেয় না উট। পা মুড়ে বসে বালিতে গলা রেখে একবার কাতরায় — ব্যস, সব শেষ...'

মন দিয়ে কথা শুনে ভাষাবিদ জিজ্ঞেস করল:

'বোধহয় গর্ব আছে?'

'কে জানে।'

'কিন্তু ওদের মনে নিশ্চয়ই কোনো দুঃখু আছে। কী বলো, মির্জা?' — আগুনদাড়িকে প্রশ্ন করল ভাষাবিদ।

জপমালার গুটি ঘোরাচ্ছে মুন্সী, যেন সেগুলো তার চিন্তার গুটি। ধীরেসুস্থে বলল:

'উটের দুঃখ অস্পষ্ট ব্যাপার — কেউ কিছু জানে না। জখম হয়েছে উট। অদৃষ্টের হাতে ভয়ানক একটা চোট খেয়েছে। কিন্তু কে কখন ওকে জখম করেছে সেটা মনে নেই ওর...'

স্তব্ধতায় মিশিয়ে গেল মির্জার চিন্তাধারা। শুধু তার জপমালার খুটখুট।

অনেকক্ষণ ভেবে ভাষাবিদ উপসংহারে বলল:

'উটের চেহারায় কিন্তু বিষণ্ণতার একটা মহিমা আছে।'

'সেটা হল মরুভূমির মহিমা,' অনুচ্চকণ্ঠে বলল মির্জা।

আগুনের কোঁকড়া চুল নিয়ে ফুরফুরে হাওয়ার খেলা। মরুভূমির বুকে ছায়ার নাচন, মখমল আকাশে তারার সূচীকাজ ফুটে উঠল।

'উট বোকা জানোয়ার,' উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল আলি নিজাম।

যাত্রীরা জেগে উঠে আলি নিজামের দিকে চেয়ে দেখল।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'বোকা?'

'রাম বোকা। হাজার হাজার বছর এক দলের পর অন্য দল কাজ করেছে, কিন্তু এখনো কাজটা সয়ে যায়নি, মেনে নেবে না। কী কাজ উটের? বোঝা বওয়া। কিন্তু পিঠে বোঝা তুলছে বা নামানো হচ্ছে, ওরা গজর গজর করা ছাড়বে না, ছটফটানি সব সময়। ওদের একমাত্র আগ্রহ হল যাত্রার আগে নিজেদের তাজ্জব পেট পুরে যত সম্ভব খাবার নেওয়া। আদর যত্নে কোনো সাড়া দেয় না। মনিবের প্রতি কোনো টান নেই, পিঠে কে চেপেছে,—মনিব না অচেনা লোক, তার পর্যন্ত হুঁশ নেই। পিঠ থেকে লোককে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে না অবশ্য, ততটা বুদ্ধি বা চালাকি ওদের নেই। কিন্তু সওয়ারী

পড়ে গেলে থামে না, ফিরে তাকায় না, এগিয়ে যায় শুধু। যেদিকে হোক, কে ধরল তাতে কিছু এসে যায় না... কিন্তু অবাক কাণ্ড — পিঠে চড়ার সময় ওরা বারবার ঘাড় বেঁকিয়ে কামড়াবার চেষ্টা করে, তাই মাথায় জোর ঘা দিতে হয় যাতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়...'

সওদাগরদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল:

'কিন্তু উট বেশ খাটিয়ে জানোয়ার আর নিরীহ।'

'নিরীহ?' হায়েনার মতো মুখ বেঁকাল আলি নিজাম। 'বোকা বললে মানতে রাজী, নিরীহ — না!'

আবার নিস্তব্ধতা। মরুভূমি গভীর চিন্তায় মগ্ন।

জপমালার খুটখুট শব্দ।

আগুনদাড়ি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল:

মরুভূমিতে জীবন আসে উটের দৌলতে।
কিন্তু উট আর জীবন কি এক নয়?
তা না হলে মানুষের গড়া সহর ও গ্রাম
অবলুপ্ত হত বালির জোয়ারে।

'অদ্ভুত জানোয়ার কিন্তু,' বলল ভাষাবিদ।

একজন সওদাগর বলে উঠল:

'মানুষের মতো আর কি — নিজেদের মনমর্জি আছে।'

'মজুরের মতো,' ঘৃণায় দাঁত কড়মড় করে বলল আলি নিজাম।

অন্ধকারে কে যেন নড়ে উঠল। পাশের আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে উঠল রিজা।

'মজুরের মতো — এতে কোনো অপমান নেই, বরঞ্চ মিল আছে।'

রিজার গলার স্বরটা কেমন ফাঁপা-ফাঁপা, যেন জেলখানার দেয়াল ভেদ করে আসছে।

একটা দেশলাই জ্বলে উঠল, হলদে আলোয় দেখা গেল রিজার কঠোর বেপরোয়া মুখ।

চাওয়া-চাওয়ি করল সওদাগররা, কিছু বলল না। আবার উটের কথা বলে চলল :

'সইবার ক্ষমতা আছে উটের। তাই হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

'কেন?'

'থুতু ছেটাতে পারে। আর ওদের থুতুতে বিষ।'

'বিষ নেই, বদখত জিনিস শুধু,' বলল আলি নিজাম।

'দেখো একবার,' 'নার'কে দেখিয়ে বলে চলল সে, 'জানোয়ারটাকে এত জোরে মেরেছিলাম যে দুদিন ধরে হাত ঝনঝন করছে।'

'কেন মারলেন?'

'ওর পিঠে মাল চাপায়। খাঁ-র সামান। বেটা কিছুতেই দাঁড়াবে না। মজুরের মতো। মাথায় বেশ জোরে একটা ঘা কষাতে হয় প্রথমে।'

রিজার দিকে কটমট করে তাকাল আলি নিজাম।

রিজা ধূমপান করছে। আঁকাবাঁকা তিক্ত রেখায় চঞ্চল আবছা ধোঁয়া মুখ থেকে বেরিয়ে একটু ইতস্তত করে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

আপন মনে যেন সে বলল, 'শেষের সেই আকালের বছর মনে আছে? অনেকে বেশ টাকা পেটে সে সময়। ইব্রাহিম খাঁ গর্তে রেখে দু হাজার "খালভার" গম পচায়। গোলাভরা গম, এত গম যে রাখার জায়গা ছিল না। ওদিকে মাছির মতো গাদা গাদা লোক মরছে ...'

রিজা থামল।

'তুমি দেখছি খাসা রূপকথা বলতে পারো,' বিদ্বেষের হাসি হেসে আলি নিজাম অন্ধকারে যেখানে রিজা সেদিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল।

'কিছু গল্প বলেছি বটে।'

'কিছু "আগুনের গল্পও" বলেছ নিশ্চয়ই?'

'সে আবার কী? কখনো শুনিনি।'

'শুনবে, তেহেরানে শুনবে।'

সওদাগরদের চোখ ঠেরে হেসে উঠল আলি নিজাম। তারাও হাসল।

'"আগুনের গল্প" জিনিসটা কী?' জিজ্ঞেস করল ভাষাবিদ।

আলি নিজাম আক্রোশে ফুঁসে উঠল।

'গল্পের শুরু গমের গোলায়, শেষ গলার ফাঁসে। ডাকাতগুলো সারা ইরানে ঘুরে বেড়ায়, খাঁ-র গোলার কাছে বসে চাষীদের রূপকথা শোনায়। গল্পগুলো যে আগুন ছিটোয় তাতে গোলাগুলো পোড়ে। বেল্লিক সব!'

বাঁদরমুখ বেঁকিয়ে শাপান্ত করল আলি নিজাম।

রিজা চুপচাপ। মরুভূমিও।

জপমালার খুটখুট শব্দ।

ক্যারাভান ঘুমিয়ে পড়েছে।

মরুভূমি অন্ধকার, সে অন্ধকারে রূপকথা সঞ্চারিত ছায়ার মতো। উটের বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

মরুভূমি অন্ধকার।

মরুভূমি যেন বিরাট একটা হাঁটুগাড়া উট, তার কালো বিষণ্ণ কুঁজ বিঁধেছে আকাশে।

রাত্রির টাকু ঘূর্ণমান — ফিসফিসানি শুরু হল মরুভূমির।

পৃথিবীর উপরে মাথা তুলল হলদে চাঁদ, যেন কবর থেকে উদ্গত।

আকাশের গায়ে 'নার'এর কালো ছায়া। পা মুড়ে ঘুমোয়নি সে। ভবিষ্যদ্বক্তার মতো গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে দেখছে কালের যাত্রা।

আলি নিজাম গেল গালিচার সেই বড়ো তাঁবুটার দিকে যেখানে খাঁ ও নির্নাগিল নিদ্রিত। ঢোকবার জায়গাটার কাছে এল। সেখানে শিকারী কুকুরের মতো পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে খাঁ-র চাকর মাহ্মেদ।

থেমে, তাঁবুতে মুখ লাগিয়ে আলি নিজাম কান পেতে শুনতে লাগল, খাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু আলি নিজামের মনে হল নিশ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজের সঙ্গে একটা ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। শুনে শুনে হিংসে হল

তার, অবাক-করা মধুর একটা হিংসে আর অদম্য কৌতূহল তাকে অভিভূত করে দিল। আবার কান পেতে শুনল।

কিন্তু বিবর্ণ চাঁদের আলোয় সমস্ত আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

বালিতে বসে পড়ল আলি নিজাম। তার মনে পড়ে গেল তেহেরানে একটা সন্ধ্যার কথা; সেটা কাটে একটি তরুণীর সঙ্গে। মনে পড়ল তার দেহের উষ্ণতা ...

একজোড়া প্রকাণ্ড চিমটে আলি নিজামের ঘাড়ে বিঁধে চাপ দিল। 'নার'এর দাঁত। আর্তনাদ করে উঠল আলি নিজাম — আর মরুভূমি ঝট করে সরে গেল, ঘুরপাক দিয়ে উঠল আকাশ, তারাগুলো নেমে এল পায়ের নিচে, মাটি গেল উপরে উঠে।

তার ক্ষুদে বাঁদর শরীর কিলবিলিয়ে ঝটকা দিয়ে তারপর ঝুলতে লাগল উটের মুখ থেকে।

অবশেষে বেশ জোরে একবার ঝাঁকিয়ে উটটা তাকে মাটিতে নামিয়ে চুপ করে দাঁড়াল আগের মতো।

ক্যারাভানের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল লোকজন। উটচালকেরা আর খাঁ-র চাকরবাকর ঝাঁপিয়ে পড়ল উটটার ওপর। উটটা নিথর বেজার। সবাই মারতে শুরু করেছে, নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

দৌড়িয়ে এল প্রধান উটচালক। 'নার'এর ঘাড় জাপটে ধরে, যারা মারছিল তাদের ভয়ানক গালি দিল সে। চাকরদের সঙ্গে দারুণ হাতাহাতি শুরু হল তার। তাকে আর 'নার'কে মেরে চলেছে, মুষ্টিবৃষ্টির মাঝে সে বুনো জন্তুর মতো দাঁত খিঁচোতে লাগল, হাঁফ ধরে যাচ্ছে, আর্তনাদ করে উঠছে।

ছুটে বেরিয়ে এসে আতঙ্কে তাকিয়ে রইল নিনগিল, কেন উটটাকে মারছে সে বোঝেনি।

কুঠার হাতে লাফিয়ে উঠল খাঁ-র খাস চাকর মাহ্‌মেদ। গাল তার কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। প্রধান উটচালককে লোকে টেনে নিয়ে গেল।

গরিলার মতো হেলতে দুলতে এসে মাহ্‌মেদ দারুণ জোরে উটটার মাথায় বসাল কুঠারের ঘা।

নিঃশব্দে পা মুড়ে বসে পড়ল উটটা।

রাগের উচ্ছ্বাসে তাকে মেরে চলল মাহ্‌মেদ।

উটটার সাড়াশব্দ নেই — মরে গিয়েছে। তাতে মনে হল মাহ্‌মেদের রাগ আরো প্রবল। কুঠারের ঘা'র শেষ নেই। যত জোরে পড়ছে কুঠারের ঘা তত বীভৎস দেখাচ্ছে উটটার দেহ।

আর সবাই বুঝে ফেলল, যে মারছে সে জেতেনি। পরাজিত হয়নি 'নার', শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিরোধ জানিয়েছে নিজস্ব একটা ধাঁচে। বিষণ্ণ, নিঃশব্দ, বীভৎস থেকেছে; ঘৃণায় আকণ্ঠমগ্ন।

'নার'এর ঘণ্টাগুলো ভেঙে চুরমার, বালিতে শব্দ ঝরিয়ে দম আটকে থেমে গেল তাদের গান।

গা ছড়িয়ে নিস্পন্দ বীভৎস শুয়ে আছে উটটা, স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ মিশেছে ভিজে বালির গন্ধের সঙ্গে।

কাপড়ে জড়ানো হল আলি নিজামের লাসকে। মামির মতো দেখাচ্ছে তাকে।

'শালা জানোয়ার!' কুঠারধারী বলল গরগর করে। 'চুপ করে থাকে শালা জানোয়ার!'

সওদাগরদের কে একজন বলল, 'কখনো কিছু বলেনি, কিছু জানতে দেয়নি, অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল।'

'কিন্তু কী হয়েছিল! কেন এমন করল?' অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ভাষাবিদ।

'প্রতিহিংসার ব্যাপার — শোধ তুলেছে উটটা।'

কথাটা বলল রিজা।

... সেখান থেকে সরে গেল ক্যারাভান। মসৃণ মরুভূমিতে কালো বিমর্ষ টিলার মতো পড়ে রইল উটের মৃতদেহ।

নুরমুরাত সারিখানভ

প্রাচীন কাব্য সংস্কৃতির দেশ তুর্কমেনিস্তান মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পাহাড় আর সাকসাউলভরা মরুভূমির দেশ।

তুর্কমেন কবিতার তুলনায় গদ্যের বয়স অনেক কম। এর জন্ম অক্টোবর বিপ্লবের পরে শুধু। প্রতিভাবান ছোট গল্প লেখক নুরমুরাত সারিখানভ তুর্কমেনিয়ার প্রথম গদ্য লেখকদের একজন।

গেওক-তেপে গাঁয়ে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম ১৯০৪ সালে। লেখাপড়া করেন নামমাত্র, কোনোক্রমে পড়তে শেখেন। আসল শিক্ষা পান বিপ্লবের পরে।

সারা জীবন বিদ্যা ও মুদ্রিত অক্ষরের শক্তির বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করে এসেছেন।

"পুঁথি" অনেকটা আত্মজীবনীমূলক। ভেলমুরাত-আগার ছেলের অদৃষ্ট হল স্বয়ং সারিখানভের অদৃষ্ট। ভেলমুরাত-আগার মতো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বই'এর প্রতিটি শব্দ হল অমূল্য, কিম্বা বৃদ্ধের ভাষায় — "এক একটি মাদী-উট আর তার বাচ্চার সমান।"

মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে সারিখানভ ফ্রণ্টে লড়েন, উক্রেন ও মলদাভিয়ার মুক্তিতে যোগ দেন।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা মে যুদ্ধে বীরের মতো তিনি নিহত হন। মলদাভিয়ায় তাঁর সমাধি।

পুঁথি

১

পুরোনো পুঁথিপত্রের সন্ধানে দেশে ঘুরে বেড়াবার ভার আমাকে দিয়েছে সাহিত্য ইনস্টিটিউট। কারা-কুম মরুভূমির গভীরে ঢুকে শেষ পর্যন্ত একদিন এসে পড়লাম বালির মধ্যে নিচু জায়গায় কোনোক্রমে মাথা-গোঁজা একটা পশুপালন গাঁয়ে।

আমার আসাতে কৌতূহলের সৃষ্টি হল, সচরাচর যেমন হয়। আমি লোকটা কে, এসেছি কোথা থেকে, আর কেন এসেছি — সবায়ের জানার আগ্রহ। বললাম তাদের। গাঁয়ের যে যৌথখামার সভাপতির সঙ্গে ছিলাম সে বলল আমি যা চাইছি ঠিক সেরকম বই আছে বুড়ো ভেলমুরাত-আগার কাছে।

'দুর্লভ রত্ন। সবাই প্রশংসা করে। আমি নিজে পাঠ শুনেছি। ভেলমুরাত-আগা বলে সোনার বাক্সে বইটা রাখা উচিত। আর কী কষ্টে না ওটা জোগাড় করেছে! এখানকার সবাই জানে কেমন করে বইটা কেনে ভেলমুরাত-আগা। তবে একটা কথা বলি, বুড়ো বইটা নিয়ে পাগল, যাই দিন না কেন হাতছাড়া করবে না।'

ঠিক কী ধরনের বই, সেটা খুলে বলল না সভাপতি। জিজ্ঞেস করে যা জানলাম তা হল এই যে, 'দুর্লভ রত্ন'টির প্রতি বৃদ্ধের গভীর আসক্তি আছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে মরুভূমির এই সব লোকদের কাছে বই হল

সাংঘাতিক মূল্যবান জিনিস। নিরক্ষর হলেও বই হাতছাড়া করে না এরা। বলে, আমরা না হয় পড়তে পারি না, কিন্তু ছেলেরা বড়ো হয়ে পড়বে।

ভেলমুরাত-আগার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে বাড়িতে পেলাম। দীর্ঘাকৃতি সৌম্য বৃদ্ধ, চকচকে চিবুক থেকে খাসা দাড়ি আবক্ষ নেমেছে। বেশ সদয়ভাবে আমার সম্বর্ধনা করল বটে, কিন্তু চোখে জিজ্ঞাসার একটা চিহ্ন রয়ে গেল, আমার হাবভাব ও কথা বলার ধরনের উপর নজর রাখার ত্রুটি হল না।

'আগুনের আরো কাছে এসো, ছোকরা,' বলল আমাকে। আমি আগুন থেকে বেশ দূরে ফেল্ট গালিচার উপর বসতে যাচ্ছিলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নাদি শুরু হল।

'কোত্থেকে আসা হয়েছে?'

উত্তর শুনে তার কৌতূহল জাগল, বলল সে কখনো আশ্‌খাবাদে যায়নি।

'কোথায় তোমার জন্ম? কোন উপজাতির লোক? বাপ-মা কোথায় থাকেন? কী করো?'

আমার জন্ম ও জীবনের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম পুরোনো বই'এর সন্ধানে আমাকে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাঠিয়েছে।

'বেশ, বেশ,' প্রশংসাসূচকভাবে বৃদ্ধ বলল।

সুন্দর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে একাগ্রভাবে আমাকে দেখতে লাগল বৃদ্ধ, যেন মুখ দেখে জানতে চায় আমার মতলব কী। স্তেপভূমির শিকারীর মতো ধারালো চোখ। শেষ পর্যন্ত মনে হল একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছে। গৃহিণী ব্যস্তসমস্তভাবে বাড়ির কাজে এদিক ওদিক ঘুরছিল, তার দিকে ফিরে সংক্ষেপে বলল:

'আমাদের বইটা আনো তো।'

তাঁবুর ভেতর দিককার একটা খুঁটিতে ঝোলানো গালিচার একটা পুরোনো থলের কাছে বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়ে বৃদ্ধা হাত অনেকখানি ঢুকিয়ে

সিল্কের রুমালে মোড়া একটা বড়ো মোড়ক বের করল। সযত্নে মোড়ক খুলে গাম্ভীর্যসহকারে বইটা দিল স্বামীকে, যেন জিনিসটা পূত স্মৃতিচিহ্ন। আর একবার বুড়ো ভেলমুরাত-আগা তীক্ষ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল।

'তোমার কাজের কথাটা যদি ঠিক বলে থাকো,' বৃদ্ধ শুরু করল, 'তাহলে এর মূল্য বুঝবে এখ্খুনি। আর তখন তোমার মূল্য ধরা পড়বে আমার কাছে। এই নাও, দেখ।' বইটা আমাকে দিয়ে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল:

'বলো তো, এর মতো জিনিস দেখেছো কখনো? এটা হল ... তুমি নিজেই দেখ... প্রত্যেকটা কথা এক একটা মাদী-উট আর তার বাচ্চার সমান।'

বড়ো, ভারি বইটা রঙচটা কাপড়ে বাঁধাই, টকটকে লাল ফুলের নক্সার রেশ তখনো রয়েছে। প্রত্যেক পাতায় সুস্পষ্ট আরবী অক্ষরে চেরি-লাল রঙে গোটা বিশেক লাইন। নকল যে করেছে সেই লিপিকার নিজের বিদ্যায় পারদর্শী সন্দেহ নেই, আর কাজটা করেছে ফাঁকি না দিয়ে। অক্ষরগুলোর মধ্যে সমান ব্যবধান, মটরশুঁটির মতো গোটা গোটা সেগুলো। বইটা পড়া হয়েছে অনেকবার। পাতাগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে, অগুনতি আঙুলের কালো ছাপ নিচের কোণগুলোতে। বছরের পর বছর প্রত্যেকটা লাইনে আঙুল বুলিয়েছে কত লোকে, তাদের সংখ্যা শত শত।

সাগ্রহে পুঁথিটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে এখানে-সেখানে দু একটা লাইন পড়তে লাগলাম। ঠিক যা চাই তাইই — এরি মতো দুর্লভ জিনিসের জন্য আমার পেশার লোকেরা এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে হন্তদন্ত হয়ে যায়, হাজার হাজার দরজায় করাঘাত করে, কাটায় বিনিদ্র রাত্রি। হয়ত আরো অনেক গ্রামে গিয়ে কত দোরে টোকা দেবার পরও আমার মনের মতো এরকম একটা পুঁথি মিলত না।

মনের আনন্দ চাপার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু শীগগিরই টের পেলাম যে তার রত্নের মূল্য বিষয়ে বৃদ্ধের বেশ টনটনে জ্ঞান। আবার সে বলল, "প্রত্যেকটা কথা এক একটা মা-উট আর তার বাচ্চার সমান। যেখানেই যাও এরকমটা আর পাবে না।" তাকে পরীক্ষা করার জন্য যথাখুসি কয়েকটা

জায়গা চেঁচিয়ে পড়লাম আর প্রত্যেকবার প্রথম দশটা লাইন শুনে পরের শ খানেক লাইন মুখস্থ বলল সে; কবিতা একটা হয়ত শুরু করলাম, শেষ করল সে। প্রত্যেকটার পর জিজ্ঞেস করল:

'কী, আমাকে বিশ্বেস হচ্ছে তো এখন? সত্যি বলিনি যে বইটা সোনার বাক্সে রাখা উচিত?'

ভাবাবেগে, কখনো স্বর তুলে কখনো নামিয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করল বৃদ্ধ — তার প্রিয় কবিতা নিশ্চয়ই।

'বলো তো কেমন কবিতা? যত পড় তত গেঁথে বসে। পড়ে দেখ একবার, প্রত্যেকটা কথা এক একটা মাদী-উটের সামিল।'

প্রতিবাদ করলাম না। বৃদ্ধ যা বলছে একেবারে ঠিক। শুধু ভাবতে লাগলাম, বইটা ওর কাছ থেকে কিনি কী করে? জিনিসটা পেতেই হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতি কথার জন্য এক একটা মাদী-উট আর উটের বাচ্চা, অত উট পাই কোথায়? তাছাড়া কথাটা তুলি কী ভাবে? বই'এর প্রশংসায় শতমুখ বৃদ্ধ বসে আছে। মনে হল তার স্ত্রীও বইটা নিয়ে পাগল। আর বৃদ্ধের কথা শুনলে মনে হয় না যে ওর গাঁয়ের লোকেরা এমন একটা দুর্লভ জিনিসকে কোনো আগন্তুকের হাতে চলে যেতে দেবে। আমার আশা উবে যেতে লাগল। অন্যান্য জায়গায় কেনা দুর্লভ সব বই'এর কথা ভাবলাম। কয়েকজন নিজেদের বইগুলোকে বেশ মূল্যবান মনে করত, কিন্তু এরকম তীব্র আবেগ কখনো দেখিনি। বুড়ো ভেলমুরাত-আগা নিজের বই'এর প্রশংসায় এত মুখর যে আমাকে ধারঘেঁষে কোনো কথা বলতে দেবে না। ঠিক করলাম সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই ভান করা যে সত্যিসত্যি বইটাতে আমার অত আগ্রহ নেই। বিষয় পরিবর্তনের জন্য জিজ্ঞেস করলাম তার গ্রামের লোকেরা সত্যি কি আমু-দরিয়ায় গিয়ে সেখানে স্থায়ী কৃষি জীবন যাপনের সংকল্প করছে? প্রশ্নের জবাব দিয়ে আবার বইটার কথায় ফিরে এল বৃদ্ধ। প্রায়ই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ওটা ধার নিতে আসে আর

সবাই বইটার তারিফ করে। বইটা যে তার এ নিয়ে তার খুব গর্ব, কখনো এটা হাতছাড়া করবে না সে।

উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম।

সভাপতির বাড়িতে ফিরে আমার হয়রানির কথা স্বীকার করলাম।

'কী ভাবে ওকে বাগাই জানি না,' বললাম। 'বলুন তো, কী করে ওকে বাগে আনা যায়। আমার মনে হয়, বই বেচা তো দূরের কথা, আমাকে নকল পর্যন্ত করতে দেবে না।'

কিন্তু বিশেষ ভরসা দিতে পারল না সভাপতি।

'বই বেচার উপদেশ দেব, এমন সাহস আমাদের কারো নেই। যদি ওটা আপনার এত দরকার তাহলে নিজে ভেবে দেখুন কী করে ওকে বোঝানো যায়। প্রথম থেকেই আপনাকে সাবধান করেছি, করিনি?'

একটা জিনিস শুধু আমি জানতাম — হাল ছেড়ে দেব না কিছুতেই। সে দিন সন্ধ্যায় আবার গেলাম ভেলমুরাত-আগার কাছে। আবার সদয় অভ্যর্থনা জানাল সে।

'এসো হে, ছোকরা। আগুনের কাছে বসো। জানি আমার বই যে একবার দেখেছে সে এত সহজে আমার কাছ থেকে চলে যাবে না। তুমিই এই প্রথম নও, আর শেষও নও।'

থলেতে হাত ঢুকিয়ে সিল্কের সেই রুমালটা টেনে বইটা বের করল সে।

'পড়ো হে, যদি ইচ্ছে হয়। দেখছো তো, এর প্রত্যেকটা কথা ...'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। সত্যি বলেছেন,' বাধা দিয়ে বলে আস্তে আস্তে, যেন অনিচ্ছায়, বই'এর পাতা ওলটাতে লাগলাম।

'ভেলমুরাত-আগা,' সাবধানে পথ হাতড়ে শুরু করলাম।

'কী?'

'এটা আপনার কাছে অনেক দিন আছে?'

'চল্লিশ বছর।'

'চল্লিশ?'

'হ্যাঁ, বাছা।'

'ও, তাই কয়েকটা জায়গা আপনার মুখস্থ। এবার বুঝেছি।'

'কয়েকটা জায়গা নয়, প্রত্যেকটা কথা,' আমার ভুল শুধরে বৃদ্ধ বলল। 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকটা গান যেভাবে আছে সেভাবে আবৃত্তি করতে পারি। কথাগুলো আমার মনে গাঁথা।'

'সে তো চমৎকার ব্যাপার!' বলে উঠলাম। 'তাহলে তো পুঁথিটা সত্যিসত্যি আপনার আর দরকার নেই।'

তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করল বৃদ্ধ। চোখে জিজ্ঞাসা ও ভর্ৎসনা: "ও, তোমার মতলব তাহলে এই! এই ধান্দায় আমার তাঁবুতে ঢুঁ মেরেছো!"

ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করে ঝট করে বলে উঠলাম:

'যত খুসি দাম নিন, বইটা আমাকে দিন। আমাকে বেচুন বইটা!'

ভীষণ একটা পরিবর্তন এল বৃদ্ধের চেহারায়: চোখজোড়া অদ্ভুতভাবে বিস্ফারিত হল, দাড়ি যেন ছড়িয়ে পড়ল খোঁচা খোঁচা হয়ে। তার স্ত্রী পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিচলিত। পোষাকের কলার আঁকড়ে শিউরে উঠে হঠাৎ সে বসে পড়ল, তারপর পাথরের মতো নিশ্চল। আমার মনে হল মদ রাখার চামড়াগুলো দেয়ালে নড়ে উঠল, ছাদ থেকে ঝোলা চাবুক আর দড়ি দুলতে শুরু করল। নিশ্বাস চেপে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে ভেলমুরাত-আগা আমার হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে স্ত্রীকে দিল এক ঝটকায়।

'সরিয়ে রাখো,' বলল কঠোর সুরে।

আমার কপাল ভালো যে তক্ষুণি চলে যেতে বলেনি। বললে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হতাম না।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দতার পর বৃদ্ধ যখন আমার সঙ্গে কথা বলল তখন গলাটা প্রায় শোনা যায় না।

'শোনো হে, ছোকরা, আমার স্ত্রী আর আমি তোমাকে বলিনি যে বইটা কখনো আমাদের হাতছাড়া হবে না? কেউ কেউ বলে দুনিয়াতে এমন কোনো

জিনিস নেই যা বেচা বা কেনা যায় না, কিন্তু আমি সে দলে নই। তুমি আমার অতিথি, তোমাকে আবার বলি, প্রাণ খুলে বলি: বইটা চেয়ো না। তুমি আমি পরস্পরকে সহজে বুঝতে পারি মনে হয়। বইটা তোমার হবার আগে আমার অনুমতি অবশ্য দরকার, তাই না?'

'অবশ্য, অবশ্য,' তাড়াতাড়ি সায় দিলাম। 'তাছাড়া আর কী?'

'বেশ, কিন্তু সে অনুমতি কখনো তোমার মিলবে না।'

বুকটা বসে গেল।

'আর আমি যদি বা রাজী হই,' বৃদ্ধ বলে চলল, 'আমার ছেলে ও বৌ রাজী হবে না। আর তারা যদি রাজী হয়, গাঁয়ের লোকে কোনো দামে বইটা দেবে না। না, আবার বলছি, না! বইটা হাতছাড়া করব না। এমন কি দুর্ভিক্ষের সময় যখন বাড়িতে খাবার মতো খুদ পর্যন্ত ছিল না, বই পড়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না কারো, তখনো বইটা বেচার কথা একবারও মাথায় আসেনি। আর এখন? যাক গে, মিছিমিছি কথা বলে কী লাভ? যে নিজের চোখে বইটা একবার দেখেছে সেই এর মূল্য জানে। আর বইটা কী কষ্টে আমরা পাই সেটা জানলে এটা চাইবার সাহস হত না তোমার।'

দু এক মুহূর্ত থেমে মৃদুস্বরে বৃদ্ধ বলে চলল, যেন নিজেকে বলছে এমনভাবে।

'কী করে বইটা পেলাম, তোমায় বলব কিনা?.. বলতে আমার ইচ্ছে করে না, প্রবচনের সামিল হতে চাই না আমি। এমনি তো লোকে বলাবলি করে: "ভেলমুরাতের বই পাওয়াটা যেমন", "ভেলমুরাত আর তার বই যেমন ঠিক তেমনটা।"'

আমি অনুনয় করলাম, 'দোহাই আপনার, ভেলমুরাত-আগা, বলুন! সত্যি বলছি বলুন! আপনার বই'এর গল্প শুনতে চাই।'

'বেশ,' ফেল্টের কম্বলে সজোরে একটা চড় মেরে রাজী হল বৃদ্ধ। বুক চিতিয়ে মাথা তুলে সামনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, অনেক দিন আগেকার কথা সব মনে আসছে।

২

'শোনো তাহলে, ছোকরা। আমার বয়স প'য়ষট্টি। গল্পটা শুনতে চাইলে চল্লিশ বছর আগে ফিরে যেতে হবে। কেননা ঠিক চল্লিশ বছর আগেকার হেমন্তে বইটা আমার হয়। এটা কেনার বছরটাকে বলত ঠাণ্ডা বছর। তখন আমি ছিলাম রাখাল, আমি বরাবরই রাখাল।

'এখন মোটা বলে কোট আঁটে না, তাতে আমাকে ভুল বোঝা উচিত হবে না। আমি রাখাল হয়ে জন্মাই আর মানুষ হই। ছেলেবেলা থেকে বালির মধ্যে আছি, ভেড়ার তদারক করেছি। অবশ্য তখনো বইটা চোখে দেখিনি। লোকের মুখে শুনেছি ওরকম জিনিস আছে, ব্যস, আর কিছু না।

'তারপর হল কী — পরিবার হল, তাঁবু একটা জোগাড় করলাম; তারপর বাচ্চা পেটে খুব ভালো জাতের একটা উট কিনলাম। সংসার পেতেছি, তাই ঠিক করলাম শীতকালের জন্য শস্য মজুত রাখা চাই। উটের পিঠে পশম আর সাকসাউল-পোড়া জ্বালানি চাপিয়ে রওনা হলাম আরকাচ'এ। সেখানে কাউকে চিনতাম না বলে, যাকে পশম আর জ্বালানি বেচেছিলাম তার কাছে রাত্তির কাটালাম। বড়োলোক সে। সন্ধ্যেবেলায় তার বাড়িতে ছোকরা আর বুড়ো অতিথির ভিড় জমল। একজনের ওপর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ পড়ল — জমকালো পোষাক গায়ে, মুখটা মোটা আর লাল, দাড়িটা বেলচার মতো।

'অন্যরা তাকে সম্বোধন করে বলল, "মোল্লাসাহেব, মেহেরবানি করে কিছু পড়ে শোনাবেন না?"

'ওরা তাকে দিল এই বইটা। কিন্তু পড়তে কিছুতেই রাজী হল না মোল্লা।

'চেঁচিয়ে সে বলল, "আহাম্মক সব! আমাদের ধর্মকে গালিগালাজ করে এ বইটা লিখেছে একটা বদ্ধ পাগল। লোকটার মাথায় স্রেফ দুনিয়াদারির কথা, বইতে শুধু গুনাহ্ আর বুঢ়িবাত। বছরে একবার বইটা পড়া যায়

হয়ত, ব্যস, তার বেশি হলে খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এটা পড়ে শোনাই,” পোষাকের নিচ থেকে একটা বই সে টেনে বের করল।

‘কিন্তু অন্য সব অতিথি মোল্লার চেয়েও নাছোড়বান্দা। একজন উপহারের লোভ দেখাতে মোল্লা রাজী হয়ে গেল। উঁচু গলায় পড়ে চলল পাতার পর পাতা। ওঃ, পড়তে পড়তে মাঝরাত্তির, তারপর আরো অনেকক্ষণ। লোকটার জিভের ক্ষমতা ছিল বটে! আমি হাঁ হয়ে শুনতে লাগলাম ... দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেলাম, কী ব্যাপার চেষ্টা করলাম বুঝতে। কয়েক পাতা কাগজের দিকে তাকিয়ে এরকম অদ্ভুত সব কথা কী করে লোকে বলতে পারে? মনে হল, কে যেন তার জীবনের গল্প শোনাচ্ছে আমাকে। আরো ভালো করে শোনাতে তখনি মনে হল আমার জীবনেরি কথা বলছে সে। আর একটার পর একটা স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসা কথা, ওদের কতগুলো তো মাঝে মাঝে আমারি মাথায় আসে। সহজ, প্রাণবন্ত কথা। কখনো ভাবিনি বই এরকম উত্তেজনা আনে, জীবনের কথা বলে এত বিজ্ঞভাবে, লোককে এমন করে বোঝায়, এমন গভীরভাবে অনুভব করতে শেখায়। আজ বইটা দেখে তুমি যেমন মুগ্ধ, সেদিন আমারও এরকম অবস্থা। মনে মনে ভাবলাম এ তো অমূল্য, খুব সম্ভব এ ধরনের জিনিসের বেচাকেনা চলে না। আকাঙ্ক্ষায় মন ভরে গেল। ঠিক করলাম, বইটা যদি বেচে আর যদি কেনার পয়সা তুলতে পারি তাহলে ওটা কিনব। কিন্তু বেশ সন্দেহ ছিল যে আমার মতো গরীব রাখাল এরকম একটা রত্ন কিনতে পারবে কিনা। ভেবে ভেবে উৎকণ্ঠায় সে রাতে এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে, ভাবতে লাগলাম এসব কথা কেমন করে সৃষ্টি হয়, কোন মানুষে এভাবে ওদের গেঁথেছে। বইটা কি আকাশ থেকে পড়েছে?

‘সকালে গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র জিজ্ঞেস করলাম, “কাল রাতে মোল্লাসাহেব যে বইটা পড়ে শোনালেন সেটার কি অনেক দাম?

‘“বাঁধাধরা কোনো দাম নেই,” হেসে সে বলল। “বই তো আর মেয়েলি রুমাল বা জ্বালানির বস্তা নয়। সহজে দাম ঠিক করা যায় না।”

'"দাম একটা ঠিক করুন, সত্যি বলছি, একটা দাম ধরে দিন," নাছোড়বান্দার মতো বললাম।

'অন্য উপস্থিতদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল গৃহকর্তা, আবার হেসে নিল আমাকে নিয়ে। তারপর বলল:

'"ওটার দাম হল একটা উট, খাসা একটা উট, ব্যস, তার কম নয়।"

'হয়ত শুধু তামাসা করে কথার কথা একটা বলেছিল, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সেটা বিশ্বাস করলাম, মন খুসি হয়ে উঠল। একটা মাত্র উট, কী কপাল আমার! কোনোরকম ইতস্তত না করে ঠিক করে ফেললাম যে উটে চেপে আরকাচ'এ এসেছি সেটাকে দিয়ে দেব।

'"তাই যদি দাম হয় তাহলে আমার উটটা নিন; খাসা মাদী-উট, পেটে বাচ্চা আছে। নিয়ে বইটা আমাকে দিন।"

'"বেশ, বেশ," আগেকার মতো ব্যঙ্গের সুরে গৃহকর্তা বলল। "তোমার উটকে রেখে যাও, বইটা নাও, খোদা হাফিজ।"

'আমার খাসা উটটাকে শেষবার দেখে নিলাম, পোষাকের নিচে বইটা গুঁজে রওনা হলাম ঘরের দিকে পায়ে হেঁটে। তিন দিন হাঁটলাম। যখন বাড়ি পোঁছলাম তখন ক্লান্ত, পায়ে কড়া পড়েছে। আমার বুড়ী' (ভেলমুরাত-আগা স্ত্রীকে অভ্যাসবশত ডাকত এই নামে, যদিও তখন তার বয়স কুড়ির বেশি হতে পারে না) 'দরজায় আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল:

'"আমাদের উটটা কই? কী করেছ ওটার? হারিয়ে ফেলনি তো? বদমাইস চোরে নিয়ে গিয়েছে নাকি? হায়, হায়!" পাগলের মতো কাঁদতে লাগল ও, কলার আঁকড়ে ধরে, যেন শোকের চোটে জামাকাপড় তখ্খুনি ছিঁড়ে ফেলবে।

'"সবুর করো, সবুর করো, চুপ," বললাম আমি। "তোমার খুসি হওয়া উচিত, কাঁদা নয়। খাসা উটটা বহুৎ উপকার করেছে আমাদের। ওর জন্য দেখ কী পেয়েছি — এটা," বলে বইটা বের করলাম। "দেখ, এখানে, কাপড়ের বাঁধাই'এর নিচে যা লেখা তার প্রত্যেকটা শব্দ এক একটা জাত-উটের সামিল। সব বলছি শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে।"

'আমার স্ত্রী তাকিয়ে দেখে বইটা নিয়ে খুলল, পাতাগুলো দেখল, তারপর কপালে ছুঁইয়ে মুখে বুলিয়ে নিল, ভাবল যে জিনিসটা পূত। তারপর জোর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল বইটার দিকে, হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। আমি জানতাম, উটের কথা ও ভাবছে — আমরা গরীব, আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা ছিল উটটা।

'ও দাঁড়িয়ে রইল সেভাবে, বিষণ্ণ নানা চিন্তা মাথায়। "দুঃখ করো না," আবার বললাম, ওর মনের বোঝা লাঘব করার চেষ্টায়। "বেশ একটা দাঁও মেরেছি।" ওকে বললাম সেই রাত্তিরের কথা যখন মোল্লা আমাদের পড়ে শোনায়। বললাম সবাই কেমন করে শোনে, আমি নিজে কী ভাবে শুনি, উত্তেজনায় বসে থাকা দায় ছিল আমার। যেসব লাইন চিরতরে আমার মনে গেঁথে বসেছে তার কয়েকটা আবৃত্তি করলাম।

'আশ্বাস দিয়ে বললাম, "এসব লাইনের প্রত্যেকটা কথা বইটাতে আছে। অবশ্য ঠিকমতো বলতে পারছি না, একটা কথাও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না। দুঃখু করো না, বউ।"

'কিন্তু উটের কথা ও ভুলবে কেমন করে। চোখ জলে ভরে এল।

'আবার আশ্বাস দিয়ে বললাম, "এখানে লেখা প্রত্যেকটা শব্দ এক একটা মাদী-উটের সামিল," কিন্তু ওর মন মানল না। গাল বেয়ে চোখের জল নামল।

'"বলো না কেন যে মিছিমিছি উটটা দিয়ে দিয়েছ," কেঁদে ও বলল। "আমাদের একমাত্র সম্বল গেল। ওরা তোমাকে ঠকিয়েছে, এক বাণ্ডিল কাগজ শুধু এনেছ, আর কিছু না!"

'কী করবো বলো? আপত্তি জানালাম অবশ্য। বই'এর পাতা উল্টে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

'"এখানে যা লেখা তা যদি মেয়েদের মাথায় ঢুকত!" বললাম আমি।

"বেলচা-দাঁড় মোল্লাসাহেব যদি এখানে হাজির হতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উটটার কথা ভুলে যেতে।"

'গণ্ডগোলটা তো তাই নিয়ে: বই'এর সব অদ্ভুত কথা, সব গানের চাবিকাঠি আমাদের নেই। বইটা মৌন, যেন আমাকে আর স্ত্রীকে উপহাস করার জন্যই একটা কথাও বলছে না। ব্যাপারটাতে আমার এত বিরক্তি ধরে গেল যে প্রায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতাম বইটা। কিন্তু জিনিসটা আমার হাতে রয়েছে, কোনো দোষ করেনি। ওর শুধু দরকার এমন লোক যে পড়তে পারে, কিন্তু মরুভূমিতে সেরকম লোকের হদিস কোথায় মিলবে?.. তাঁবুর ভেতরে গেলাম। মনটা এত বিষিয়ে গিয়েছিল যে দীর্ঘ যাত্রার পর এক কাপ চা পর্যন্ত খেতে পারলাম না। অস্থিরভাবে আবার বাইরে এলাম। বইটা কিনেছি বলে এবার খারাপ লাগল।

'বিদ্যাবুদ্ধির জন্য আমাদের অঞ্চলে হাঁকডাক আছে এমন এক জনের সঙ্গে পরামর্শ করার উপদেশ দিল আমাকে, দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। লজ্জিতভাবে বললাম আমার একটা বই আছে, কিন্তু পড়তে পারি না। এমন কারোর নাম করতে পারেন যে পড়তে পারে?

'"বইটা পেলে কী করে?" অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'"সস্তায় পেয়েছিলাম," বললাম।

'আমার দিকে তাকিয়ে হেসে তিনি করুণাবশত মাথা নাড়ালেন:

'"মনে হচ্ছে তুমি একটি আহাম্মক। বুদ্ধিশুদ্ধি কোথায় ছিল তখন? বইটা কিনতে গেলে কেন? বিনা পয়সায় পেলেও কী কাজে লাগত তোমার? বই'এর জন্য চাই পড়তে পারে এমন বিজ্ঞান লোকের। এরকম লোক কোথায় তুমি পাবে? আমাদের গ্রামে একজনও নেই। আশেপাশের গাঁয়েও নেই। তাহলে তোমার বইটা পড়বে কে? একবার কি সে কথা ভেবে দেখেছিলে?"

'তিনি যা বললেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, মেনে নিতেই হল।

'তারপর আমার অবস্থাটা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। দিবারাত্রি বুড়ীর গজগজানি, প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। অন্যদের পরামর্শ নিলাম,

গেলাম আশেপাশের গাঁয়ে, কিন্তু পড়ুয়া কারোর হাদিস মিলল না কোথাও। মনে হল সবাই একটা যড় করেছে। হামেশা সেই একই কথা: "তুমি তো রাখাল, একেবারে চালচুলো নেই, তোমার মাথায় এ আজগুবি জিনিস ঢুকল কেন? বই'এ তোমার কী ফয়দা?" হাল প্রায় ছেড়ে দিলাম। একদিন বাড়ি ফিরে আমার রত্নটা নিয়ে থলের একেবারে তলায় একগাদা আজেবাজে জিনিসের নিচে রেখে দিলাম। বললাম, "তোকে যেন আর চোখে না দেখি, আমার মনের অস্থিরতা যেন আর না হয়।"

'বইটা থলের তলায় পড়ে রইল এক বছর, দু বছর, একটানা সাত বছর। আর সাত বছর আমার বুড়ীর বিলাপ কখনো থামেনি: "হায় কী সুন্দর ছিল উটটা, বাচ্চা দিত। এরিমধ্যে তিনটে বাচ্চা হত। এতদিনে আমাদের অবস্থা ফিরে যেত, ভাবনা চিন্তার জ্বালা থাকত না একেবারে।"

'দিবারাত্রি আমাদের কপাল নিয়ে ওর বিলাপ। বেচারী! সত্যি তো, বইটা কেউ একবারও ওকে পড়ে শোনায়নি। বইটার যতই প্রশংসা করি ও কান দিত না, যদিও ভেতরে কী আছে সেটা সঠিক জানার জন্য ওর অত্যন্ত কৌতূহল ছিল মনে মনে। তারপর এমন দিন এল যখন ও নিজেই বলতে শুরু করল যে ওটা আমাদের পড়ে শোনাবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

'একদিন বসে বসে চা খাচ্ছি, ও বলল:

'"মোল্লা আর ইশানরা শুধু লিখতে পড়তে পারে। তাই যদি হয় তাহলে অন্যদেরও শেখাতেও পারে নিশ্চয়ই। আমাদের মুরাত-জানকে ওদের কারো কাছে পড়তে দেব নাকি? তার কাছে শিখে ও আমাদের বইটা পড়ে শোনাবে। লোকে বলে আকচি-ইশানের বিদ্যে সবায়ের চেয়ে বেশি। ছেলেটাকে তার কাছে পাঠাই। ওকে ছাড়া আমরা কোনোক্রমে ঘরের কাজ চালিয়ে নেবো। হয়ত বছর পাঁচেকের মধ্যে লেখাপড়া শিখতে পারবে।"

'স্ত্রীর কথা শুনে ভালো লাগল। আর আমার কথা — বইটা পড়ার জন্য আমি তো সবকিছু করতে রাজী। তাই আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক

করে ফেললাম। ছেলেটার বয়স তখন আট — তাকে নিয়ে গেলাম আকচি-ইশানের কাছে।

'"অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি অত্যন্ত বিনীত একটা অনুরোধ নিয়ে," বললাম তাকে। "আমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন? যতদিন আপনার কাছে থাকবে ততদিন নিয়মমাফিক চলবে: ওর দেহ আপনার, ওর হাড় আমার। যদি ধোলাই দিতে হয়, দেবেন; যদি কোনো কাজের দরকার হয়, ও করবে। ওকে শুধু পড়তে শেখাবেন।"

'ইশান উৎসাহ দিল।

'"ওকে আমার কাছে নিয়ে এসে ভালোই করেছ। যে আমার নুন খেয়েছে, আমার কাছে শিক্ষা পেয়েছে, সে কেউ-কেটা না হয়ে যায় না। ওকে হাতে নিলে কেমন গড়ে তুলব দেখবে। চার বছর পরে ফিরে এসো, চিনতে পারবে না ওকে।"

'ইশানের কথায় বিশ্বাস হল, বাড়ি ফিরলাম যেন হাওয়ায় উড়ে। বললাম স্ত্রীকে, "দুঃখ করো না, কোনোক্রমে চারটে বছর চালিয়ে নেবো, তারপর দেখবে কী হয়। তখন তুমি নিজেই বুঝবে বই কিনে আমি ভুল করেছি কি না।"

'বইটা আরো তিন বছর আর কয়েকটা মাস পড়ে রইল থলেতে। সময় কাটতে লাগল ঢিমে তালে। ভাবলাম, এতদিনে মুরাত-জান নিশ্চয়ই কিছু শিখে ফেলেছে। আর অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য ছিল না, হন্তদন্ত হয়ে গেলাম ইশানের কাছে। গিয়ে কী দেখলাম! আমার ছেলে দিনরাত্তির খাটছে, ইশান আর তার স্ত্রীর সব কাজ করছে। লেখাপড়া শেখেনি একেবারে, যে বুদ্ধি মাথায় নিয়ে জন্মেছিল সেটা যে ভোলেনি তাই হল তাজ্জব ব্যাপার, এত মেহনত করতে হত তাকে। আমাকে দেখামাত্র অঝোর ঝোরে কেঁদে ফেলল।

'"আমায় বাড়ি নিয়ে চল, বাবা," কাকুতিমিনতি করে বলল, "তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। আকচি-ইশান আমাকে আধপেটা রেখে খাটিয়ে খাটিয়ে হাড় মাস

কালি করে দিয়েছে। কিছু শেখায় না আমাকে। লোকটা মুখ্যু, বিদ্যেবুদ্ধি একেবারে নেই।”

‘ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে ওরকম কথা বলতে বারণ করলাম। ইশানকে মুখ্যু বলাটা পাপ।

‘“তোর সরম নেই দেখছি। তুই এখনো ছোট, কিছু বুঝিস না।”

‘কিন্তু ও সজল চোখে জোর দিয়ে বলল:

‘“আকচি-ইশান একটা তুক পর্যন্ত লিখতে পারে না। একেবারে ক অক্ষর গোমাংস। কেউ তুকের জন্য এলে এক চিমটি নুন দেয়, মা যে নুন ছোট থলিতে রাখেন সেরকম নুন শুধু। ওর কাছে কিছু শেখা আমার হবে না।”

‘আবার ওর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম:

‘“তুই এখনো ছোট, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। বড়োদের বিচার করা তোর কাজ নয়। সারা গাঁ ওঁকে খাতির করে, জ্ঞানী আর বিদ্বান মুসলমান হিসেবে ওঁর কত খ্যাতি চারদিকে! তিন বছর ওঁর নুন খেয়ে এখন ওঁর নিন্দে করছিস, তোর এত বুকের পাটা!”

‘উত্তরে মুরাত-জান আরো বেশি করে কাঁদতে লাগল:

‘“আমাকে বাড়ি না নিয়ে গেলে আমি পালিয়ে যাব, বাবা। একদিনও থাকব না এখানে।”

‘ছেলেটা আমাকে বিচলিত আর চিন্তিত করে দিল। সবকিছু ঠিক কিনা জানার জন্য আকচি-ইশানের পড়শীর কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, ইশান আমার ছেলেকে লিখতে পড়তে শেখাবে কি না? পড়শীটি সাদাসিধে বিনয়ী মানুষ। ইশানের বিষয়ে যা জানত সব বলল আমাকে। ওর বিদ্যে না থাকার যে কথাটা মুরাত-জান বলেছে তা ঠিক। ইশান না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। কোথাও পড়েনি সে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, যদিও ওর বিদ্যে নেই ওকে লোকে অনেক শিক্ষিত মোল্লার চেয়ে বেশি কদর করে। তার কারণ এই যে, ইশানের খানদানী বংশ। সারা গাঁ সভয়ে উচ্চারণ

করে ওর পূর্বপুরুষদের নাম। তাদের নিন্দা করার সাহস কারো নেই, কারণ ইশানের পরিবার যাদুর শক্তি ধরে।

'পড়শী বলল, "একবার একটা চাষা আর্কাচ-ইশানের ঠাকুর্দার এক বোঝা খড় চুরি করে। তিনিও ছিলেন ইশান। লোকটা খড় নিয়ে বাড়ি পেঁাছল, কিন্তু পিঠ থেকে খড় আর নামাতে পারে না। ছেলেকে ডাকল, কিন্তু সেও বোঝাটা নামাতে পারল না। বিষণ্ণ অনুশোচনায় চোর ফিরে গেল, চোরাই মাল আগেকার জায়গায় রেখে আসবে। কিন্তু তবু মালটা পিঠ ছাড়ে না। সারা রাত বেচারী মাল পিঠে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াল। শেষ পর্যন্ত মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। "ইশান-আগা, আমি দোষ করেছি। আমার পাপ সারা রাত পিঠে বয়েছি। আমার অনুতপ্ত মন দুঃখে জর্জর। আমাকে মাফ করুন, ইশান-আগা, মনে শান্তি ফিরে আসুক। দেখুন, আপনার খড়ের চাপে এখনো আমার পিঠ নুইয়ে আছে। মালটা সরিয়ে দিন।" ইশান-আগা চোরকে মাফ করে দিলেন। যেখান থেকে খড় নিয়েছিল সেখানে তাকে পাঠিয়ে দিলেন, আর তাঁর আদেশে বোঝাটা খসে পড়ল লোকটার কাঁধ থেকে। চাষীটা কে, কেউ জানে না, কিন্তু এখানকার সব বুড়ো গল্পটা জানে, প্রায়ই বলে। ঠাকুর্দা মায়াবী ছিলেন, আর্কাচ-ইশানও তাই। ও নুন দিয়ে কাজ সারে। একমুঠো নুনে ফুঁ দিয়ে কয়েকটা যাদুমন্ত্র আওড়ালেই বাঁজা মেয়ের বাচ্চা হয়, রোগীর অসুখ সেরে যায়।"'

ভেলমুরাত-আগা বলতে লাগলেন, 'কথাটা শুনে মন ঠিক করে ফেললাম। মুরাত-জান নুনে ফুঁ দিতে শিখুক আমার সে ইচ্ছে একেবারে নেই। ছেলেকে বাড়িতে এনে রাখালের কাজ করতে পাঠালাম।

'ছেলেটা বড়ো হল, কাজের জন্য টাকা পেতে লাগল। সে সময় আমরা খুব গরীব ছিলাম, ছেলেটার বিদ্যে যতটা আমাদের দরকার ততটা তার সাহায্য।

'মাসের পর মাস কাটল, বছরের পর বছর। স্তেপে ধুলো ওড়ে, আবার বসে যায়। বসন্তকালে ভেড়া চরার নতুন জায়গায় যেতাম, হেমন্তে ফিরে

আসতাম এই উপত্যকায়। আর বইটা পড়ে রইল থলের তলায়। মাঝে মাঝে বের করে গভীর আকাঙ্ক্ষায় পাতা ওলটাতাম। ঠিক মোল্লার মতো করে বসে ঠিক তারি মতো বইটা ধরতাম; সারা বই'এর পাতা উলটে যেতাম, কিন্তু কিছুই ঘটত না। তাতে আমার স্ত্রীর মন খারাপ হয়ে যেত, পুরনো শোক ফিরে আসাতে আবার গজগজ শুরু হত: "বোকার মতো বইটা না কিনলে আমরা কতো বড়োলোক হয়ে যেতাম। এতদিনে জাত-উটের গোটা একটা দল হত আমাদের।"'

৩

'শেষ পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ে এল সোভিয়েত শক্তির সুদিন,' বলে চলল ভেলমুরাত-আগা। 'দেখা দিল স্কুলমাষ্টার, সঙ্গে বই। আমাদের গাঁয়েও একজন এল। স্কুল ঘরের জন্য তাঁবু খাটিয়ে, লেখাপড়া করতে চায় এমন বাচ্চা আর বয়স্কদের জড়ো করতে লাগল সে। তাকে দেখে আমার কী আনন্দ, তুমি বুঝতে পারবে না। মনে হল নতুন সরকার বিশেষ করে আমারি জন্য তাকে পাঠিয়েছে। অজ্ঞতার দরুন আমাদের অনেকে প্রথম প্রথম অন্য চোখে তাকে দেখত, বাচ্চাদের পাঠাল না তার কাছে, কিন্তু আমার তাকে ভালো লাগে প্রথম দেখেই। বই'এর কথা তাকে বলতে দেরি হল না, বইটা দেখতে সে চাইল। দু এক দিন রেখে ফেরৎ দিয়ে বলল:

'"আপনি বেশ দাঁও মেরেছেন, ভেলমুরাত-আগা। সবচেয়ে মূল্যবান তুর্কমেন পুঁথির একটা আপনার হাতে। এর জন্য আপনি ও আপনার স্ত্রীর অনেক ভোগান্তি গেছে, কিন্তু ভোগাটা সার্থক। অনেক দিন বইটা এমনি পড়ে আছে, কিন্তু আর বেশি দিন তেমন থাকবে না। ছেলেকে স্কুলে পাঠান, ও লেখাপড়া শিখবে। ইশানের জন্য কাঠ কাটতে জল আনতে হত, আমার জন্য তা করতে হবে না। চাকর আমার চাই না। নির্দিষ্ট একটা সময়ে আপনার ছেলে স্কুলে যাবে, তারপর আপনাদের দুজনকে বইটা পড়ে

শোনাবে। আরো বই পাবে, সব কথা আপনাদের শোনাবে আর আপনার কিছু লেখার দরকার হলে ও লিখে দেবে।"

'স্কুলমাষ্টারের কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ওগুলো অসার নয়। মুরাত-জান তখন ভেড়ার পাল নিয়ে স্তেপে। তার কাছে গিয়ে বললাম আবার তাকে একটি মোল্লার কাছে রাখতে চাই। বললাম, আবার তুই পড়বি আর এতদিন ধরে সযত্নে রাখা দুর্লভ বইটা বাপ-মা'কে পড়ে শোনাবি। কিন্তু মুরাত ওর ধার ঘেঁষে যাবে না। বলল, "না, আমি আর পড়ব না; মোল্লা বা ইশান যাই হোক, দু চক্ষে দেখতে চাই না। এখন তো সোভিয়েত সরকার এসেছে সহরে গাঁয়ে। আকচি-ইশানের বৌ এখন আর আমাকে দিয়ে কাঠ কাটাতে বা জল আনাতে পারবে না।" আবার ওকে যুক্তিতর্কে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। "তুই বুঝছিস না যে মোল্লা আমাদের গাঁয়ে এসেছেন তাঁকে লোকে বলে স্কুলমাষ্টার। তাঁবুতে একটা স্কুল তিনি খুলেছেন, তোর মতো অনেক ছোঁড়া, এমন কি বুড়োরা পর্যন্ত রোজ যায় পড়তে। মাষ্টার নিজে আমাকে বললেন: "মুরাত-জান আসুক, ঠিক সময়ের মধ্যে লেখাপড়া শিখে নেবে।" উনি যেমন-তেমন মাষ্টার নন, যাদের নতুন সরকার বিশেষ করে গাঁয়ের লোককে শেখাতে পাঠিয়েছে তাদের একজন। চাকর উনি চান না, বিদ্যের জন্য পয়সাও নেবেন না।"

'শেষ পর্যন্ত মুরাত-জানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। মাষ্টার হক কথা বলেছিলেন। তিনি অসম্ভব কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না, আকচি-ইশানের মতো দেখালেন না ভেলকি, ফুঁ দিলেন না নুনে। মুরাত বাড়িতে থাকত, মা'কে হাত দিত কাজে, তারি সঙ্গে আস্তে আস্তে লিখতে পড়তে শিখল। একটা কথা,' যোগ করল ভেলমুরাত-আগা, 'আমাদের মুরাত-জান এখন পাশের জেলায় একটা পশুপালন খামারের ম্যানেজার।

'মুরাত-জান লেখাপড়া শিখল। তারপর থলের তলা থেকে বইটা বের করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পড়ে শোনাল। তখন মালুম হল যে বই স্বর্গে লেখা হয় না, ওদের অর্থ আমাদের বোধগম্য। বইটাতে এমন কি

কয়েকটা গান ছিল যেগুলো আমাদের, রাখালদের চেনা, মাঝেমাঝে স্তেপে সেসব গান আমরা গাইতাম। তুমি তো পড়ে দেখেছ, বেশির ভাগ কবিতা হল ভালো ও মন্দ, মানুষের সত্য, নিজের সত্য আর সুখ রক্ষা করতে গিয়ে মানুষের সাহসের বিষয়ে। আর তখন এও বুঝলাম যে বেলচা-দাড়ি মোল্লা বইটা পড়েছে খারাপভাবে। নাকি সুরে পড়েছে, কথাগুলো বিকৃত করে বিদেশীর মতো উচ্চারণ করেছে। বইটা যখন কিনি তখন তার আসল রূপের শ' ভাগের এক ভাগও আমার মাথায় ঢোকেনি। আমার ছেলে যখন এই আগুনের পাশে বসে সাধারণ তুর্কমেন ভাষায় আস্তে আস্তে সহজে বইটা পড়ল তখন অন্য একটা জগৎ খুলে গেল। তখন আমার স্ত্রী আর সারা গাঁ মানল যে উটের বদলে বই কিনে ভেলমুরাত-আগা ঠকেনি, বরং জিতেছে।

'শেষ পর্যন্ত তাই স্ত্রী আমাকে বকা বন্ধ করে দিল, পড়শীরা খারাপ সওদার জন্য আমাকে নিয়ে আর মস্করা করত না।

'এই হল পুঁথির গল্প,' উপসংহারে বলল ভেলমুরাত-আগা। 'এখন তো জানো কত বছর ভুগেছি বইটার জন্য। তা জেনে ওটা নেবার সাহস কার হবে? সত্যি, বইটা দিয়ে দিলে আমাকে গালিগালাজ করবে না গাঁয়ে এমন লোক একটাও নেই। এই তো বইটা, যত খুশি পড়, যে শুনতে চায় তাকে পড়ে শোনাও, কিন্তু ওটা আমার হাতছাড়া করার চিন্তা মাথা থেকে বিদেয় কর।'

৪

ভেলমুরাত-আগার গল্প যখন শেষ হল তখন গভীর রাত। আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে বৃদ্ধ যতদিন বেঁচে আছে ততদিন বইটা হাতছাড়া করবে না। বোঝাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। যদি বলি যে পুঁথিটা আশখাবাদে ছাপাব, তাহলে তার গাঁয়ের সবাই একটা করে কপি পাবে, যদি বলি যে আমাকে দিলে দু তিন মাসের মধ্যে আস্ত ফেরৎ দেব, তাহলেও বৃদ্ধ

রাজী হবে না। তার সমস্ত জীবনের সঙ্গে বইটার যোগাযোগ এত প্রত্যক্ষ যে কোনো যুক্তিতর্কে মন টলবে না। তার চেয়ে বরং নকল করার অনুমতি চাওয়া ভালো।

ততক্ষণে আমাদের মধ্যে বেশ দোস্তির ভাব এসেছে। বসে বসে চা খেতে খেতে এটা-সেটার গল্প করছি প্রসন্ন চিত্তে, বিষয়টা আবার তোলার একটা শুভ মুহূর্ত বেছে নিলাম।

'ভেলমুরাত-আগা!'

'কী?'

'আপনার কাছে একটা একান্ত অনুরোধ আছে।'

'কী অনুরোধ?'

'যদি আপনি বইটা ...'

'ওঃ, আবার!' দুই হাত দাড়িতে বুলিয়ে হেসে বাধা দিল বৃদ্ধ। এবার আর রাগে ফেটে পড়ল না; আমার কথায় গুরুত্ব আরোপ করল না। বইটাতে আমার এত আগ্রহ দেখে বরং খুসি হল বৃদ্ধ। তার গমগমে জোর হাসিতে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল, সে ইতিমধ্যে আগুনের অন্য ধারে আশ্রয় নিয়েছিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে, আশ্বস্ত হয়ে আবার মাথা মুড়ি দিল কম্বলে।

'না হে, দোস্ত ও মেহেরবান, বইটা পাবে না। যারা এসব বই'এর মূল্য জানে না তারাই বেচে। আবার তোমায় বলি: দুনিয়াতে এমন কয়েকটা জিনিস আছে যা কোনো দামে কেনা যায় না।'

'কিন্তু আপনাকে তো বইটা বেচেছিল একজন ...'

'বেচে তার লাভ হয়নি।'

নিজের দৌলতে গর্বিত বৃদ্ধ শিশুর মতো খুসিতে আবার অট্টহাসি হাসল।

'ঠিক বলেছেন, ভেলমুরাত-আগা, কয়েকটা জিনিস কেনার বাইরে, কিন্তু যাকে বিশ্বাস করেন তাকে ধার দেওয়া তো যায় এক এক সময়ে।'

আমি চাইলাম বৃদ্ধ বুঝুক যে খালি হাতে তার কাছ থেকে যাব না। কথা চলল বেশ সিরিয়াসভাবে, পরস্পরকে বেশ ভালো করে চিনি তখন; শেষ পর্যন্ত আমার ওপর করুণা হল বৃদ্ধের, সে বলল:

'শোনো হে ছোকরা, বইটা যদি তোমার এতই ভালো লেগে থাকে তাহলে এখানে বসে নকল করে নাও।'

এ কথার পর দুজনেই চুপ করে গেলাম। তাঁবুর বাইরেও সেই স্তব্ধতা যা মরুভূমিতে আসে ঠিক সূর্যোদয়ের আগে। পায়ের কাছে ধিক ধিকে অঙ্গার নিভে গেছে অনেকক্ষণ, ছাই পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আগুনের ওপাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভেলমুরাত-আগার স্ত্রী শান্তিতে নিদ্রারত। বুঝলাম, বলার আর কিছু নেই।

'ধন্যবাদ। কাল সকাল থেকে নকল করব।'

দু সপ্তাহ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভেলমুরাত-আগার তাঁবুর আগুনের কাছে বসে মহামূল্য পুঁথিটা নকল করলাম। বেশির ভাগ সময়ে বৃদ্ধ আমার পাশে বসে থাকত, কখনো কখনো মন থেকে আবৃত্তি করে আমাকে লেখাত; অন্য সময়ে শুধু চুপ করে আমার কাজ দেখত।

'পড়তে শিখেছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে কখনো লিখতে পারব না। বড্ডো দেরিতে আরম্ভ করি কিনা,' বারবার সে বলত।

তার স্ত্রী আমাদের দিত সবুজ চা আর চুরেক নামের মিষ্টি চাপাটি। মাঝে মাঝে উটের খুব কড়া ফেনিল দুধ নিয়ে আসত জগে করে। আমাদের খুব দোস্তি জমে গেল, আমি তো দু সপ্তাহ বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেলাম।

৫

যে কবিতাগুলো চল্লিশ বছর ভেলমুরাত-আগা বাঁচিয়ে রাখে সেগুলো একটি বিখ্যাত তুর্কমেন কবির রচনা। কবিতাগুলো নিয়ে এলাম আশখাবাদে। সারা তুর্কমেনিয়ার গাঁ থেকে সংগৃহীত আরো অনেক কবিতা

তাতে যোগ করেন পণ্ডিতেরা। শীগগিরই একটি বৃহৎ ও অতি মূল্যবান বই ছাপাখানা থেকে বেরোবে — উপরোক্ত কবিটির সমস্ত রচনার সংগ্রহ। বেরোবার অপেক্ষায় আছি অধৈর্যভাবে। আমার ইচ্ছে বইটার দশ কপি নিয়ে তাড়াতাড়ি যাব আমার বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে।

সে বলবে, 'তাহলে দেখছি মিছিমিছি তুমি বইটার নকল করোনি। ওটার প্রত্যেকটা কথা এক একটা মাদী-উট আর তার বাচ্চার সমান।'

আর আমার তরফ থেকে বৃদ্ধকে বলব যে এখন বইটা পড়বে একজন লোকে নয়, দশ জনে নয়। পড়বে তুর্কমেনিয়ার সমস্ত লোক। তারপর অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হবার পর বইটা পড়া হবে মস্কোয় আর তাশখন্দে, উক্রেনে আর ককেশাসে। আমাদের জনগণের ক্লেশ ও সাহস, স্বাধীনতার প্রতি তাদের অনুরাগের ফলে সৃষ্ট তুর্কমেন সাহিত্যের এই অমূল্য ধন সমগ্র সোভিয়েত জনগণের, পৃথিবীর সমস্ত বিদগ্ধ মানুষের সম্পত্তি হবে।

তখন হয়ত আরো প্রবল আগ্রহে, আরো গভীর বোধে ভেলমুরাত-আগা বইটা আবার পড়বে। কে জানে, থলের তলায় কত বছর নিরাপদে রাখা প্রাচীন পুঁথিটা হয়ত এমনিতে আমাকে সে দিতে চাইবে! অদ্ভুত পুঁথি! অদ্ভুত, কেননা এতে আছে সেই সব অনুপ্রাণিত কবিতা যা তুর্কমেন চিরায়ত সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে — মাহ্‌তুম-কুলি'র কবিতা।

আবদুল্লা কাহ্হার

আবদুল্লা কাহ্হার কামারের ছেলে, সাদা সোনার (তুলো) দেশ উজবেকিস্তানের ফেরগানা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৭ সালে।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে কাহ্হার তাশখন্দ ভাষা ও সাহিত্য ইনস্টিটিউটের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম অধ্যয়ন করেন।

ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক রচনায় বিশেষ করে হাত খোলে কাহ্হারের। হাসির গল্প তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর হাস্যমুখর কমেডি "রেশমী পোষাক" দেশের অনেক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে।

তিনি শুধু ব্যঙ্গলেখক নন। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে আছে ছোটদের নিয়ে গল্প, যেগুলিতে শিশু মনস্তত্ত্বে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে, কয়েকটি উপন্যাস যেগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে উজবেকিস্তানের সাধারণ কর্মীদের জীবন ("কশচিনারের আলো") এবং অতীত নিয়ে কয়েকটি অত্যন্ত নাটকীয় ছোট গল্প।

গৃহযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা "দৃষ্টিদান" তাঁর সেরা গল্পের অন্যতম।

দৃষ্টিদান

আর তাই আহ্‌মেদ পালোয়ান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। হয়ত বলা উচিত যে মৃত্যু তার প্রতীক্ষায় আছে... পরলোকে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই, কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের ভার যে সর্দারের হাতে তার পাশে বলির পাঁঠার মতন বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার ক্ষমতা তো তার নেই।

জল্লাদ বেঁটেখাটো ষণ্ডাগোছের ছোকরা। সে ঠেলা দিতে লতার মতো দুলে চিৎ হয়ে পড়ে গেল পালোয়ান, পিছনে আড়মোড়াভাবে বাঁধা হাতদুটোয় শরীরের চাপ দিয়ে।

জল্লাদের জবর একটা লাথিতে উঠে দাঁড়াতে হল পালোয়ানকে।

ওঠবার সময় পালোয়ান কাঁধ বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কোনো জায়গা মচকে বা ভেঙে গিয়েছে কিনা, কিন্তু হঠাৎ একটা তিক্ত দৈন্যতার সঙ্গে মনে পড়ল যে এখন ভাঙা বা মচকানোর কোনো মানে নেই তার কাছে।

জল্লাদের আর একটা ধাক্কা, এবার অত জোরে নয়। পালোয়ান ছুটে, বরঞ্চ কয়েক পা নেংচে পৌঁছল মাটির মঞ্চটার একেবারে সামনে। মঞ্চের ওপরে গদীতে শুয়ে আছে দলের পাণ্ডা, কানা কুরবাশি, পরনের ডোরাকাটা পোষাকটা একেবারে তেল চিটচিটে। কুরবাশির ডান দিকে আসীন কুঁজো উলেম, তাদের ধর্মগুরু; বাঁ দিকে হলদে মুখ তাবিব — ভারতীয় ডাক্তারটি। পিছনে গৃহকর্তা নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে। বুড়ো লোকটি ছটফটে প্রকৃতির, দেখতে বাদুড়ের মতো।

এইমাত্র গোটা এক প্লেট পোলাও উদরস্থ করেছে কুরবাশি; গুটিভরা

গালে তেলের চকচকে ছিটে, চিরুণি-না-পড়া চাপদাড়িতে চালের শাদা দানা। অন্য যে কোনো সময়ে তার বর্বর দৃষ্টিপাতে অত্যন্ত নির্ভীক লোকেও ভয়ে শিঁটিয়ে যেত, কিন্তু এই মুহূর্তে চর্বচোষ্য ভূরিভোজের ফলে তার পেটটা বেজায় ভারি, কেমন যেন অসাড় আর ইচ্ছাশক্তিবিহীন হয়ে পড়েছে সে। জগদ্দল শরীরের প্রতি পেশী অদম্য ঘুমের ঘোরে শিথিল হয়ে আসছে, চাপা ক্রোধের আগুন জ্বালাবার বৃথা চেষ্টা তার।

অতিকষ্টে যে চোখটা ভালো সেটা খুলল সে, সেই মুহূর্তে চোখে বলতে গেলে কিছু দেখল না। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে যত জোরে পারে হাঁকল কুরবাশি :

'বেটা জাহান্নমের কীট! দোস্তদের নাম শোনার জন্য আর কতক্ষণ সবুর করতে হবে আমাদের?'

আগেকার মতো চুপ করে রইল আহমেদ পালোয়ান। যা বলেছে তার বেশি আর কি বলতে পারে? ইসমাইল এফেন্দিকে* সে হত্যা করেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কুঠার ছাড়া তার তো আর কোনো দোস্ত ছিল না।

ইসমাইলকে নিজের প্রধান সর্দার ভাবত কুরবাশি। সত্যি শকুনটার ডান পাখার সামিল ছিল এফেন্দি। একবার যখন লাল তারা মার্কা একটি ঘোড়সওয়ারের গুলি লাগে ইসমাইল এফেন্দির বুকে আলকার-মাজার'এর কাছে, তখন ঘোর যুদ্ধের মধ্য থেকে তাকে ছিনিয়ে কুরবাশি নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ঝড়ের মতো নিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে। এত জোরে ওরা পিছু তাড়া না করলে বিশ্বস্ত সর্দারের ক্ষতস্থান বেঁধে দিত কুরবাশি। কিন্তু উঁচু তীক্ষ্ণ হেলমেটে লাল তারা আঁকা ঘোড়সওয়াররা পলাতকদের এত নাছোড়বান্দাভাবে অনুসরণ করে যে কোনোখানে মুহূর্তেকের জন্য পর্যন্ত থামার প্রশ্ন ওঠেনি।

নিজের দলের ঘোড়সওয়ারদের অর্ধেককে হারিয়ে কুরবাশি যখন আহমেদ পালোয়ানের পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছয় তখন রাত্রি। এফেন্দির প্রচুর রক্তপাত

* এফেন্দি — সাহেব।

হচ্ছিল, সে বলল তাকে আর নিয়ে যাবার দরকার নেই, কোনো বিশ্বস্ত লোকের বাড়িতে তাকে রেখে যাওয়া হোক।

সে গ্রামে কুরবাশির অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু তিনজন সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল। কিন্তু তাদের কারো বাড়িতে এফেন্দিকে রাখা যায় না। ওরা সবাই বে। আর কুরবাশির খুব ভালো করে জানা ছিল যে সে সময় সতর্কতার খাতিরে লাল তারা সৈনিকেরা ধনী ও গণ্যমান্য বে'দের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন। কুরবাশির সুবিবেচনায় এফেন্দির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হল কোনো গরিবের কুঠি, তাই পালোয়ানের দীন কুঁড়েঘরে মুমূর্ষু লোকটিকে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত সে করে।

কুরবাশির হাত থেকে এফেন্দিকে নিয়ে আহমেদ পালোয়ান কথা দিল যে আহতের দেখাশোনা সে শুধু করবে না, শান্তিতে নির্ঝামেলায় তার থাকার ব্যবস্থাও করবে। কুরবাশি ও তার ঘোড়সওয়াররা চলে গেল আরো নিরাপদ স্থানে। রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের কথা রাখে পালোয়ান।

এফেন্দির আরোগ্য লাভ বা মৃত্যুর জন্য সবুর করেনি আহমেদ পালোয়ান; পাছে কুরবাশি ফিরে এসে বন্ধুকে নিয়ে যায় সেই ভয়ে সে আহতকে ভারি কুঠারের এক ঘায়ে শান্তি জোগায়, চিরশান্তি জোগায়।

গভীর একটা গর্তে এফেন্দিকে চাপা দেবার সাঁইত্রিশ দিন পরে কুরবাশি আহমেদকে ধরে বেঁধে বস্তার মতো তুলে নিল ঘোড়ায়। গাঁয়ের এক বে তাকে পালোয়ানের কর্মের কথা জানিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে দু দিন এভাবে যেতে যেতে তার শরীর নড়বড়ে। এফেন্দির মৃত্যুর ঠিক চল্লিশ দিন পর তাকে যেতে হল ডাকাতদলের সর্দার, কুরবাশির বিশ্বস্ত অনুচরের রক্তের দাম দিতে।

এখন সে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু কথা বলল না কুরবাশি। প্রতিশোধের ক্রোধ পুরোপুরি জাগাবার যে চেষ্টা তাকে করতে হয় তাতে তার সর্বশক্তি নিঃশেষ। ঘুম তাকে আচ্ছন্ন

করল, মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকে, তার নাসিকা গর্জন কানে গেল কুঁজো উলেমের, হলদে-মুখ তাবিবের আর বাদুড়মার্কা ক্ষুদে বুড়োটার।

মঞ্চে বসে বসে উলেম, তাবিব এবং ছটফটে বুড়োটা শঙ্কায় এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নামা, প্রতীক্ষায় তিতিবিরক্ত লোকগুলির আর জল্লাদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা তাদের।

অবশেষে সাহস করে কুরবাশিকে একটা ধাক্কা দিল উলেম। থরথর করে কেঁপে উঠে, মাথা পিছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুরবাশির মনে পড়ে গেল যে সূর্যাস্তের সময় পাশের একটা গাঁয়ে হামলায় নিয়ে যেতে হবে ঘোড়সওয়ারদের। সেখানে বিরোধী চাষীদের সঙ্গে একটা হিসেবনিকেশ অনেক দিন করা হয়নি। সূর্য তখনি নিম্নগামী, অস্ত যাবে ঘণ্টা দু তিন পর, অতএব কুরবাশি ঠিক করল যে বদমাইসটাকে সাবাড় করার সময় হয়েছে। তার ভালো চোখটা নেকড়ের চোখের মতো জ্বলে উঠে নিবদ্ধ হল পালোয়ানের উপর।

ভয়াল সে চোখের দিকে অবিচলিতভাবে তাকাল পালোয়ান, নিজের ক্লান্ত অথচ দৃঢ় চোখ নামাল না।

খুব জোরে শরীরটা সামনে টেনে কুরবাশি গলা ফাটিয়ে চেঁচাল:

'নোংরা কাফের কোথাকার! তোর কি মনে হচ্ছে — পেছনে জল্লাদ দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে একটা বা দুটো জিন্দিগী?'

পেছনে বাঁধা হাতের ফোলা আঙুলগুলো একটু নড়ে উঠল পালোয়ানের, সরাসরি কুরবাশির মুখে তাকিয়ে সে বলল:

'হুজুর! যা বলার সব বলেছি, আর কিছু বলার নেই। এফেন্দি গরিবদের জান নিত, আমি তার জান নিয়েছি, আর এখন আপনি আমার জান নেবেন ... কিন্তু মারা যাবার আগে আমি এমন একটা জিনিস করতে চাই যেটাতে আল্লা খুসি হবেন, যেটা করলে আল্লা ...'

'বুরবক!' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'আল্লার নাম মুখে আনিস না বলছি!'

হেসে পালোয়ান বলল, 'আল্লাকে অমর্যাদা করার কথা স্বপ্নেও ভাবি কি করে? না, হুজুর, আমার শেষ মুহূর্তে অন্য সব জিনিসের কথা ভাবছি। আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাই, হুজুর। আমাকে একটা কাজ করতে দিন, সেটাতে আল্লা খুসি হবেন, আপনারো উপকার হবে, হুজুর, বিজ্ঞ লোক আপনি!'

কুরবাশি হিংস্রভাবে গর্জে উঠল: 'তুই আমার কী উপকার করতে পারিস?'

'হুজুর,' পালোয়ান বলল, 'আপনি সিংহের মতন জোরদার, আমি মৌমাছির মতন দুর্বল। কিন্তু জানেন তো, মৌমাছির কথায় কান না দেওয়াতে সিংহের প্রায় সর্বনাশ হতে চলেছিল? আমাকে অবজ্ঞা করবেন না হুজুর, আপনাকে একটা রহস্য আমি জানাব।'

রাগ না হাসির দমকে কুরবাশির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু সেটা চেপে একটা হাই তুলল সে। আলাপ চালানোয় তার অনিচ্ছা, সেটা জানিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল:

'তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, কুত্তা কোথাকার!'

'এখন আমাকে দেখছেন এক চোখে, কিন্তু দু চোখে দেখতে হয়ত পারবেন,' আপত্তি জানিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল পালোয়ান আর কুরবাশির মুখে রাগ আর হতবুদ্ধির একটা ভাব দেখে আস্তে আস্তে আরো বলল, 'হুজুর, বাঁ চোখে আপনি দেখতে পারেন না, কালো জল পড়েছিল বলে। কিন্তু আপনার কানা চোখের দৃষ্টি আমি ফিরিয়ে আনতে পারি — অন্ধলোককে আরোগ্য করার গোপন বিদ্যা আমার জানা।'

'আরোগ্য' কথাটা কানে যাওয়াতে ভারতীয় তাবিব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উলেমকে জিজ্ঞেস করল দণ্ডিত লোকটা কী বলছে। তাবিব উজবেক ভাষা সম্যক বুঝত না।

উজবেক ভাষায় আরবী শব্দ এখানে সেখানে ব্যবহার করে, যা বলা

হয়েছে তার মর্মার্থ উলেম ব্যাখ্যা করাতে ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে তাবিব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

"মিথ্যে কথা বলছে নির্ঘাৎ," সে ভাবল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্দেহকে সন্দেহ করে কঠোরভাবে নিজেকে প্রশ্ন করল: "লোকটার এই বড়ো মিথ্যেয় যদি সত্যের দানা থাকে একটা, তাহলে?"

কুরবাশি হঠাৎ ফিরল তাবিবের দিকে। বলল:

'তাবিব, এ লোকটার গোপন বিদ্যা তোমাকে উপহার দিচ্ছি। রোগ সারাবার গুণ তোমার তো বিশেষ জানা নেই, হপ্তায় তিনবার তুমি এমনভাবে কাঁপো যেন শয়তান পাপীকে ঝটকা দিচ্ছে, নিজের শরীরের রোগ তুমি সারাতে পারো না। অন্ধলোককে সারাবার গোপন বিদ্যাটা এর কাছ থেকে জেনে নাও, তাহলে তোমার গুণ বাড়বে।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে কুরবাশি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুল। বাড়ির ক্ষুদে ছটফটে কর্তা তাকিয়াগুলো তখুনি সেখানে বসিয়েছিল। ভাগ্যিস তাকিয়া ছিল, নইলে হয়ত হেসে ফেটে পড়ত কুরবাশি, এত জোরে ওঠাপড়া করছিল তার বাজখাঁই ভুঁড়ি। কুরবাশির হঠাৎ ফূর্তির ছোঁয়াচ লাগল অন্যদের, এমন কি কঠোর-মুখ উলেম পর্যন্ত একটি স্মিত হাসি চাপতে পারল না, আর বাদুড়মার্কা ক্ষুদে বুড়োটা একবার জোরে হেসে উঠল। এই অশোভন ফূর্তিতে যোগ দিল না শুধু তাবিব।

অবশেষে ধাতস্থ হল কুরবাশি।

'বোকাটার নানা গল্প শুনতে আর পারি না!' দম ফিরে আসার পর বলল সে। 'তাবিব, তুমি কথা বলো ওর সঙ্গে!'

তাকিয়ায় আরাম করে বসে, রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে কুরবাশি বিদ্বেষের একটা হাসি হেসে আরো বলল:

'এও তো হয় যে ইঁদুর ধরে বেড়াল তখুনি সেটাকে সাবাড় না করে একটু খেলা করে প্রথমে... আমরাও কিছুটা খেলতে পারি... তাই না, তাবিব?'

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে তাবিব ফিরল পালোয়ানের দিকে। কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল তাকে:

'কখনো অন্ধলোকের দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছ তুমি?'

'না,' সহজভাবে জবাব দিল পালোয়ান। 'নিজে কখনো কাউকে সারাইনি, কিন্তু একবার আমার বুড়ো গুরু একজন অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্ধলোকটি দৃষ্টি ফিরে পেল আর বুড়ো লোকটি নিজে অন্ধ হয়ে গিয়ে মারা গেলেন।'

'মারা গেলেন কীসে?'

'নিজের দৃষ্টিশক্তি অন্ধলোকটিকে দিয়েছিলেন বলে।'

অসাড় আঙুলগুলোকে আবার বেঁকিয়ে শান্তকণ্ঠে যোগ করল আহমেদ পালোয়ান:

'হুজুরের কানা চোখে নিজের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আমিও অন্ধ হয়ে যাব।'

এ উত্তরে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি এমন ভান করে তাবিব আরো কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল:

'তোমার গুরুর কী নাম ছিল?'

পালোয়ান বলল যখন সবাই দেখবে যে সে সত্যি সত্যি একজনকে আরোগ্য করতে পেরেছে শুধু তখুনি গুরুর নাম বলবে।

তাবিব আর একবার মাথা নাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হল। তার মাথায় জ্ঞানের চেয়ে কুসংস্কারের বোঝা বেশি, যদিও চিকিৎসা বিদ্যা কিছুটা তার জানা ছিল।

তার মনে হল পালোয়ানের কথাটা অসম্ভব, এমন কি অস্বাভাবিক, কিন্তু অনেকদিন আগে শোনা গুরুদের উপদেশও মনে পড়ল। গুরুরা সর্বদা বলতেন যে প্রকৃতিতে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা চলে না। তাবিব নিজের ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না বটে, কিন্তু তা নিয়ে ইয়ার্কি করতে পারে শুধু কুরবাশির মতো মস্তিষ্কবিহীন লোক। মহা হাকিমেরা

পর্যন্ত রোগব্যাধির কাছে মাথা নত করে। কিন্তু যে জিনিস সিদ্ধ লোকের কাছেও অজানা সেটা যেমন-তেমন লোক জানতে পারে কি?

চকিত দৃষ্টিতে পালোয়ানের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল তাবিব: যা হবার হোক, এ সুযোগ সে ছাড়বে না।

তার অপরিচিত ভাষায় থেমে থেমে সে পালোয়ানকে জিজ্ঞেস করল কুরবাশিকে সারাবার জন্য কী কী ওষুধ বা গাছগাছড়া তার দরকার।

পালোয়ান জানাল তার দরকার- ছটা 'ভুলো-না-কখনো' ফুল, দুটো খুর্মা, একটা ডিম, এক চামচ মধু আর এক চিমটে যোয়ানের বীজ। নিজের বাড়ির বিষয়ে জাঁকী সেই ছটফটে বুড়ো বে'র কাছে সব ছিল, ফুল বাদে। ফুল আনতে গেল একজন ঘোড়সওয়ার।

'তোমার আরো কিছু চাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল তাবিব।

'হ্যাঁ,' বলল পালোয়ান। 'একটা তামার কেটলি আর একটা মোমবাতি।'

বুড়ো জিনিসগুলো আনল। পালোয়ান বলল মোমবাতিটা কুরবাশির কানা চোখের ঠিক সামনে রাখা দরকার। কেটলিটা বসাতে হবে আগুনে, দুটো চায়ের পাত্রে জলভরে ঢালতে হবে কেটলিতে।

সবকিছু করা হল।

কেটলিতে জল ফুটছে, তখন পালোয়ান তাবিবকে বলল মধুটা জলে গুলে দিতে, ডিমটা ফাটিয়ে তাতে ফেলতে আর খুর্মা ও যোয়ানের বীজগুলো জলে ছেড়ে দিতে।

আরো বলল, কেটলির পাশে বসে যে ঘোড়সওয়ারটা মিশেলটা ঘাঁটছে তাকে যেন ফুলগুলো দেয় সেই ঘোড়সওয়ারটি যে ফুল এনেছে। প্রথম ঘোড়সওয়ার ফুলগুলি পেতে পালোয়ান তাকে হুকুম দিল সে যেন ছটা ফুল গুণে মিশেলে ফেলে দেয়।

তাবিব একবারও সতর্ক দৃষ্টি ফেরায়নি পালোয়ানের উপর থেকে। প্রক্রিয়াগুলির পূর্বাপর মনে রাখার চেষ্টা সে করে চলেছে কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহে সে জর্জরিত।

"সত্যি যদি লোকটার গোপন বিদ্যেটা জানা থাকে!" এটা ভেবে সে হিসেব করতে বসল গোপন বিদ্যা তার নিজের রপ্ত হয়ে গেলে কত লাভ হবে। প্রথমত, কুরবাশির পৃষ্ঠপোষকতা তার আর দরকার হবে না, অন্য কারোর ছুরি বা গুলির সাহায্য না নিয়েই বিষের দ্রুত মাধ্যমে তাকে সরাতে পারবে। সত্যি, এমন একটা জবর রহস্যের চাবিকাঠি যার হাতে তাকে সম্বর্ধনা করতে পারলে ভারতের যে কোনো সহর কৃতার্থবোধ করবে। তাহলে ডাকাত দলের এই নিষ্ঠুর সর্দারের কৃপাভিক্ষা সে করবে কেন? এমন কি সে ফিরে যেতে পারবে নিজের সহরে যেখান থেকে অন্যান্য তাবিবের হীন ষড়যন্ত্রের ফলে জোচ্চোর আর গন্ডমূর্খ বলে সে নির্বাসিত হয়। বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত হয়ে সে যখন ফিরে যাবে, ফিরে যাবে এমন তাবিব হয়ে যার তুলনা পৃথিবীতে কখনো হয়নি, তখন এই সব হীন আর হিংসুটে তাবিব কী বলবে, কী বলবে উচ্চ শিক্ষিত হাকিমরা, কোথায় ঢাকবে নিজেদের লজ্জা?

কেটলি থেকে ওঠা নীলচে বাষ্পরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এ ধরনের সব চিন্তা ভিড় করছিল ভারতীয় তাবিবের মাথায়।

কেটলির দিকে নজর রেখেছিল পালোয়ানও।

নীলচে বাষ্প যখন কুঁকড়ে শাদা হতে শুরু করল তখন পালোয়ান বলল কেটলিটা সরাতে আর এমন সব পাথর আনতে যাদের জল স্পর্শ করেনি কখনো।

'লেয়াও পাথর,' হুকুম দিল কুরবাশি। হঠাৎ তার মালুম হয়েছে যে পাশের গাঁয়ে হামলা চালাবার আগে ঘোড়সওয়ারদের একটা তামাশা দেখিয়ে উত্তেজনা জোগাতে হবে আর তামাশার শেষ করবে সে, স্বয়ং কুরবাশি, শেষ করবে মজার ও রক্তাক্ত একটা কসরতে।

নিজেদের পোষাকের খুঁটে করে তিনজন ঘোড়সওয়ার পাথর এনে আহমেদ পালোয়ানের পায়ের কাছে জড় করল।

পালোয়ান বলল প্রত্যেকটা পাথর তাকে আলাদা করে দেখাতে। শেষ পর্যন্ত তিন সাড়ে তিন সের ওজনের একটা পাথর সে বেছে নিল।

'ঠিক জানি না পাথরটায় কখনো জল লেগেছে কিনা,' বলে সে ওদের হুকুম করল সেটাকে ঘষে মেজে লাঙলের লোহার ফলকের মতো করে দিতে।

'যা বলছে কর!' আদেশ দিল কুরবাশি। ষণ্ডামার্কা ছোকরা একটি ঘোড়সওয়ার একটা হাতুড়ী নিয়ে কাজ শুরু করল। এরকম হাতুড়ী জাঁতার পাথর তৈরির কাজে লাগে।

পালোয়ান তাবিবের দিকে ফিরে বলল:

'হাকিম! আমার এখন মানুষের রক্ত চাই!'

'কোথায় পাবো?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলে তাবিব তাকাল কুরবাশির দিকে।

পালোয়ানের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুরবাশি।

'আমি দেব রক্ত!' কুরবাশির দিকে ফিরে বলল পালোয়ান। 'হুজুর, জল্লাদকে বলুন আমার একটা আঙুল কেটে নিতে!'

নানা কণ্ঠের চাপা আওয়াজ বিরাট উঠোনটায় গড়িয়ে মিলিয়ে গেল।

কোঁকড়ানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে কুরবাশি এমনভাবে বলল যেন স্বগতোক্তি করছে:

'তাহলে তো তোর হাতের বাঁধন খুলতে হয়!'

'হুজুর! আপনি তাহলে আমাকে ডরান!' বলে কুরবাশির মুখের দিকে উদ্ধতভাবে তাকাল পালোয়ান।

দাড়ি শক্ত করে চেপে টান দিল কুরবাশি, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠল, তাতে গুটিগুলো আরো ফুটে উঠল।

'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে!' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে! দুজনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়া ওর দুপাশে। আর জল্লাদ, তুই তলোয়ার খুলে ওর ওপর কড়া নজর রাখ!'

খোলা তলোয়ার হাতে তিনজন ঘিরে দাঁড়াল পালোয়ানকে, ছুরি দিয়ে কাটাতে বাঁধনের দড়িটা মাটিতে পড়ে গেল। মাথার উপরে হাত তুলে নাড়াল পালোয়ান।

'এক খণ্ড কাঠ আর একটা বাটি নিয়ে এসো!' হাতের কব্জার কড়া ঘষতে ঘষতে হুকুম দিল পালোয়ান।

কাঠ আর বাটি এল। কোথায় সেগুলো রাখতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান।

'তুমি তৈয়ার হও, জল্লাদ!' শান্তকণ্ঠে সে বলল। 'যখন চেঁচিয়ে বলব "কাটো" ঠিক তখনি কাটতে হবে কিন্তু!'

বিড়বিড় করে জল্লাদ কী বলল শোনা গেল না।

তাবিবকে ডেকে পালোয়ান বলল, 'হাকিম! এখানে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরুন!'

মঞ্চ থেকে নেমে এল তাবিব, বাটিটা নিয়ে যেখানে তাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে সেখানে দাঁড়াল।

হাঁটু গেড়ে বসল পালোয়ান। বাঁ হাতের চারটে আঙুল চেটোয় মুড়ে কড়ে আঙুলটা রাখল কাঠের উপরে।

ছটফটে বুড়োর বাড়ি আর উঠোনে এত গভীর স্তব্ধতা তখন যে একটি উড়ন্ত প্রজাপতির ডানার ফৎফৎ শব্দ কানে এল স্পষ্টভাবে।

কুঁজো উলেমের হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল, শাদা হয়ে গেল মুখ, দু হাতে মুখ ঢাকল সে। খুব সম্ভবত 'কাটো', এ চীৎকারটা বা হাওয়ায় তলোয়ারের শিস তার কানে যায়নি।

যখন সে চোখ খুলল তখন পালোয়ান একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাবিব রক্তপাত রোখার জন্য ক্ষতস্থানে কী একটা গুঁড়ো ছড়াচ্ছে। পালোয়ানের মুখে ঘামের চকচকে বড়ো বড়ো বিন্দু, সে নিশ্বাস ফেলছে হাঁপিয়ে, সশব্দে।

উলেম আড়চোখে দেখে নিল যে বাটিটা আর শূন্য নয়, কীসে যেন ভরা, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে পালোয়ানের আধ-বোজা চোখের পাতা কেঁপে উঠল। হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল রক্তপাত কমে এসেছে।

'পাথর তৈয়ার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাথর তৈয়ার?' প্রতিধ্বনির মতো পুনরুক্তি করল কুরবাশি, তারপর হাত নাড়িয়ে অধীরভাবে বলল, 'নিয়ে আয় এখানে!'

সে মুহূর্ত পর্যন্ত কুরবাশির কোনো সন্দেহ ছিল না যে মৃত্যু এড়াবার জন্য পালোয়ান তাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। কিন্তু এখন তার প্রায় নিশ্চিত ধারণা যে এই অবোধ্য লোকটা তার কানা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে। করুণা বা করুণাজাতীয় কিছুর অস্পষ্ট একটা অনুভূতি তার নিষ্ঠুর বুকে সাড়া জাগিয়েছে, পালোয়ানের দিকে যেভাবে এবার সে তাকাল তাতে ক্রোধের ভাবটা কম।

নানা নির্দেশ দিয়ে চলল পালোয়ন। এমনভাবে সেগুলো পালন করা হল যেন স্বয়ং কুরবাশির নির্দেশ।

লাঙলের ফলার মতো বানানো পাথরটা নিয়ে এল বিরাটদেহ ঘোড়সওয়ার। পালোয়ানের নির্দেশ মতো তাবিব সেটাতে লাগাল কেটলিতে তৈরি মিশেলটা। যে মন্থরগতির জন্য তাবিবের একটা হোমরা-চোমরা ভাব সেটা সে ঝেড়ে ফেলে খুব চটপটভাবে কাজ করছে, তার আর কোনো সন্দেহ নেই পালোয়ানের সম্বন্ধে, তার বিশ্বাস মহান রহস্যের চাবিকাঠি চলে আসবে তার হাতে, সেই তাবিবের হাতে যে কুরবাশির ডাকাত দলে বিপজ্জনক আর কঠিন কাজে হয়রান হয়ে গিয়েছে।

পাথরটা নিয়ে তাবিব এমন একটা জায়গায় গেল যেখানে হাওয়া খেলে, কেননা পালোয়ান বলেছে যে পাথরটা শুকিয়ে যাওয়া চাই। ঠিক সে সময়ে তার মনে পড়ল পালোয়ান বলেছে যে, অন্ধকে দৃষ্টিদানের শক্তি যার সে নিজে অন্ধ হয়ে যাবে অন্যকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে। এটা মনে পড়াতে তাবিব এত ভয় পেয়ে গেল যে হোঁচট খেয়ে আর একটু হলে পাথরটা ফেলে দিত। কিন্তু আর একটা কথা তার মনে হল:

"আমি শুধু বড়োলোকদের সারাব আর এত টাকা হবে যে, যে কোনো ভিখিরি আমার জায়গায় অন্ধ হয়ে যেতে রাজি হবে..."

এটা ভেবে সে তাজা হয়ে উঠল। হাওয়া খেলে এমন একটা জায়গায় পাথরটা রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

'এরপর সবকিছু আমিই করব,' বলল আহমেদ পালোয়ান। গুরুতর একটা কাজ করেছে এমনভাবে মঞ্চে উঠল তাবিব। তার দিকে তাকিয়ে রইল পালোয়ান, কাটা হাতের রক্তপাত তখন বন্ধ হয়েছে। হাতটা কাঁধ বরাবর নামিয়ে, কুরবাশির দিকে ফিরে সসম্ভ্রমে বলল, 'যদি হুজুর অনুমতি দেন তাহলে পাথরটা শুকোনো না পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিই।'

'বোস, বোস!' তাড়াতাড়ি বলল কুরবাশি। আশেপাশের লোকে তার কণ্ঠস্বরে হয়ত সদয়তার একটা ছাপ পেত, কিন্তু সে ভাঙা খেঁকী গলায় নরম সুর আসার উপায় ছিল না।

তিনজন রক্ষীর মাঝখানে উবু হয়ে বসে পালোয়ান শ্রান্তভাবে মাথা নোয়াল। হাঁটুর উপরে আঙুলকাটা হাতটা না থাকলে মনে হত একটা চাষা অল্প জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছে, আবার ক্ষেতে বা বাগানে এই কাজ শুরু করবে। মৃত্যু যার অনিবার্য সেই লোকটির অদ্ভুত শান্তভাব দেখে কুরবাশি অবাক, এমন কি শঙ্কিত বোধ করল।

এতদিন পর্যন্ত কুরবাশির ধারণা ছিল মানুষের মনের সমস্ত অলিগলি তার নখদর্পণে। যুদ্ধে সৈনিক, ক্ষেতে চাষী সে খুন করেছে, রক্তপাত করেছে ক্যারাভান পথের বালিতে, গ্রামের পদদলিত রাস্তায়, স্ত্রীপুরুষের জীবন নিয়েছে, অনেক সময়ে ভেবে দেখেনি পর্যন্ত তারা দোষী কিনা — এভাবে হাজার হাজার লোকের জান নিয়েছে কুরবাশি। আজকের এই প্রৌঢ় চাষীটির মতো শত শত বন্দী দাঁড়িয়েছে তার সামনে, কিন্তু তাদের কয়েকজনকে মাত্র তার মনে আছে, কারণ মৃত্যুর আগে তাকে শাপ ও গালিগালাজ দেবার সাহস দেখিয়েছে কয়েকজন মাত্র।

আর কোনো কারণে না হোক, আহমেদ পালোয়ান দুর্বোধ্য এই জন্য যে সে শাপান্ত করেনি, করুণা ভিক্ষা করেনি, বুদ্ধিসঙ্গতভাবে, খাতির দেখিয়ে যুক্তি করেছে।

কী ধীরস্থিরভাবে বিশ্রামটা উপভোগ করছে দুর্বোধ্য মানুষটা! তা দেখে যন্ত্রণা দেবার যত উপায় কুরবাশির জানা সব কটা সে ভেবে দেখল একবার, কিন্তু এমন একটার কথা মনে হল না যেটা পালোয়ানের অস্বাভাবিক প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

"শয়তানটার অনুভূতি বলে কিছু নেই। লোকটা আমার ঘোড়সওয়ার দলে যোগ দিলে একাই একশ হত!" ভাবল কুরবাশি আর রাগ ও তারিফের একটা ভাবে তার বুকটা ভরে উঠল, কেননা সে জানত যে পাথরকে ভাঙা চলে কিন্তু বাঁকানো যায় না।

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তার ভারি যাঁতা এভাবে চালাল কুরবাশি যতক্ষণ না উলেম তার কাঁধের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল:

'সময় কেটে যাচ্ছে, হুজুর!'

ঝিমুনো যাঁতিওয়ালার মতো গা ঝাড়া দিয়ে কুরবাশি হুমকির হাঁক ছাড়ল:

'হেই! কাজ শুরু করলে হয় না?'

'আজ্ঞে, হুজুর!' মাথা তুলে শান্তভাবে বলল পালোয়ান। 'পাথরটা বোধহয় শুকিয়েছে... এখানে আনুক ওটা।'

বিরাট-দেহ ঘোড়সওয়ারটি তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করল। তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে পালোয়ান তেকোণা ধারালো মুখটা আস্তে আস্তে দেখে নিল আঙুল দিয়ে।

'হুজুর!' পায়ের কাছে পাথরটা রাখতে রাখতে সে শুরু করল। 'চিকিৎসা আরম্ভ করার আগে জিজ্ঞেস করতে চাই ...'

'যে তোকে মারা হবে না, এই তো?' বাধা দিয়ে কুরবাশি বলে উঠল। ভালো চোখটা জ্বলে উঠল অশুভ জয়ের একটা ঝিলিকে। 'সেটা সম্ভব নয়, শুনছিস ভাঁড় কোথাকার! সেটা অসম্ভব, কেননা তোর হাতে এফেন্দির খুন লেগে আছে ...'

'ঠিক বলেছেন হুজুর!' বিনীতভাবে বলল পালোয়ান, যেন কুরবাশির

কথার যাথার্থ্য সে স্বীকার করছে। 'কিন্তু আপনার ডান হাত হবার আগে এফেন্দি কী ছিল বলুন।'

'সে ছিল খাঁটি মুসলমান আর মুসলমান শাসকের সৈনিক!' গুরুত্বপূর্ণভাবে বেশ ঠাটের সঙ্গে জবাব দিল কুরবাশি।

'তা শুনেছি,' সহজভাবে মেনে নিল পালোয়ান। 'কিন্তু এও শুনেছি যে বিদেশের সেই শাসককে যখন সমুদ্রতীরের শাদা প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন এফেন্দি স্বদেশে ফিরে যেতে চায়নি।'

সতর্কভাবে মাথা নাড়াল কুরবাশি।

ঠিক আগেকার মতো সহজভাবে বলে চলল পালোয়ান, 'এরকমটা ঘটে তাহলে। তাহলে নিজের দেশ ছেড়ে এফেন্দি বিদেশে, আমাদের দেশে রয়ে গেল, তাই না? আমাদের দেশে কী করল সে? আপনি আর জবাব দেবেন না, আপনাকে আমিই বলছি... আপনার পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে এফেন্দি গ্রামে আগুন লাগাত, খুন করত, লুঠতরাজ চালাত...'

নিজের নিচু জায়গা থেকে কুরবাশির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠল পালোয়ান:

'সেজন্য আমি তার জান নিয়েছি!'

'কুত্তা! শুয়োর কোথাকার!' ভাঙা গলায় চীৎকার করে কুরবাশি ছোরার বাঁট ধরার জন্য আলখাল্লা হাতড়াতে লাগল।

'চিকিৎসার কথাটা!.. আপনি চিকিৎসার কথাটা ভুলে গিয়েছেন!' বাঁ দিক থেকে আর্তনাদ করে উঠল তাবিব, আর ডান দিক থেকে উলেম হলদে হাতে পালোয়ানকে দেখিয়ে খ্যানখ্যানে গলায় সুর মেলাল:

'হুজুর, আপনাকে ঠকাতে দেবেন না ওকে! দেখছেন না, বদমায়েসটা সহজে মরতে চায়!'

'সাচ বাত্, উলেম... তুমিও ঠিক বলেছ, তাবিব...' জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে গরগর করে বলল কুরবাশি। 'কিন্তু ছুরি নিয়ে খেলার বিষয়ে কুত্তাটা যেন হুঁশিয়ার থাকে! কথাটা কানে যাচ্ছে, বেটা শয়তান?'

'যাচ্ছে, হুজুর!' আগেকার মতো, হয়ত বা আগেকার চেয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিল পালোয়ান। 'মাফ করবেন হুজুর, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার রাগ এখনো জেগে আছে কি না?'

'সেটা জানায় তোর কী দরকার?' জিজ্ঞেস না করে পারল না কুরবাশি।

'কারণ আপনার রাগকে আমি যত না ভয় পাই তত ভয় পাই আপনার দয়ালুভাবকে...'

আবার কুরবাশি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস না করে পারল না:

'বুঝলাম না...'

'শীগগিরই বুঝবেন!' বলল পালোয়ান। 'আমি আপনাকে সারাতে চাই, তাই না? তাই আমার ভয়ের কারণ আছে যে যখন আপনার কানা চোখে আলোর ফুলকি জ্বলে উঠবে তখন কৃতজ্ঞ হয়ে আপনি আমার জান নেবেন না।'

'হুঁ, দেখছি তুই একটা বিদঘুটে ভাঁড়!' রাগত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল কুরবাশি।

'একটু সবুর করুন, হুজুর, আমি এখনো শেষ করিনি...'

'বল কী বলবি, কিন্তু ঘেনাস না।'

'বেশ, হুজুর! এই দেখুন আমার আঙুলকাটা হাত, আর এই হল আমার এক জোড়া চোখ। চোখের আলো যখন আপনাকে দেব...'

'বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল কুরবাশি। 'তার পর?'

'আপনি আমাকে বাঁচতে দেবেন সেটা আমি চাই না ... বাজারে বাজারে যাকে ভিক্ষের অন্ন চেয়ে বেড়াতে হয় তার জীবনের কী মানে?'

'বিজ্ঞ লোকের মতো কথা বলেছিস বটে,' কুরবাশি হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল:

'কিন্তু তোকে বাঁচতে দেব, এ কথাটা মনে হল কেন?'

এতক্ষণ পালোয়ান উবু হয়ে বসেছিল, এবার দাঁড়িয়ে উঠে কুরবাশির হাসি মুখে তাকাল।

'আমার সন্দ আছে, হুজুর!' বলল সে।

'না, না, তোর সন্দের কোনো কারণ নেই,' বিদ্বেষপূর্ণ ভরসার সুরে বলল কুরবাশি। 'তুই জানিস যে চিকিৎসা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোর জান নেব... সে জন্যই তো চিকিৎসাটা তাড়াতাড়ি সারছিস না, তাই না, ভাঁড়?'

'তা নয়, হুজুর। চিকিৎসা শুরু করতে আমি তৈয়ার, কিন্তু তার আগে আমার নিশ্চিত জানা দরকার...'

'কী জানা দরকার?'

'যে আপনি আমাকে খুন করবেন।'

'তোকে তো বলেছি...'

'শুনেছি, হুজুর...'

'তাহলে তুই কী চাস?'

'আপনার লোকদের দু একটা কথা বলতে চাই...'

'কেন?'

'আপনাকে রাগাবার জন্য...'

'আমি তো রেগেই আছি...'

'আপনাকে আরো রাগাতে চাই...'

'আর আমার লোকদের যদি বোকা-বোকা কথা তোকে বলতে না দিই?' হেসে অন্য একটা প্রশ্নসূত্রে জবাব দিল পালোয়ান:

'আমার বোকা-বোকা কথাকে আপনি ভয় পান?'

লাল হয়ে উঠে, রক্ষীদের দিকে মাথা নাড়িয়ে চাপা গলায় এমনভাবে কুরবাশি বলল যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করছে:

'আর যদি ওদের বলি একটা বোকার মাথায় তলোয়ারগুলো শানিয়ে নে, তাহলে?'

'আর যদি একটা কানা চোখ চিরকাল কানা থাকে, তাহলে?' জিজ্ঞেস করল পালোয়ান।

তাকিয়ায় লাফিয়ে বসে কুরবাশি তার গর্জনে ভরিয়ে দিল সমস্ত উঠোন:

'শয়তান! যত তাড়াতাড়ি পারিস তোর নোংরা কথা সেরে নে!'

'বেশ, হুজুর!' তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বরের বেয়াড়া ভাবটা বিনীত করে কুরবাশির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ নামাল পালোয়ান।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, আমার সঙ্গে না!' গর্জে উঠে কুরবাশি হাত নাড়িয়ে অন্য লোকদের দেখাল। তারা সাগ্রহে ব্যাপারটা দেখছিল।

মাটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা লোকগুলির দিকে ফিরল পালোয়ান। অস্তসূর্যের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখ ওরা দেখল।

পরিষ্কার জোরালো গলায় পালোয়ান বলে উঠল:

'ভাইসব! তোমরা আমাকে দেখে দেখে ভাবছ, "বোকা লোকটা নিজের সবচেয়ে বড়ো শত্রুর জন্য, হুজুরের জন্য, হাতের একটা আঙুল দিয়েছে আর এখন নিজের দৃষ্টিশক্তি দেবে।" তাতে অবাক হয়ো না। আমি তো শুধু একটা আঙুল আর দৃষ্টিশক্তি দিচ্ছি আর তোমরা নিজেদের দিয়ে দিচ্ছো যাতে দুশমনটা তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নিজের বাপভাইকে যখন তোমরা মারো, নিজেদের গ্রামে আগুন জ্বালাও তখনি নিজেদেরি তোমরা মারো। ভেবো না আমি ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছি! ওরা আমার হাড় মাংস আলাদা করুক, যাঁতাকলে গুঁড়ো করে দিক আমার হাড়, যা ইচ্ছে করুক, আমি তৈয়ার যদি আমার কথার সত্যটা তোমরা বোঝো! আর মিনিট পোনেরোর মধ্যে আমি মরব... কিন্তু মরার আগে জানতে চাই কার খাতিরে তোমরা পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে চারদিক ঘোরো, নিজেদের ভাইদের, তোমাদেরি মতো গরিবদের ক্ষতবিক্ষত করো? বলো আমাকে, সৎ চাষীর হাল ছেড়ে অসৎ রাইফেল ঘাড়ে নিয়েছ কার খাতিরে?'

'চোপ রও, আর কথা নয়, বদমায়েস!' ক্রুদ্ধ কুরবাশি তীক্ষ্ণকন্ঠে চীৎকার করল কিন্তু পালোয়ান তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত, আরো জোরে, আরো উচ্চকণ্ঠে বলে চলল:

'আমাদের লোকে যখন প্রতিবিপ্লবী ডাকাত দলগুলোকে একেবারে শেষ

করে দেবে তখন বড়োলোকরা, ভুঁড়িপেট বে'গ্লো ভয় পাবে... কিন্তু তোমাদের তো কিছু নেই, তোমাদের কীসের ভয়?'

রাগে কুরবাশির মুখ কালো হয়ে গেল, ইশারায় সে জল্লাদকে জানাল তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে পালোয়ানকে মারতে। কিছু না ভেবে হুকুম পালন করল জল্লাদ। টলমল করে উঠল পালোয়ান, কিন্তু পড়ে গেল না।

তারপর কুরবাশি কাঁধের এক ঝটকায় তাবিবের হাত আর উলেমের থলথলে থাবা ছাড়িয়ে মঞ্চের কিনারায় গিয়ে একেবারে পালোয়ানের মুখে হিসিয়ে উঠল:

'তোর বকবকানি শুনেছি অনেকক্ষণ। এবার আমার কথা শোন। আগে ভেবেছিলাম তলোয়ারের এক ঘায়ে মরবি, সেভাবে আর মরবি না, বেটা ভাঁড়, মরবি বুনো শুয়োরের দাঁতের মতন ধারালো ছুরির খোঁচায়। কিন্তু মরবার আগে তাবিব তোর গায়ের ছাল আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেবে, চামড়াটা লাগানো হবে ঢাকের গায়ে, আমার হাতে ঢাকের বাদ্যি তুই শুনবি, তারপর যে ছুরিটা দিয়ে জল্লাদ তোর গলা কাটবে সেটা দেখবি। যা বলবার বলেছি, ব্যস আর কিছু বলার নেই। বকবকানি থামিয়ে এবার নিজের কাজে লাগ!'

নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাটিটা দেবার ইশারা করল পালোয়ান। ইশারাটা লোকে বুঝল। বাটির জিনিসে পাথরটা ভিজিয়ে নিল পালোয়ান। তার অন্যান্য ইশারা কিন্তু লোকের মাথায় ঢুকল না, বোঝাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। বাপান্ত করে কুরবাশি তাকে বলল কী সে চায় কথায় বুঝিয়ে দিতে।

পালোয়ান হুকুম দিল যে খড় এনে সরু আঁটি করতে। তারপর তাবিব আর গৃহকর্তাকে নিজের কাছে ডেকে বলল:

'একটা আঁটি নাও তো কর্তা। আর হাকিম, আপনি পাথরটা ধরুন!'

তার আজ্ঞা পালন করা হল। তখন সে বুড়োকে বলল আঁটিটা জ্বালিয়ে কুরবাশির মুখের কাছে ধরতে।

'তাতে হুজুরের ভালো চোখটা খারাপ হয়ে যেতে পারে!' আপত্তি জানাল বুড়ো।

'ভালো চোখটা একটা রুমালে বেঁধে দাও তাহলে,' হুকুম দিল পালোয়ান। চোখ বাঁধার পর তাবিব আর বুড়োকে কুরবাশির সামনে হাঁটু গেড়ে বসার আদেশ দিল সে।

'এবার মোমবাতিটা জ্বালানো হোক। দেখতে হবে আলোটা যাতে নিভে না যায়,' বলল সে।

মোমবাতি জ্বালানো হল। দপদপে শিখার দিকে তাকাল পালোয়ান। তাবিবের দিকে ফিরে বলল:

'হাকিম, পাথরের ধারালো দিকটা কানা চোখের দিকে ধরে এভাবে দোলান!..'

কী করতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান। তাবিব পাথরটা কয়েকবার ছুঁড়ে লুফে নিয়ে এদিক-ওদিক দোলাতে শুরু করল।

'আস্তে, আরো আস্তে!' চেঁচিয়ে উঠল পালোয়ান। 'মা ছেলেকে যেমনভাবে দোল দেয় সেটা ভাবুন!'

মনে হল মায়ের দোলানি তাবিব কখনো দেখেনি, কেননা পালোয়ান বারবার তাকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

'আস্তে, আস্তে, রয়ে সয়ে ...'

তাবিব যতই চেষ্টা করুক, পালোয়ান চেঁচাতেই লাগল:

'ওভাবে নয়, ওভাবে নয়! আবার শুরু করুন!'

ইতিমধ্যে খড়ের চতুর্থ আঁটিটা ধরিয়েছে বুড়ো, জ্বলন্ত খড়ের ধোঁয়ায় আরোগ্যপ্রার্থী কুরবাশির দম বন্ধ হবার জোগাড়।

শেষ পর্যন্ত তার সহ্যের সীমানা পেরিয়ে গেল। তাবিবের অপটুতায় বিরক্ত হয়ে কুরবাশি হুঙ্কার দিল:

'ওকে পাথরটা দিয়ে দাও, তাবিব! যেভাবে দোলাতে চায় নিজে দোলাক!'

আবার কুরবাশির কাঁধের উপর ঝুঁকে উলেম ফিসফিস করে তার কানে

কী যেন বলল। খুব সম্ভব সাবধান করল যে প্রভুর হুকুমটা বিপজ্জনক, কেননা কুরবাশি তাকে গালি দিল।

'বেটা গর্ভস্রাব আমার কী করতে পারে!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল। 'জল্লাদ আর তলোয়ার হাতে দুটো লোক তাহলে আছে কেন? ওরা আরো কাছে সরে আসুক, লোকটাকে আনুক এখানে!'

ওরা পালোয়ানকে নিয়ে গেল মঞ্চে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল অসিধারীরা।

কুরবাশির সামনে নতজানু হয়ে পালোয়ান বলল:

'হুজুর! উলেমের মনে যাতে কোন খটকা না থাকে সেজন্য আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হোক!'

ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে কুরবাশি বলে উঠল, 'ওর চোখ বেঁধে দে।'

চোখ বাঁধার পর পালোয়ান বলল, 'হাকিম, আমাকে পাথরটা দিন।'

তার প্রসারিত হাতে পাথরটা ঠেলে দিয়ে বিব্রতভাবে পাশে সরে দাঁড়াল তাবিব।

'মোমবাতিটা দেখবেন, হাকিম!' বলল পালোয়ান। 'আর দেখবেন পাথরের ছুঁচলো দিকটা যেন সব সময় কানা চোখের সামনে থাকে। হুজুর, কাজ শুরু করছি!'

...আস্তে আস্তে, সমানভাবে পালোয়ান সামনে পেছনে দোলাতে লাগল পাথরটা। দোলানিতে খড় আরো জোরে জ্বলে উঠল, ধোঁয়া উঠল ঘন আরো ঘন হয়ে, ঢেকে গেল আহমেদ পালোয়ান ও কুরবাশির মাথা। দৃষ্টিদাতার পিছনে মোমবাতির শিখা কাঁপছে, দপদপ করছে। তাবিব আর সবাই তাকিয়ে রয়েছে শিখাটার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে নজর রেখেছে পালোয়ানের হাতের উপর।

চোখ বাঁধা সত্ত্বেও সে হাতের গতিবিধি এত নিখুঁত যে পাথরের ছুঁচলো দিকটা সব সময় কানা চোখের সামনে রয়েছে। লক্ষ্য থেকে পাথরটা একটু সরে গেলে হুঁশিয়ারি দেবার সময় পর্যন্ত পেল না তাবিব, কারণ দৃষ্টিদাতা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: 'আলো!' আর তখন নিমেষের জন্য সবাই তাকাল মোমবাতিটার দিকে, তাবিবও।

ঠিক সে মুহূর্তে পাথরের ছুঁচলো কোণটা ভেদ করল কুরবাশির রগ।

পর মুহূর্তে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল জল্লাদের তলোয়ার, আর পালোয়ানের মৃতদেহ পড়ে গেল মৃত কুরবাশির উপর।

তলোয়ার মোছবার সময় পর্যন্ত পেল না জল্লাদ, একটি ঘোড়সওয়ারের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটল।

প্রথম গুলির পর আর একটা গুলি, তারপর আর একটা: কুরবাশির সহচররা এ-ওকে হত্যা করতে শুরু করল দারুণ যুদ্ধে। মাঝরাত পর্যন্ত চলল লড়াই।

মাঝরাতে বাদুড়মার্কা ক্ষুদে বুড়োর বাড়িটায় আগুন লাগল। আলোর বিরাট একটা শিখা শূন্যে উঠে আশেপাশের গ্রামকে জানিয়ে দিল মরণ ঘটেছে সেই কুরবাশির যাকে অনেক লোক 'কানা বাঘ' বলে ডাকত।

ইউরি রীৎহেউ

এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপান্তে, তুষারাবৃত তুন্দ্রা এবং চিরতুহিন দেশ চুকৎকায় ইউরি রীৎহেউ জন্মান ১৯৩০ সালে। উত্তরাঞ্চলের কঠোর প্রকৃতির সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে কাটে চুকচিদের জীবন, সংখ্যায় নগণ্য হলেও তারা গুণী ও পরিশ্রমী। চমৎকার শিকারী ও হাড়-খোদাইকার হিসেবে চুকচিরা পরিচিত।

জার আমলে অবলোপ যাদের কপালে লেখা ছিল, যাদের নিজস্ব বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না, সেই চুকচিদের প্রথম লেখক ইউরি রীৎহেউ। শিকারীর ছেলে রীৎহেউ, নিজে শিকারী, তিনি লেখেন "প্রভাত" যৌথখামারের কর্মীদের নিয়ে, লেখেন চুকৎকায় নতুন জীবনের কথা।

তাঁর নানা ছোট গল্প ও ছোট উপন্যাস 'বরফ গলার সময়' বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বরফ খণ্ডে অতর্কিতে সমুদ্রে ভেসে যাওয়া শিকারীর গল্প 'একটি মানুষের অদৃষ্ট' তাঁর সেরা লেখার একটি।

একটি মানুষের অদৃষ্ট

বরফ গলছে। শাদা থেকে নোংরা হলদে রং ধরেছে বরফে; ইতিমধ্যে জায়গায় জায়গায় মাটি ফুটে বেরিয়েছে। আবহাওয়া গরম, আকাশ নীলে নীল। সংক্ষিপ্ত বসন্ত রাত্রে অন্ধকার ঈষৎ গাঢ় আর রাত্রি আরো ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু বসন্তের সূর্য তাড়াতাড়ি ওঠে। আর তিন চার দিন, বড় জোর এক সপ্তাহ, তারপর সূর্য আর অস্ত যাবে না, ঠিক কিনারা দিয়ে দিগন্ত ছুঁয়েই আবার উঠবে আর উষ্ণ রোদে বরফের বাকিটুকু দেবে গলিয়ে। সকাল হবে, দিন ও সন্ধ্যাও হবে, কিন্তু রাত্রি দেখা দেবে না একেবারে — সেই গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে নয়।

কী সুন্দর! বসন্তের মাসগুলিতে বসতি আগেভাগেই জেগে ওঠে। কারও ঘুমোতে ইচ্ছে করে না — শীতকালে অনেক ঘুমোনো গেছে। যাই হোক না কেন, বুনো হাঁসের বিরাট দল বসতির মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, তখন জাত শিকারী বিছানায় শুয়ে থাকবে, এটা কে আশা করে? বুনো হাঁসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, উনপেনের বলে সে সিন্ধুঘোটকের চিৎকার শুনতে পেয়েছে! আর উনপেনের এমন আদমি যাকে বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে: বসন্তে যদি সমুদ্রের জন্তু গর্জন না করে তো করবে কখন? যে ভাবেই হোক, এই তো সিন্ধুঘোটক শিকারের সময়, এই তো সমুদ্রে শিকারের জন্য প্রাথমিক আক্রমণের কাল।

বরফ ঠিকমতো গলে চলেছে বটে কিন্তু উপকূলে বরফের চওড়া বলয় এখনো বেশ শক্ত, উপরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ভারি তুষারস্তূপ। ওগুলোতে

বহু ফাটল, বলয়টা কিন্তু অখণ্ড। প্রতিদিন তীরের বরফের বলয় থেকে সমুদ্র কিছু কিছু কেটে নিয়ে যাচ্ছে — ঢেউগুলো দলের পর দল ভাসমান বরফরাশিকে নিয়ে চলেছে উত্তরে। কিন্তু তবু বন্ধনহীন জলরাশি থেকে সমুদ্রতীর বেশ দূরে, হয়ত পাঁচ অথবা ছয় কিলোমিটার বরফে ঢাকা।

জলের কিনারায় বরফের উপর বসে আছে শিকারী কেনিরি। বন্দুকটি হাঁটুর উপর, তীক্ষ্ম চোখে তালে আছে যদি একটা শীলকে অলক্ষিতে পাকড়ানো যায়। মুখে একটা খুশির ভাব: মাথায় গুলি-খাওয়া দুটো জানোয়ার এরিমধ্যে পাশে পড়ে আছে। কেনিরির টিপ ভালো! একটু সবুর কর দেখি, ঢেউয়ের উপর একটা শীল গোল মাথাটা যদি একবার তোলে ...

রোদ্দুরে কেনিরির খুশি লাগছে, ভাঙ্গা তুষারস্তূপের উপর সূর্যের আলো চকচক করছে আনন্দে, তাকে ছুঁয়ে আদর করছে। বাতাস গরম আর আমেজে ভরা, মোটেই সেই শীতকালের মতো নয় যখন কনকনে ঠাণ্ডায় ভাসমান বরফ ভেদ করা জলের কিনারায় শীলের আশায় বসে থাকতে হয়। আর এখন কেনিরি তার জায়গা ছেড়ে নড়তে চাইছে না একেবারে।

যাবার সময় হয়েছে অবশ্য। দলপতি তাকে সকাল আটটায় কাজে হাজিরা দেবার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। নৌকোয় মেরামতের কাজ করতে হবে। সে ভাবল, এরিমধ্যে কি সাতটা বেজে গেছে?

সেদিন সকালে কেনিরি খুব তাড়াতাড়ি উঠেছে। সমুদ্রতীরে আসতে কেউ দেখেনি তাকে। সে নিজে থেকে ঠিক করে যে কিছুটা শিকার করে আটটা নাগাদ ফিরে যাবে। খুব বেশী হলে ন'টায় ... নৌকো তো আর শীল নয় — জলে দৌড়ে পালাবে না। মেরামতের কাজ ন'টাতেও আরম্ভ হতে পারে।

কিন্তু শিকার এমন জিনিস যে সহজে ছেড়ে উঠে আসা সম্ভব নয়, বিশেষ করে কেনিরির মতো যদি কারো কপাল খোলে। তার নিশ্চিত ধারণা যে তিন নম্বর শীলের দেখা পাবে। ব্যস, তারপর চলে যাবে চটপট।

কিন্তু তিন নম্বর শীলের তাড়াহুড়ো নেই আসার। বেশ তো, তাই যদি

হয় কেনিরি সবুর করবে। সে বসে আছে নরম শীল চামড়ার থলের উপর, পিঠ খাড়া হয়ে আছে পুরোনো তুষারস্তূপের গায়ে। যে জায়গা বেছে নিয়েছে তা এত আরামের যে না নড়েচড়ে সেখানে সারা দিন বসে থাকা যায়। আর শিকারীর পক্ষে এর চাইতে ভালো আর কিছু নেই। একটুও নড়াচড়া নেই — শরীরের এতটুকু নড়নচড়নে উপস্থিতি জানান দেওয়া হবে না — এই তো শিকারের সেরা নিয়ম।

কেনিরি নিশ্চয়ই নিয়মটা খুব বেশী করে মানছে, এত বেশী করে যে বাস্তবিক, অল্প রোদ্দুরে, কোমল হাওয়ায়, ঢেউয়ের এবং তার নিজের চিন্তার অলস প্রবাহে ঝিমিয়ে পড়ে ঘুম-ঘুম ভাব থেকে শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে উঠল মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়াতে।

"তাহলে... আমার এখন অবশ্যই যাওয়া উচিত মনে হচ্ছে," সে ভাবল, "নইলে শীগ্‌গিরই এত বেশী ঝিমুনি আসবে যে ঘুমিয়েই পড়ব।"

মানসচক্ষে দেখতে পেল যে শিকার নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে। ছেলেরা ছুটে আসছে তার কাছে। তাদের প্রত্যেকে — চার ছেলের প্রত্যেকে — একটি করে শীল চোখ পেয়েছে — এটা তাদের বড়ো মুখরোচক। কিন্তু তার স্ত্রী এবার শীল চোখের স্বাদ পেল না, সে নিজেও না। আর একটা শীল দেখা দিলে সকলের কুলিয়ে যেত।

সমুদ্রে বহুদূরে স্টীমার থেকে দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল। "ও, তাহলে ওরা বেরিয়ে পড়েছে, সত্যি নাকি," কেনিরি ভাবল। স্টীমার সম্পর্কে সে জল্পনা কল্পনা করতে শুরু করল — কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কতক্ষণ আছে সমুদ্রে ... কেনিরি ঠিক করল আরো কিছুক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ না স্টীমারের ধোঁয়া তার বরাবর হয়। তা হতে আধঘণ্টার বেশী লাগবে না। যখন ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে ধোঁয়া দেখার দরকার হবে না তখন ঘরমুখো রওনা হবে। ইতিমধ্যে যদি তিন নম্বর শীল দেখা দেয়, বহুৎ আচ্ছা, আর যদি না দেয় তা নিয়ে সে আক্ষেপ করবে না। একবারে দুটো শীল শিকার এমন কিছু খারাপ নয়।

এইভাবে প্রশ্নের সমাধান করে কেনিরি ঘুমোতে লাগল। এবার তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে না পড়ে আস্তে আস্তে কাঁধের উপর হেলে পড়ল। সে কল্পনা করতে লাগল শিকার নিয়ে সে বসতির রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তায় বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল, তার একজন হল বুড়ো মেমীল। বৃদ্ধ একটা শীল পরীক্ষা করল, পরে আর একটা, তারপর বলল, "একেই আমি বলি খাসা শিকারী! দেখ দিকি, দু' দু' বারই ওদের মাথায় মেরেছে, চোখগুলো কিন্তু আস্ত আছে। মরদ বটে!" কেনিরি ঘুমের মধ্যে হাসল। প্রশংসা পাওয়া সব সময়েই ভাল, বিশেষ করে বুড়ো মেমীলের কাছ থেকে, সে তো তাকে নিষ্কর্মা এবং হাড়-আলসে বলে গাল দেয়। সবখানেই তাকে গালমন্দ করে — সভাতে, এমন কি প্রাচীর-পত্রিকাতেও, আর এখন — সে কেনিরির তারিফ করে তাকে মরদ বলছে। যাই বল না কেন, বুড়ো মেমীল খাসা লোক! কেনিরি লজ্জা পেয়ে ঠিক করল এখন বিষয়টা বদলানো যাক, জিজ্ঞেস করা যাক কটা বাজে। "সাড়ে সাতটা," বুড়ো মেমীলের পাশে দাঁড়িয়ে যৌথখামারের মুহুরী রচগীনা উত্তর দিল। "তাহলে এবার আমাকে যেতে হয়," কেনিরি বলল। "শীলগুলোকে বাড়ি নিয়ে যাই, আটটা নাগাদ কাজে হাজির হব।"

তারপর যে স্বপ্ন দেখতে লাগল বাড়িতে এসেছে। শীলের একটা চোখ সে দিচ্ছে তার ছোট্ট কোল্‌কা'কে। কোল্‌কা দু'হাত দিয়ে ওটাকে নিয়ে মুখের মধ্যে এক গালে পুরে দেওয়াতে গালটা ফুলে উঠে প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে গেল — প্রচণ্ড রকমের বড়ো। গাল ভেদ করে চোখটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, আরো পরিষ্কার। না, এটা শীলের চোখ নয়, বুড়ো মেমীলের চোখ। বুড়ো চোখ কুঁচকিয়ে কঠোর সুরে বলল, "আবার ফাঁকিবাজি? ধিক তোমাকে, দলের সবাই তোমার অপেক্ষায় রয়েছে আর তুমি পালিয়ে এসেছ সাগরপারে।" কেনিরি কাঁপতে লাগল, লজ্জা পেল তার চাউনিতে, চেষ্টা করল ফিরে পালাবার, কিন্তু সেটা হয়ে উঠল না। দলে যোগ দেবার সময় তখনো আছে বলতে গিয়ে বলতে পারল না।

সৌভাগ্যক্রমে মেমীলের কোঁচকান চোখ মিলিয়ে গেল। কেনিরি কল্পনা করল সে নৌকো চড়ে যাচ্ছে। মোটর বন্ধ করাতে নৌকোটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলতে লাগল...

জেগে কেনিরি ভাবল সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল — প্রথমবারের মতো সেকেণ্ডখানেকের বেশী নয়। স্টীমারের ধোঁয়ার জন্য চারদিকে চেয়ে কিছু দেখতে পেল না। কোথায় গেল? তবে কি সে স্টীমার চলে যাওয়ার মতো অতক্ষণ ঘুমিয়েছে আর ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে দিকচক্রবালে? উঠে দাঁড়িয়ে কেনিরি প্রাণভরে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে দু'পাশে হাত ঘষল। "ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে," সে ভাবল। "রোদ্দুর যতটা গরম ছিল ততটা নেই।" শীলদুটোকে বাঁধবার জন্য ঝুঁকে পড়াতে আবার হঠাৎ সেই ঘুমের মধ্যেকার মৃদু দোলানি অনুভব করল সে। একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফেরাল তীরের দিকে। যা দেখল তাতে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। শীলদুটো হাত থেকে খসে পড়ল। বরফ-ঢাকা উপকূল থেকে খসে-আসা বরফখণ্ডের উপর সে সমুদ্রে ভেসে চলেছে! তার সুমুখে অবারিত জলের কালো বিস্তার। দূরে, বহুদূরে আয়ত্তের বাইরে খাঁজ-কাটা বরফ-ঢাকা উপকূল আর বসতি চোখে পড়ে না মোটেই।

কেনিরি ভাসমান বরফের কিনারায় ছুটে এসে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। চিৎকার করে চলল সে, আহত জানোয়ারের মতো বাক্যহীন আশাহীন সেই চিৎকার, মাথার উপর হাত নাড়তে আর পা দাপাতে লাগল। তারপর, হঠাৎ একসঙ্গে সমস্ত শক্তি হারিয়ে সে পড়ে গেল, তার গলা থেকে তখনো ক্ষুব্ধ চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসছে কোনক্রমে।

যা হোক, কয়েক মিনিটের মধ্যে হতাশার ভাবটা কেটে গেল। কেনিরি উঠে বসে যেদিকে বসতি বলে তার ধারণা সেদিকে তাকাল। এখন কী করা সম্ভব?

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কিছু ভেবে পেল না সে। একমাত্র জিনিস হচ্ছে — অপেক্ষা করা, উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করা এবং যতক্ষণ

পারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। তার সঙ্গে আছে দুটো শীল আর বারোটা কার্তুজ, বাস্তবিক বলা যেতে পারে আরো বারোটা শীল! দশটার কম তো নয়ই। খাবার তার অনেক দিন ধরে চলবে, ভাসমান বরফ যতদিন টিকে থাকবে তার চাইতে বেশী।

ক্ষিধেয় সে মারা পড়বে না, এটা নিশ্চিত। বিপদটা তা নয়। আসল বিপদ হল, দিন দিন ভাসমান বরফ ক্ষয়ে যেতে থাকবে, আরো পাতলা, ছোট এবং ভঙ্গুর হতে থাকবে, তারপর একেবারে গলে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যতক্ষণ ভাসমান বরফ আস্ত আছে ততক্ষণে যদি ওরা তাকে রক্ষা করতে না আসে, তাহলে কেনিরি তার বাচ্চাদের, তার স্ত্রীকে, তার বন্ধুদের আর দেখতে পাবে না, এখানেই তার সব খতম হয়ে যাবে।

এরপর কেনিরি বরফে শিকারীর ভেসে-যাওয়ার সব ঘটনা মনে করতে লাগল। খোদাইকারী গেমাউগের ছেলে ইনরীন বাল্যাবস্থায় একবার ভেসে গিয়েছিল। তখন সে পনেরো বছরের হবে। কেনিরির সে কথা বেশ মনে আছে — সে নিজে ছিল উদ্ধারকারী দলে। তারা ভাবে ছেলেটি মরে গেছে, কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে পাশের বসতি থেকে শিকারীরা তাকে বাড়ি নিয়ে এল — শ্রান্তিতে অজ্ঞান অবস্থায় বরফের উপর থেকে ওরা ওকে উদ্ধার করে।

লোকে বলে মেমীলও ভেসে গিয়েছিল। সে বহুদিন আগের কথা — এমন কি কেনিরিও জন্মায়নি তখন। সত্যি, মেমীল ভেসে গিয়েছিল বহুদূরে বিদেশের সমুদ্রতটে; ওরা বলে বিদেশে সে সাত বছর ঘোরে। কিন্তু শেষটায় সে ফিরে আসে ঠিক, যে ভাবেই হোক, ফিরে তো আসে!

কিন্তু ওরা দু'জনেই ভেসে যায় শীতকালে। তার অবস্থার সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। শীতকালে একখণ্ড ভাসমান বরফ একটা ভেলার সমান। ওতে করে এক মাস, এমন কি প্রয়োজন হলে দু'মাস পর্যন্ত ভেসে যাওয়া যায়, গলবার কোনো ভয় নেই। কিন্তু বসন্তকালে ... গত বছরের আগের বসন্তে উস্ত-আমগুয়েমা থেকে একজন শিকারী ভেসে গিয়েছিল — তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরফখণ্ড নিশ্চয়ই খুব ছোট ছিল। বসন্তকাল

এমন একটা সময় যখন বরফের উপর মানুষ বেশী দিন থাকতে পারে না। সূর্য বরফকে উত্তপ্ত করে, ঢেউগুলো অল্পে অল্পে গ্রাস করে এক গেলাস চায়ের মধ্যে এক ডেলা চিনির মতো।

বাড়ি যাবার, সামনে এক মগ গরম চা নিয়ে টেবিলে বসার কী প্রবল মরিয়া বাসনা জাগল কেনিরির! হাতদুটোকে গরম করার জন্য মগটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা, উষ্ণ সুরভি বাষ্পকে নিশ্বাস ভরে নেওয়া, চা'টা আস্তে আস্তে ছোট্ট চুমুকে খাওয়া ... আহা, মাত্র এক চুমুকও মিলত যদি!

যতই সে ভাবে ততই ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হতে থাকে: তার উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা কম, খুব কম। ছেলেদের কথা ভাবতে তৎক্ষণাৎ মনে হল ... "হয়ত আমি আর ওদের দেখতে পাব না।" ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা হঠাৎ পরিবর্তিত হল মৃত্যুর পরিষ্কার নিষ্ঠুর সম্ভাবনায়। প্রথমে তাকে অভিভূত করেছিল পশুর মতো ভয়, আর এখন যে অনুভূতি তাকে আঁকড়ে ধরল তা হল চরম হতাশা, সেটা তার মর্মস্থলকে বিদ্ধ করল।

ধীরে ধীরে কেনিরি উঠে থলির কাছে গেল। এখন থেকে হালকাভাবে আর হুঁশিয়ার হয়ে তাকে পা ফেলতে হবে যাতে এই ছোট বরফের চাঁই যতদিন সম্ভব টিকে থাকে; এরি ওপর তার জীবন নির্ভর করছে। থলির উপর বসে ভাবতে লাগল সে। সূর্য বেশ নীচে নেমেছে।

গৃহ আর পরিবারের কথা সে ভাবছে; তার স্ত্রী ইতিমধ্যেই উৎকণ্ঠিত ... উৎকণ্ঠিত নাও হতে পারে — কেনিরি তো প্রায়ই আরো অনেক দেরিতে বাড়ি ফেরে। চারটি বাচ্চার কথা ভেবে ভেবেই স্ত্রী অস্থির — দুই জোড়া যমজ, বড় দু'টি চার বছরের, ছোট দু'টির প্রত্যেকে দু'বছর।

প্রায়ই সে থাকে না, এতে দলের লোকও অভ্যস্ত। দলপতি হয়ত তার বাড়িতে এসে কেনিরি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেছে জেনে গালমন্দ দিয়ে হাত নেড়ে নিজের কাজে চলে গেছেন।

একটি প্রাণীও জানে না সে কোথায় গেছে। এখন পর্যন্ত কেউ তার খোঁজ করেনি, কেউ তার অনুপস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েনি। পরের দিন

সকালের আগে খোঁজ শুরু হবার সম্ভাবনা নেই — যখন এটা জানাজানি হবে যে সে রাত্রিতে বাড়ি ফেরেনি।

সূর্য দিকচক্রবালে নেমে এল, সমুদ্রের বুকে দেখা দিল একটা ঝিকিমিকি স্বর্ণাভ পথ — ভাসমান বরফ থেকে সেইখান পর্যন্ত প্রসারিত যেখানে জ্বলন্ত চক্র জল স্পর্শ করছে। চক্রের নিম্নাংশ অদৃশ্য হয়ে গেল দিক-চক্রবালের নীচে; তারপর সবটাই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল — যেন ডুবে গেল সমুদ্রের অতলে। সোনালী-পথটিও লুপ্ত হয়ে গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, কিন্তু কেনিরি জানে যে আধঘণ্টা কাটতে না কাটতে সূর্য আবার উঠবে, আবার বরফ গলাতে শুরু করবে। ঠিক ওখানেই উঠবে, যেখানে অস্ত গেছে তার একটু ডান দিকে।

বেশীক্ষণ মনমরা হয়ে থাকার লোক নয় কেনিরি। কোনো কিছুই ভালোর দিকে যায়নি বটে, গতদিনের চাইতে বেশী খুশি হবার মতো কিছুই ঘটেনি, তবু কেনিরি গুম্ হয়ে চিন্তা করবে না। এমন কি সবচেয়ে বিষণ্ণ, সবচেয়ে হতাশ অবস্থাতেও কেনিরি মাত্র অল্প কালের বেশী বিষাদগ্রস্ত হয় না। অবস্থার পরিবর্তন নাও হতে পারে কিন্তু কেনিরির বিষাদ ফুরিয়ে যাবে, চলে যাবে।

সকালটা মেঘলা, কেনিরি এতে কিছু সান্ত্বনা পেল, কারণ মেঘলা আকাশ ভাসমান বরফের পক্ষে রোদের চেয়ে কম বিপজ্জনক।

স্রোত তাকে ক্রমশ উত্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, দূরে, আরো দূরে চুকচি সমুদ্রের ভিতরে। কিন্তু খুব ভালোভাবে তীরের দিকে তাকালে একটা সরু, হালকা-রঙ্গা, প্রায় মেঘের-সাথে-মেশা ফালি তখনো চোখে পড়ে। দূরত্বটা তার উদ্ধারকারীদের পক্ষে কিছুই না। নিঃসন্দেহে তারা মোটরবোট নিয়ে আসবে, সঙ্গে থাকবে দূরবীন।

কেনিরি প্রথমে তার নাগালের মধ্যে বরফের শক্ত বহির্ভাগ যতটা আছে সেটা দেখে নিল। প্রত্যেকটি ফাটল আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল, বাস্তবিক

বড়ো গোছের ফাটল একটাও নেই — একদম শেষ প্রান্তে সামান্য কয়েকটি ফুটো আছে মাত্র। একটিমাত্র ছোট টুকরো, শীলের চাইতে বড়ো নয়, রাত্রিতে খসে ত্রিশ মিটার মতো দূরে ভেসে চলেছে।

ভাসমান বরফখণ্ডটা একটা পুরো ইয়ারাঙ্গাকে বইতে পারে। প্রায় একটি সরল রেখায় কয়েকটি তুষারস্তূপ উঠেছে, কোনো কোনোটা মানুষ সমান উঁচু, অন্যগুলো আরো উঁচু। মাঝের দুটো স্তূপের মাঝখানে একটা টাটকা জলের ডোবা, জল জমেছে বরফ গলে। সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে আরো অনেক বরফখণ্ড, উপকূলের তুষারবলয় থেকে বিচ্ছিন্ন, উপরে বরফস্তূপ, মাঝখানে বেশ কিছু ফাঁক।

নিরাপত্তার জন্য কেনিরি তার সমস্ত জিনিসপত্র — বন্দুক, শীল মাছ, চামড়ার থলে, জল থেকে মরা শীল টেনে আনার বল্লম ও লাঠি বরফখণ্ডের মাঝখানটায় নিয়ে এল।

তারপর সে শীলদুটোকে সাফ করে নাড়িভুঁড়ি ছাড়িয়ে একটা স্তূপের পাশে শুইয়ে রাখল। সকালের জলখাবার হিসেবে শীল মাছের কিছু যকৃৎ খেল। কাঁচাই খেতে হল বটে কিন্তু তাতে তার উৎসাহে মন্দা পড়ল না। তার দাঁতে সেটা সইল — তার যা দাঁত তাতে চামড়ার বেল্টও চিবিয়ে খাওয়া যায় — কাঁচা শীলমাংস তো কিছুই নয়। স্বাদটা অবশ্য কেমন-যেন ঠেকল, কিন্তু কেনিরির তখন এত ক্ষিধে যে যে-কোনো জিনিসই তার কাছে অমৃত মনে হত।

ভোজনের শেষ পর্ব ছিল ঠাণ্ডা ও নোনা শীলের চোখ, তারপর টাটকা জল। খাবার পর তখনো অগলিত বরফ নিয়ে ডোবার দক্ষিণ দিক ঘিরে একটি দেয়াল তুলে দিল। মেঘ কেটে গেলে জলটা থাকবে ছায়ায়, উবে যাবে না। তার ধারণা এই যে, দ্রবমান বরফ সমুদ্রে মিছিমিছি না গড়িয়ে ডোবার ভিতর পড়ে নতুন টাটকা জল জোগাবে। কেনিরি তার আবিষ্কারে খুব খুশি হয়ে যেখান থেকে পারল হলুদ-ধূসর ভিজে বরফ খুঁড়ে নিল তার দেয়ালের জন্য, সেটা তখন তার কোমর সমান হয়েছে।

অতঃকিম? কেনিরি তার থলের উপর বসে বন্দুক সাফ করতে লাগল। গতকাল যখন বিপদের হুঁশ হল তখন কয়েকটা গুলি ছোঁড়া উচিত ছিল হয়ত? না, তাতে কারো টনক নড়ত না, কেউ সন্দেহ করত না যে কোনো গোলযোগ ঘটেছে। বসতির চারপাশে শিকারীরা হামেশাই গুলি ছোঁড়ে। যেমন, তার শীল শিকার কাউকে সচকিত করেনি। আসল কথা হল, গতস্য শোচনা নাস্তি। কাল যা করা হয়নি এখন তো আর ফিরে গিয়ে তা করা যাবে না কোনো রকমে। নিজের আর্তচিৎকার আর পা দাপানির কথা মনে মনে পড়াতে সে হেসে ফেলল। ভাগ্যি ভালো, কেউ দেখে ফেলেনি।

অনুসন্ধানের কাজ কবে শুরু হয়েছে, সেদিন বা তার আগের দিন, তাতে কী এসে যায়? বরফখণ্ডে বসে কয়েক ঘণ্টা বেশী ভেসে যাওয়া বই তো নয়—এ ছাড়া আর কী। যথেষ্ট মাংস আছে, জলও আছে আর বরফখণ্ডটা আরো হপ্তাখানেক বা তারো বেশী সময় আস্ত থাকবে। বসতিতে বলার মতো খাসা গল্প পেয়েছে বটে।

যাই হোক, এখন নাগাদ অনুসন্ধান শুরু হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই, সুতরাং দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যদি শুরু না হয়ে গিয়ে থাকে? যদি তারা আদৌ এ কাজ না করে? তার স্ত্রী অবশ্য সবপ্রথমেই যৌথখামার সভাপতি ভামচের কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু ভামচে যদি অনুসন্ধানী দল পাঠাতে না চায় তো কী হবে? "কী?" সে বলবে, "তুমি কেনিরিকে খুঁজে পাচ্ছ না ? তোমার মনে হয় সে সমুদ্রে ভেসে গেছে? বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে তার উচিত শাস্তি হয়েছে। তাকে ছেড়ে তোমার দশা এমন কিছু খারাপ হবে না, আমাদেরও না। আলসেটা কোন কাজে লাগবে? আমি আমার ভালো লোকগুলোকে কাজ থেকে সরিয়ে কেনিরির জন্য তাদের জীবন বিপন্ন করতে পাঠাব না। মোটরবোটটাকেও আমি বিপদে ফেলতে চাই না। সমুদ্রে অনেক ভাসমান বরফ। যদি বোটটা গুঁড়িয়ে যায় তাহলে আমি কী করব? আর লোকজনদের এখন যৌথখামারের কাজে লাগবে।"

পর্ষদের সদস্য বুড়ো মেমীল সে সময়ে ভামচের কাছে থাকলে কিছু

যোগ করবে: "আমি কোনিরির কাছ থেকে কখনো ভালো কিছু আশা করিনি। ও একেবারে অপদার্থ, আত্মম্ভরি ও আলসে। বকাবকি করেছি, তোষামোদ করেছি, এক দল থেকে অন্য দলে বদলি করেছি, আমরা কি ওকে নিয়ে যথেষ্ট হৈ-হাঙ্গামা করিনি? একবার মনে হয়েছে হয়ত ও পথে এসেছে, উচিত মতো কাজকর্মে মন দিয়েছে। এখন দেখছি আবার ভেরান্ডা ভাঁজতে বেরিয়েছে। এটা তার নিজের তৈরী ফ্যাসাদ। পারে তো নিজেই নিজেকে বাঁচাক।"

বন্দুক পুঁছতে পুঁছতে কোনিরি মনে মনে হাসল। ভামচে অথবা মেমীল তাদের জীবনে অবশ্য এরকম কথা কখনো বলবে না। খুব সম্ভব ভামচে নিজেই হয়ত অনুসন্ধানে যোগ দিয়েছে। আর বুড়ো মেমীল স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে যাবে, ওরা যদি তাকে সঙ্গে নেয়। তারা ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান শুরু করেছে, কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তবু কোনিরির একটু অস্বস্তি হল। তার প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের মুখ দিয়ে যে কথা সে বলাচ্ছে সেটা খুলে বলতে গেলে মোটেই খুব বেশী মিথ্যে নয়। তার আলস্য, অহমিকা এবং যেভাবে কাজ করা উচিত তাতে অনিচ্ছার জন্য, কাজে মনপ্রাণ না ঢেলে দেওয়ার জন্য সে একাধিকবার বকুনি খেয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা মানতে হবে যে বকুনিটা তার প্রাপ্য।

আর সত্যি বলতে গেলে সে কি যৌথখামারের কোন কাজে লেগেছে? তার হাতের টিপ ভালো কিন্তু এটাই তো ভালো শিকারীর সব নয়। এছাড়া শিকারীকে হতে হয় শক্ত এবং অধ্যবসায়ী। উনপেনের বা রিনতুভগির চাইতে তার হাতের টিপ কম নয়। ওরা ওর চাইতে সম্ভবত দু'চারটে পয়েন্ট বেশী দাবী করতে পারে। কিন্তু ওরা দু'জন হল বিখ্যাত শিকারী, ওরা সর্বদা কোনিরির চাইতে অনেক বেশী শিকার নিয়ে বাড়ি ফেরে। ওদের ছবি কখনো সম্মান ফলক থেকে বাদ যায় না, ওদের নিশ্চয়ই এমন কয়েকটি গুণ আছে যা কোনিরির নেই।

কোনিরির হাতের গুণ আছে। একবার শ্বশুরকে উপহার দেওয়ার জন্য

এমন একটা চমৎকার স্লেজগাড়ি সে বানায় যে সমস্ত বসতি তার তারিফ করে। কিন্তু হরিণপালক দলের জন্য ভামচে তাকে ও ধরনের একটা বানাতে দিলে সে কাজটা শুরু করে বটে, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোনো দিনই সেটা শেষ হল না। আজও হয়নি।

অসংখ্যবার যৌথখামারের কাজে ফাঁকি দেবার জন্য সে বকুনি খেয়েছে। হয় তুন্দ্রায় গেছে শিকারে নয় নতুন নেকটাই বিক্রি হচ্ছে শুনে সব চাইতে গরমের সময় পাশের বসতিতে গেছে- তার সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে হয়ত বা গেছে সুমেরু স্টেশনে সহকারী চিকিৎসকের সঙ্গে দাবা খেলতে।

দাবার কথা বলতে গেলে এ কথা মানতেই হবে যে "প্রভাত" যৌথখামারের সেরা খেলোয়াড় হল কৌনিরি। কেবল যৌথখামারেই নয়, জেলা দাবা প্রতিযোগিতায় অন্যতম প্রধান স্থান সে অধিকার করে। এমন কি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য তাকে আনাদীরেও পাঠান হয়েছিল। কিন্তু যৌথখামার-কর্মীদের বেশীর ভাগ এটা তার কৃতিত্ব বলে ধরে না, বিশেষ করে কর্তৃপক্ষ...

অবশ্য আনাদীরে কৌনিরি অত্যন্ত খারাপ খেলে পায় একেবারে শেষের আগের স্থানটি। তারপর খাবারভস্কে যৌথখামার দাবা খেলোয়াড়দের প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠায়নি। আনাদীরের খেলায় জয়ী বড়ো আনুয় থেকে আসা আইগীনতো নামে হরিণপালক খাবারভস্কে যাবার আগে বলে: "তোমার হাত ভালোই, কৌনিরি। কিন্তু খেলার নীতি তোমার জানা নেই, তোমার দরকার হল নীতিগুলো ঠিকভাবে জেনে নেওয়া..."

কৌনিরি বন্দুক রেখে দিয়ে উঠে চারদিকে তাকাল। মনে হল সে পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী, মাটির উপর নয়, জলের উপরে। হ্যাঁ, ওদের বাড়িতে রোমাঞ্চ জাগাবার মতো দিব্যি এক গল্প সে ফাঁদতে পারবে...

বন্দুক হাতে নিয়ে আর একবার চিন্তায় ডুব দিল কৌনিরি। পরিবারের কাছে তার সত্যিই সিক খুব দাম আছে? তেয়ুনে তো তার চাইতে দুগুণ রোজগার করে। সেই হল সংসারের আসল ভরসা, কৌনিরি

নয়। সেলাইয়ের দলে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের একজন সে — একমাত্র বৃদ্ধা রুলতীনে সম্ভবত তার চাইতে এগিয়ে আছে।

স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততায় তার ভাবনাচিন্তা নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের দিকে ধাবিত হল আর খুব শীগ্গিরই যে খাতে বইল সেটা আত্মসমালোচনার অনেক বাইরে। স্ত্রীর কথা ভাবতেই গর্বে ফুলে উঠল কেনিরি, যেন বৃদ্ধা রুলতীনে নয়, সে নিজেই তাকে হরিণ চামড়ার পোষাকের উপর সুন্দর নক্সা সেলাই করতে শিখিয়েছে।

যমজদের কথা সে ভাবল বিশেষ স্নেহে; দুজোড়া! সবার তো আর এমন কপাল নয়। অবশ্য এটা ঘটে নিজ থেকেই, সে বা তেয়ুনে জাঁক করার মতো এমন কিছু করেনি। তবু, তাদের দ্বিতীয় যমজ জন্মাবার পর পত্রিকায় যে ওদের সম্পর্কে লিখতে শুরু করে সেটা মিছিমিছি নয়। তেয়ুনে প্রসূতি-ভবনে পুরো একমাস শুয়ে ছিল — ডাক্তাররা ভয় পেয়েছিলেন রাস্তায় বাচ্চাদুটোর ঠাণ্ডা লাগবে। পরে, স্টীমারে যখন কয়েকটা কাঠের বাড়ি এল, তার একটা কেনিরির জন্য আলাদা করে রাখা হল। আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক কমিটি এ বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সমস্ত বসতিতেই তখন ইয়ারাঙ্গা, কেবল পাঁচটি পরিবার গেল নতুন কাঠের বাড়িতে। চার শিশুদৈত্যের বাপ কেনিরি ছিল ভাগ্যবানদের একজন।

বাচ্চাগুলো এখন কী করছে? বড় যমজ দুটি, এইগেলি ও ওমরীলকোত বুঝবে যে বাবার নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে জেনে মা'র মন খারাপ। ছোট দুটিরও বোঝবার বয়স হয়েছে — দুজনেই তিনে পা দিয়েছে। একটির নাম নিকোলাই, আর একটির আলেক্সান্দ্র। তেয়ুনেই চেয়েছিল ছেলেদের রুশ নাম রাখা হোক — সেই ডাক্তারদের সম্মানে যাঁরা শিশুদের যত্ন নিয়েছিলেন। এক জন ডাক্তারের নাম নিকোলাই পেত্রভিচ আর প্রধান চিকিৎসকের নাম আলেক্সান্দ্রা ইভানোভ্না।

কেনিরি সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মতে সায় দেয়। ছেলেদের নাম ও রাখুক নিকোলাই ও আলেক্সান্দ্র। কিন্তু তখন তার সবপ্রথম মনে হল যে ছেলেদের

র্শ নাম থাকলে বড়ো হলে পৈত্রিক নামেরও প্রয়োজন হবে। তারা বড়ো হবে, স্কুলের পড়া শেষ করবে, ইনস্টিটিউটে যাবে পড়তে। কোর্নিরির বিশেষ ইচ্ছে যে ওরা ইনস্টিটিউটে যাক। ঐ যে আতীক তাকে দেখ — তার ছেলে পড়ছে লেনিনগ্রাদে... তারাও যাবে লেনিনগ্রাদে, কোর্নিরির ছেলেরা, তাদের নাম লেখা হবে বড়ো খাতায়, যেমন আনাদীরে প্রতিযোগিতায় যখন সে যায় তারা কোর্নিরির নাম লেখে। তারা অবশ্য তার পৈত্রিক নাম জিজ্ঞেস করেনি — এখানে চুকোৎকায় কারো একটার বেশী নাম নেই। কিন্তু লেনিনগ্রাদে নিশ্চয়ই অন্য ব্যাপার, ছেলেদের পৈত্রিক নামও দিতে হবে। কী নাম হবে? নিকোলাই কোর্নিরিভিচ, আলেক্সান্দ্র কোর্নিরিভিচ... মন্দ নয়, কেমন?

কিন্তু নিকোলাই নিজের বাবাকে আর দেখতে না পেলে কী হবে? সে বড়ো হলে ওরা তাকে বলবে কোর্নিরি ছিল নিষ্কর্মা, অপদার্থ... লোকে যে কী বলবে তা তো বলা যায় না কখনো। বিশেষ করে সেই লোকের সম্বন্ধে যে বে'চে নেই...

কোর্নিরির মনে এখন মোটেই উদ্বেগ নেই। সে ইচ্ছে করেই অপ্রীতিকর কথা সব ভাবছে নিজেকে বিরক্ত করার জন্য। যে কারণেই হোক, তার বিশ্বাস যে শীগ্গির, খুব শীগ্গিরই সমুদ্রে একটা মোটরবোট দেখা দেবে। তার দরকার হল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ... আবার সে বাচ্চাগুলোর কথা ভাবতে শুরু করল।

ওরা যদি কখনো লেনিনগ্রাদে পড়তে যায় তাহলে ওদের গোত্রনামও লাগবে। এটা ভেবে কোর্নিরি একটু বিব্রত বোধ করল। সে জানে বাবার নাম থেকেই পৈত্রিক নামের সৃষ্টি, কিন্তু গোত্রনাম লোকে কোত্থেকে পায়? এ কথা আগে কখনো সে ভেবে দেখেনি। যেমন স্কুলের পাহারাদার স্তেপান খুড়ো। স্তেপান আন্দ্রেয়েভিচ কাবিত্‌স্‌কি। এর মানে হল তার বাবার নাম ছিল আন্দ্রেই। কিন্তু "কাবিত্‌স্‌কি" কেন? স্তেপান খুড়োকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিম্বা সহকারী চিকিৎসক আলেক্সেই ভাদিমিচকে জিজ্ঞেস করা ভালো। মনে হয়, পছন্দসই যে কোন গোত্রনামই বেছে নেওয়া যায়, যেমন চলে

প্রথম নামের বেলায়। বেশ, তাহলে সে বাচ্চাদের জন্য সুন্দর নাম বার করবে। চারটি সুন্দর গোত্রনাম ...

কোর্নিরি নিজের যুক্তি ও চিন্তাধারার রাশ টানত না, কিন্তু উঠতে বাধ্য হল সে। লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে যেতে হল বরফখণ্ডের কিনারায়। সেখানে বেশ কাছে ভেসে চলেছে বিরাট বরফের স্তূপ একটা — ভাসমান তুষারশৈল। কোর্নিরির বরফখণ্ড এর সঙ্গে একবার ধাক্কা খেলে সর্বনাশ অনিবার্য। তুষারশৈল দু'টুকরো করে দেবে। সেটা যাতে না হয় তাই কোর্নিরিকে কিনারায় দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিজের বরফখণ্ডকে তুষারশৈল থেকে দূরে রাখতে হবে।

তুষারশৈল খুব কাছে আসাতে শুধু তখুনি কোর্নিরি দেখতে পেল কী প্রবল বেগে ওটা তার দিকে ধাবমান। যতখানি পারে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কোর্নিরি এগিয়ে-আসা তুষারশৈলের উদ্‌গতস্থান লক্ষ্য করে লাঠি বাগিয়ে ধরল। কিন্তু লাঠিটা হড়কে যাওয়াতে তাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল বরফের উপর। একটা ভারি আওয়াজ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোর্নিরি চারদিকে চেয়ে দেখল। ও, তাহলে এই ব্যাপার, তার বরফখণ্ড ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেছে। ফাটলের উপর দিয়ে লাফিয়ে কোর্নিরি যে অংশটায় তার বন্দুক, থলে ও বল্লম ছিল তাতে গেল। পড়ে গেল সে, উঠে জিনিসগুলোকে ধরল কিন্তু যে অংশটায় শীল মাছ আর লাঠি সেখানে আবার লাফ মেরে যেতে তার ভয় হল। সেই পরিত্যক্ত অর্ধেক অংশকে অল্প বড়ো মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাটলটা প্রতি মুহূর্তে চওড়া হচ্ছে। একটা আতঙ্কজনক জলের বিস্তৃতি কোর্নিরিকে আলাদা করে দিল সেই অংশ থেকে। থেমে ঠাহর করে দেখলে প্রথমবার ওটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আসার সাহস তার কুলোত না। তখন অবশ্য জলের ফাঁকটা অত চওড়া ছিল না। কিছু না ভেবে, না তাকিয়ে ঝাঁপ মেরে সে ভালোই করেছে।

কোর্নিরি তাড়াতাড়ি বল্লম থেকে দড়ির পাক খুলে তাক না করেই ওটাকে

ছুঁড়ে মারল। অন্যটার একটা স্তূপের ভিতর ধারালো লৌহ দাঁত বসে গেল। এত জোরে টান পড়ল দড়িটায় যে টন টন করে উঠল।

এটা ছিঁড়ে গেলে কোনিরির দফা রফা। বল্লম না থাকলে কিছু করা চলে না। ওটা ছাড়া বন্দুকটাও অকেজো হয়ে যাবে। হয়ত একটা শীল মারল, কিন্তু জল থেকে সেটাকে টেনে তোলা যাবে না।

আঁটো দড়িটা হাতে কেটে বসল। পরিশ্রমে কোনিরির মুখ শুকিয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে। কিন্তু ওখানে কালো জলের বিস্তৃতি আর বাড়ছে না, বরফখণ্ডটাও স্থির হয়ে আছে। একমুহূর্ত যেন দ্বিধাভরে থেমে সেটা আবার তার দিকে আসতে লাগল। দড়িটা আর তার হাতে লাগছে না, ঢিলে হয়ে এসেছে।

বরফের অংশকে বিচ্ছিন্ন করা জলের ফাঁকটা বেশ ছোট হয়ে এল, তখন কোনিরি সেটা পেরিয়ে গিয়ে দেখল শীলদুটো জায়গামতো আছে কি না, থলেটাকে বরফের উপর ফেলে একেবারে অবসন্ন হয়ে তার উপর গা এলিয়ে দিল। শুকনো জিভ দিয়ে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটদুটোকে চেটে নিয়ে, যেখানটায় টাটকা জলের ডোবাটা ছিল সেদিকটায় চেয়ে শুধু তখনি দেখতে পেল ফাটলটা চলে গেছে ঠিক ওরই মাঝখান দিয়ে। মহার্ঘ ডোবাটা আর নেই, জলটুকু মিশে গেছে সমুদ্রে আর তার সযত্নে সঞ্চিত বরফও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখন একমাত্র ভরসা হল কোনিরির পায়ের তলায় সামান্য একখণ্ড বরফ। সত্যিই অংশটা ছোট — এমন কি ঘণ্টাখানেক আগেও যা ছিল তার মাত্র অর্ধেক হবে। এত ছোট যে দু'দিনের রোদেও রক্ষা পাবে না।

তাছাড়া এক ফোঁটা খাবার জলও নেই।

চুকচি সমুদ্রে কোনিরির ভেসে চলার আজ তৃতীয় দিন। তীর আর চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে দূরের বরফস্তূপকে তীর বলে মনে হয়, কিন্তু অচিরে সে বুঝতে পারে যে তার মতো ওরাও জোরালো স্রোতে ভেসে চলেছে।

গতকালের চাইতে আকাশ অনেক বেশী পরিষ্কার। এটাকে কোনো হিসেবেই শুভলক্ষণ বলা চলে না। "জায়গা বদলাবার সময় হয়েছে," কেনিরি ভাবল, "আর তাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

সে ঠিক করল যে সুযোগ পেলেই আরো নির্ভরযোগ্য বরফখণ্ডে চলে যাবে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মেছে। কিন্তু সারা সকাল, যেন তাকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে, চাপার মতো কোন বরফখণ্ড সামনে এল না।

কেনিরির খানাটা জমল ভালো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আফসোস হল কারণ ক্ষিধে মিটতেই তেষ্টা তাকে আরো বেশী করে পেয়ে বসল।

দূরে সিন্ধুঘোটকের গর্জন কানে এল। "উনপেনের ঠিকই বলেছিল! গর্জন করছে জানোয়ারগুলো। কী করে সবায়ের আগে উনপেনেরের কানে যায়? প্রতি বসন্তে প্রায় একই ব্যাপার, সেই শোনে সবপ্রথম আর তারই দল শিকারের জন্য সবপ্রথম তৈরি হয়।"

কেনিরির চিন্তা আবার তার বসতির দিকে মোড় নিল। কিন্তু গতকাল সকালের তুলনায় আজ তা কম সরস। শেষ পর্যন্ত যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এখন তাতে সে তত নিশ্চিত নয়। নিজের বদনামের কথা ভাবাতে গতকাল যে সব আশঙ্কাকে ভিত্তিহীন বলে মনে হয়েছিল আজ তা অন্য রূপে দেখা দিল। অবশ্যই ওরা অনুসন্ধান করবে কিন্তু প্রশ্নটা হল কী ভাবে। উনপেনের, রিনতুভগি কিম্বা ভামচে বরফে ভেসে গেলে অনেক আগেই তারা উদ্ধার পেত; একখানা মাত্র মোটরবোট নয়, যৌথখামারের সমস্ত মোটরবোট আর নৌকো তাদের খোঁজে বার হত।

তুষারবলয় থেকে ভাসমান বরফখণ্ড ছিন্ন হয়ে আসার পর এই সবপ্রথম কেনিরির একা মনে হল — সম্ভবত জীবনে এই প্রথম এরকম বোধ।

দুপুরের দিকে, প্রায় বিশ মিটার দূরে আর একটা বরফখণ্ড চোখে পড়ল, বেশ বড়ো সেটা, চার পাশে ঘনসম্বদ্ধ ভাঙ্গা বরফের বৃত্ত। কেনিরি বল্লম ছুঁড়ে মেরে দেখতে পেল বড়ো বরফখণ্ডটা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে,

কিন্তু ওর চার পাশে ভাঙ্গা বরফের ঘন স্তূপের জন্য কৌর্নারি ওটার বেশী কাছে এগুতে পারছে না। আরো ছোট বরফগুলোকে লাঠি দিয়ে সরিয়ে একটা রাস্তা বানানোর কঠোর চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এখান-সেখান থেকে কতকগুলো বরফখণ্ড সরানো গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য বরফখণ্ড তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

তবু কৌর্নারি হাল ছেড়ে দিল না, কারণ ওখানে, বড়ো বরফখণ্ডটার ওপর কয়েকটা বরফের তাল আছে। তার মানে টাটকা জল, যেটা বর্তমানে তার সব চাইতে দরকার। এমন কি এই বরফের টুকরোটা যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়ে যাওয়ার জরুরী প্রয়োজনের চাইতেও এটা জরুরী — এমন আশ্রয় যেটা এখনো বাসন্তী সূর্যালোকের সান্নিধ্যে আসেনি; সে সূর্যের তাপ তো ইতিমধ্যেই ক্রমশ বেশী করে বোঝা যাচ্ছে।

ভাসমান বরফস্তূপের কয়েকটি মনে হল মানুষের ভার বইতে পারবে; কৌর্নারি স্থির করল ওগুলোর উপর পা রেখে পৌঁছবে বড়ো বরফখণ্ডে। এটা বেশ বিপজ্জনক কিন্তু গত্যন্তর নেই।

হাত ঘুরিয়ে থলেটাকে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, বল্লমের দড়িটাকে কোমরে আঁটো করে বাঁধল। "শীলদুটো এখনকার মতো এখানেই থাক," ভাবল সে, "পরে ওদের নিয়ে নিতে পারব।"

কতটা শক্ত দেখার জন্য সব চাইতে কাছের বরফখণ্ডের ওপর বার বার খোঁচা মেরে কৌর্নারি একটার ওপর লাফিয়ে উঠল। তারপর দ্বিতীয়টা ও তৃতীয়টার ওপর ... কিন্তু তার গন্তব্য স্থানের খুব কাছাকাছি এসে পা ফস্কে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল। ভাসমান বরফটুকু একটা ঝাঁকুনি খেল, কৌর্নারি গড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে।

বরফ কুচিতে ভর্তি জল ছিটকাতে লাগল কৌর্নারি, বৃথাই চেষ্টা তার বড় খণ্ডটাকে ধরবার। বন্দুক আর ভেজা জামাকাপড় তাকে নীচে টেনে নিচ্ছে। বহুবার সে তলিয়ে গেল, একবার অনেকক্ষণ ওপরে উঠতে পারল না, মনে হল ঢেউগুলো তার মাথাটাকে চিরদিনের মতো ঢেকে দিয়েছে।

কিন্তু উঠে এল ঠিক, সমুদ্রের নোনা জল মুখ থেকে ছিটিয়ে। আবার বাকি শক্তিটুকু প্রয়োগ করে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড বেগে জল ছিটকানো।

কোমরে বাঁধা বল্লমের দড়িটা হঠাৎ তার হাতে এল। এটার কথা মনে ছিল না। এতে জড়িয়ে যাবার ভয়ে প্রথমটায় সে হাতটা একবার ঝাঁকাল। তখনি শুধু মনে হল যে দড়িটা তাকে বাঁচাতে পারে। তাড়াতাড়ি দড়িটার ওপর হাতের পর হাত রেখে সে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলল, প্রত্যেকটি নতুন মুঠি তাকে আরো উঁচুতে এবং বড়ো বরফখণ্ডের আরো কাছে নিয়ে যেতে লাগল। আর একবার তলিয়ে গেল সে, কিন্তু জলের তলাতেও সে দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি বরাবর এগুতে লাগল যতক্ষণ না তার হাতে লাগল বরফখণ্ডের প্রান্তভাগ।

শেষটায় সে বরফখণ্ডের ওপর উঠে জোরে শ্বাস টানতে টানতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল; মুখ, নাক আর কান থেকে জল বেরুচ্ছে। মাথা ফেটে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা, বরফের টুকরোয় মুখ আর হাত ক্ষতবিক্ষত, বহু ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

হাঁফ নেবার জন্য কিছুক্ষণ থেমে কৌনিরি হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে লোভাতুরের মতো শক্ত বরফে কামড় বসাল একটা। তারপর বিশ্রামের আশায় চিৎ হয়ে শুল। কিন্তু শরীর আর পোষাক সপসপে ভিজে যাওয়াতে এত শীত করছে যে জামাকাপড় ছাড়ার শক্তি সঞ্চয় করে তাকে উঠতে হল।

নীলচে ঠাণ্ডা শক্ত শরীরটাকে সে বরফে ঘষতে শুরু করল; সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে গরম লাগল। তারপর বল্লমটাকে খুলে ফেলল, সেটার লোহার দাঁত বসে গিয়েছিল বরফের গভীরে। দুটো বরফস্তূপের ওপর বল্লমের দড়িটাকে লম্বা করে বেঁধে পোষাকগুলো টাঙ্গিয়ে দিল শুকোবার জন্য। ভারি ভেজা পোষাকের চাপে দড়িটা নেতিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

লাঠিটার খোঁজে চারিদিকে তাকিয়ে কৌনিরি দেখতে পেল সেটা পড়ে আছে বরফখণ্ডের চার পাশে জমা নরম বরফস্তূপের উপর। সে যখন পড়ে

যায় তখন সেটাও খসে গিয়েছিল। লাঠিটা ছিল কাছেই। কোর্নিরি ওটা নিয়ে তাতে বল্লমের দড়িটা টাঙ্গিয়ে দেওয়াতে কাপড় টানাবার দড়ির কাজ দিল। আচ্ছা, একবার যদি তেয়ুনে দেখতে পেত সেয়ানা গৃহস্বামীর মতো সে কী ভাবে সবকিছু করছে!

তখন পর্যন্ত তার মনে পড়েনি যে পরিত্যক্ত বরফখণ্ডের উপর মরা শীলদুটো রয়েছে। দড়িটার কাছে এগিয়ে পোষাকগুলোকে নামাতে গিয়ে তার মনে হল কতখানি অসম্ভব ব্যাপারটা — কোন বল্লমই এখন মরা শীল দেহের কাছে পৌঁছুতে পারবে না, ঢেউয়ে তার আগের বরফখণ্ড ভেসে গিয়েছে। এখন সেটা ভেসে চলেছে পুরো এক শ' মিটার দূরে।

কিন্তু এতে তার অত অস্বস্তি লাগল না। কার্তুজ যখন আছে খাবারও পাবে সে। আগের দিন অনেকবার শীল চোখে পড়েছে, কাছাকাছি জায়গা থেকে তারা গোল মাথা তুলেছে জলের ওপরে। তখন ঠিক গুলি করার মতো ইচ্ছে হয়নি, পাশেই ছিল দুটো শীল।

থলের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কোর্নিরি বন্দুকটা আগাগোড়া পুঁছল। রোদ বেশ গরম কিন্তু সূর্য মেঘের আড়ালে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর কোর্নিরি তখন এমন সব চমকপ্রদ অঙ্গভঙ্গী করছে যা কোন কসরতের বইতে দেখা যায় না।

সমুদ্রের হাওয়ায় ও রোদে পোষাক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। পোষাক পরে কোর্নিরি বন্দুক-হাতে বরফখণ্ডের কিনারায় বসে রইল শীলের সন্ধানে। সর্বদাই যে এত ছিমছাম আর নিরুদ্বেগ সেই আসল কোর্নিরির চেহারা এখন কেমন — পোষাক ছিন্নভিন্ন, মুখ শুকনো, ছড়ে গিয়েছে, কত আঁচড়।

দু'দিন আগে তীরে বসে থাকার সময়কার মতো বরফখণ্ডের কিনারায় বসে চোখ কুঁচকিয়ে সে দেখতে লাগল জলের ওপর কোন শীলমাছ আসে কিনা। দু'একবার এক আধটার দেখা গেল বটে, কিন্তু সে-রকম কাছে নয়, আর কোর্নিরি ঠিক করেছে যে টিপ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে গুলি করবে না।

আকাশে চেয়ে দেখল হাল্কা মেঘের দল ভেসে চলেছে, মনে হল যে সেও বাতাসে মৃদু দোল খেতে খেতে শূন্যে ভাসমান। নিস্তব্ধতা এত গভীর যে মনে হল একটা অন্তহীন, অপরিবর্তনীয় ঝঙ্কার বাতাসটাকে ভরে রেখেছে। কেবল কিছুক্ষণ বাদে বাদে এক একটা ভাসমান বরফ থেকে এক টুকরো বরফ সশব্দে জলের ভিতর খসে পড়ছে, তারপর আবার নৈঃশব্দের রাজত্ব।

হঠাৎ কেনিরির কানে এল একঘেয়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। এটা কি শুধু তার কল্পনা? কিন্তু না, দূরের শব্দ আরো জোরালো হল, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল শব্দটা। "ইঞ্জিন একটা!" কেনিরি ভাবল। লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের মাঝখানে একটা মোটরবোট দেখতে পাওয়ার আশায় চোখদুটোকে টান করে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

কোনো মোটরবোট চোখে পড়ল না, কিন্তু তার কোনো সন্দেহ নেই যে কানে-আসা শব্দটা ইঞ্জিনের একঘেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ। আকাশের চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় সে দূরে একটা বিমানকে উড়তে দেখল। ভাসমান বরফখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটাকে না দেখেই কি ওটা চলে যাবে?

কেনিরি বন্দুকটায় হ্যাঁচকা টান দিয়ে দু'বার গুলি ছুঁড়ল। বিমানটা আরো একটু দূরে উড়ে গিয়ে ঠিক গোল হয়ে মোড় নিল।

"গুলির আওয়াজ শুনেছে নিশ্চয়ই," কেনিরি উল্লসিত বোধ করল। "শুনতে পেয়েছে!" তবু বিমানটাকে আর এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ সোজা উড়ে সেটা আবার মোড় ঘুরল। ওটা সমুদ্রের উপর কেবলি পাক দিচ্ছে কিন্তু সেই মুহূর্তে কেনিরি বুঝতে পারল ওর তল্লাসেই বিমানটিকে পাঠানো হয়েছে।

কেনিরি আবার গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। এবার সংকেতধ্বনি নয়, বৈমানিকদের প্রতি সানন্দ অভিবাদন। বৈমানিক নিজে তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত কেনিরির ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে, অধৈর্য অধীর হাতে আবার বন্দুকে সে গুলি ভরল। বৈমানিক পাছে তাকে

না দেখে সেই ভয়ে কোনিরি বার বার গুলি ছুঁড়ল, শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে গেল তার সব কার্তুজ।

তখন বন্দুক নামিয়ে রেখে সে বরফখণ্ডের এধার থেকে ওধার দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। কেউ দেখলে হয়ত ভাবত পাগল, কিন্তু কাজটা আসলে সেয়ানার মতো, বিচক্ষণ বিবেচনার ফলে সে ঠিকই ধরে নিয়েছিল যে যদি বরফখণ্ডের ওপর এধার ওধার ছুটোছুটি না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে দেখা মুশ্কিল হবে।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে থেমে গেল, বিমানটি উড়ে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কোনিরি তাকিয়ে রইল সেদিকে...

এখন অবস্থাটা স্পষ্ট হল তার কাছে। বিমান থেকে তাকে দেখতে পায়নি। আর গুলি নেই, খাবার নেই, কিছু পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু তবু কোনিরির কাছে অবস্থাটা আশাহীন ঠেকল না। তার দুপুরের অভিজ্ঞতার পর, মৃত্যুর হাত থেকে সেই কোনোক্রমে রেহাই পাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত বরফখণ্ডে আরোহণ — এ সবকিছুর পর জয়ের সানন্দ অনুভূতি তাকে ছেড়ে চলে গেল না। সঙ্গে সঙ্গে এল এই নিশ্চয়তা যে বিমানে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে এবং একবার যখন ওরা একটা বিমান পাঠিয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ওরা তাকে খুঁজে বার করবেই, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে!

আর কেনই বা সে শেষ পর্যন্ত হতাশ বোধ করবে? বরফখণ্ড বড়ো — সকালে যে টুকরোটার উপর ছিল সেরকম নয়। এর উপর যথেষ্ট বরফ আছে, তিন জায়গায় টাটকা জলের ডোবা। তেষ্টা মেটাবার উপায় থাকলে খাবার ছাড়াও অনেকদিন বেঁচে থাকা যায়! তাছাড়া ভাল শিকারীর সব সময়েই ধৈর্য ধরে থাকা উচিত।

আর ঐ যে শীলসুদ্ধ বরফখণ্ডটা, ওটাও ভেসে তার কাছে ফিরে আসতে পারে। কোনিরির তখনো সেই আশা। ঐ যে ওখানে, বরফখণ্ডের অন্য টুকরোটা দুলছে ঢেউয়ের উপর। এমন কি মরা শীলদুটোও চোখে পড়ে।

ঠিক যেভাবে ওটা ভেসে গেছে ঠিক সেভাবেই তো আবার ফিরতে পারে। ওটা একবার দড়ির নাগালে আসুক দেখি, কোনিরি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না!

অবশ্য শীলদুটোকে পরিত্যক্ত বরফখণ্ডের উপর ফেলে রাখা ঠিক হয়নি। কোনিরির এখন মালুম হল যে সে ওদুটোকে টুকরো করে কাটতে পারত, থলেটার মতো ওগুলোকেও ছুঁড়ে দিতে পারত। অন্তত কিছু ভালো টুকরো থলেয় পোরা উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় এরকম সহজ সতর্কতা নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। এতে অবাক হবার কিছু নেই কেননা তখনো তার কাছে ছিল বারটি কার্তুজ।

কোনিরি খাবারের কথা না ভাবার চেষ্টা করল, চেষ্টা করল নিজেকে বোঝাবার যে এত তাড়াতাড়ি ক্ষিধে পাবার কথা নয়। সে তো ইতিমধ্যেই খেয়ে নিয়েছে, খেয়েছে অনেকটা। শীলদুটো কাছে থাকলেও সে ছুঁত না হয়ত।

কিন্তু সে অনুভব করল যে তার পেট বুঝসুঝ মানছে না, তাই অন্য পন্থা নিল। ডোবা থেকে কিছুটা জল খেল, কোমরবন্ধটাকে বাঁধল আর একটু কষে।

দিনের শেষে আবহাওয়াটা খারাপ হল, মেঘ এল ঘনিয়ে। ধারালো নীচু হাওয়ার দমকে, অগণিত কুঞ্চনে সমুদ্রের মসৃণ বুক বিক্ষুব্ধ।

আজকের মেঘলা আবহাওয়াতে কোনিরি আর খুশি হল না। কে বলতে পারে, বৈমানিক হয়ত অনুসন্ধানের কাজ বন্ধও করে দেবে? সম্ভবত অস্পষ্ট আবহাওয়ার জন্য সে উড়তে ভয় পাবে।

কোনিরি সমুদ্রের কুঞ্চিত বুকের দিকে হতাশায় চেয়ে দেখল। বিরক্তির সঙ্গে মনে হল ওটাকে দেখতে একশ' বছরের বুড়ি ডাইনীর পেটের মতো। ইত্যবসরে কুঞ্চন ও ভাঁজগুলো রূপান্তরিত হল তরঙ্গে — এ তার বরফখণ্ডকে ধীরে ধীরে দোলানো শান্ত ঢেউ নয়, এ হল ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের দল, ফেনিল ও মুখর।

নতুন সন্দেহ কোনিরিকে আঁকড়ে ধরল। হঠাৎ সে ভাবল যে বিমানটা তার খোঁজে আসেনি, এসেছিল অন্য কারুর খোঁজে। বরফখণ্ডে ভেসে গেছে এমন আর কেউ কি থাকতে পারে না? সমুদ্রতীর বড়ো, শিকারী ও জেলের

সংখ্যা অনেক। হয়ত কোন মানী ব্যক্তি বরফচাপে ভেসে গেছে। তার খোঁজে বিমান পাঠানো চলে।

কিন্তু তা নাও হতে পারে। বিমানটা হয়ত কারো খোঁজে আসেনি, বরফ পরীক্ষায় বা মাছের ঝাঁক সন্ধানে ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই তো নিজের নিজের কাজ আছে; পৃথিবীব্যাপী লোক শুধু কেনিরিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা আশা করা চলে না।

হাওয়ায় মেঘ কেটে যেতে বোঝা গেল সূর্য অস্ত যায়নি। দিগ্‌বলয়ে স্টীমার থেকে উদ্‌গত সরু ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল কেনিরি। ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। ওটা দূরে, বহু দূরে! যত জোরেই চেঁচানো যাক না কেন ডাক ওখানে পেঁাছবে না। আর ওরা স্টীমার থেকে দূরবীন লাগিয়ে যত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতেই দেখুক না কেন কেনিরিকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই। বিরাট সমুদ্রের পথগুলি প্রশস্ত, ডজনখানেক স্টীমার চুকচি সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে পারে বটে তবু তারা কেনিরির যথেষ্ট কাছে নাও হতে পারে।

ঢেউ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট বরফখণ্ডগুলোকে তোলপাড় করতে লাগল, পরস্পরের ভিতর ধাক্কা লাগিয়ে ছোট ছোট টুকরোয় চূর্ণবিচূর্ণ করে চলেছে। কেনিরি তার শীলমাছের বরফখণ্ডটার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে দেখতে পেল ওটা এক পাশে ভর দিয়ে উপরে উঠছে, আর একটা খণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নীচে নামার সময় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওটার উপর থাকলে তার কী দশা হত, ভেবে শিউরে উঠল কেনিরি।

সে মড়ার মতো ক্লান্ত, সারা দিনের অভিজ্ঞতায় এত বেশী শ্রান্ত যে কিছুই করতে পাড়ে না, কিছু ভাবার ইচ্ছেও নেই। ঘুমে শরীর এলিয়ে আসছে, কিন্তু শোবার আগে সে ঠিক করল বরফখণ্ডের উপর একটা পতাকা টাঙ্গাবে, সে ঘুমিয়ে থাকলেও সেটা তার চিহ্ন হিসেবে সহজে কাজ দেবে।

কেনিরি সার্টটা খুলে সেটাকে লাঠির সঙ্গে বেঁধে সব চাইতে উঁচু বরফস্তূপটার উপর বসিয়ে দিল। এখন দূর থেকেও পতাকাটা নজরে

পড়বে। সার্ট না থাকলে তার ঠান্ডা লাগবে, তবে সেটা তত গুরুতর ব্যাপার নয়।

ততক্ষণ পর্যন্ত ঢেউয়ে কেনিরির বরফখন্ডটার কোনো ক্ষতি হয়নি। ঢেউয়ের তুলনায় এটা অনেক বড়ো, তাছাড়া চার পাশে ঘন বরফের স্তূপ ঢেউয়ের আঘাতকে প্রতিহত করছে। তবু দিনের চাইতে বরফখন্ডটা এখন অনেক বেশী দোলন্ত।

পাছে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে, কেনিরি যে বরফস্তূপটার পাশে শুল তার সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। এটা সে করল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দুর্বল, অবাধ্য হাতের সাহায্যে। অনুভব করল শেষ গিঁটটা দেবার আগে সে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাবে। তখন নিজেকে জাগিয়ে গিঁটটা কষে বেঁধে ফিসফিসিয়ে বলল: "এবার আমি ঘুমোব।" আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রেরই মতো অতলস্পর্শী গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল সে।

কেনিরির চৈতন্যে এখন কোনো শব্দ প্রবেশ করবে না, ঘুমের জাল ভেদ করে ঢুকবে না ঢেউয়ের শব্দ বা বরফখন্ডের পরস্পর ঘষা লাগার ধ্বনি — সমুদ্রের তলায় শুয়ে থাকলে যেমন তার কাছে কিছু পেঁছিত না। মনে হল কিছুই তাকে জাগাতে পারবে না ...

বাস্তবিক কোনোকিছুই তাকে জাগাতে পারত না, একমাত্র গতকাল তার শোনা সেই একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া।

প্রথমটায় কেনিরি ভাবল এটা স্বপ্ন। চোখ মেলতে তার ভয়, পাছে শব্দটা মিলিয়ে যায়। মিনিটখানেকের মধ্যে সে চোখ খুলল, গোঁ গোঁ আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

সূর্য সবেমাত্র দিগ্‌বলয়ের উপর উঠেছে। কেনিরি বুঝতে পারল সে আধঘণ্টার বেশী ঘুমোয়নি। কিন্তু তার শক্তি ফিরে এসেছে বোধ হয়, ঘুমের জন্য ততটা নয় যতটা সেই একঘেয়ে গুঞ্জন শব্দের জন্য যা তার কাছে সব চাইতে মধুর সঙ্গীতের মতো।

বিমানটা বরফখণ্ডের উপর চক্কর দিল। বৈমানিক দূর থেকে নিশান দেখতে পেয়েছে, তারপর দেখেছে বরফস্তূপের নীচে ঘুমন্ত মানুষটিকেও। মানুষটা উঠে বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল। তারপর লাফিয়ে উঠে হাত নাড়তে লাগল।

বিমানটা ঘুরে বরফখণ্ড বরাবর উড়ে আসছে। এত নীচু দিয়ে আসছে যে মনে হল ওটা নীচে নামবে।

"সত্যিই কি নামবে?" আপনা থেকেই পিছন দিকে সরে আসতে আসতে অবাক হয়ে কেনিরি ভাবল। মনে হল বিমানটা আসছে সরাসরি তার দিকেই। বিমান সম্পর্কে তার এমন কিছু জ্ঞান নেই, কিন্তু এটা সে বুঝতে পারল যে বরফখণ্ডটা যেরকম তাতে বিমানের পক্ষে নামা অসম্ভব। সত্যি যে ঝড় এখনও পুরো দমে শুরু হয়নি, সমুদ্রও ইতিমধ্যে কিছুটা শান্ত হয়েছে, তবু বরফখণ্ডটা বেশ জোরে দুলছে; বিমান নামার মতো উপযুক্ত আকারের নয় মোটেই। তাছাড়া এটা বরফস্তূপে ভর্তি।

কিন্তু বিমানটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে এল। আর সেই একঘেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ নয়, প্রতিটি মুহূর্তাংশে বেড়ে চলা গর্জন। শব্দে অভিভূত হয়ে কেনিরি পড়ে গেল, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। পড়বার সময় সে দেখতে পেল বিমান থেকে কী একটা জিনিস নেমে আসছে।

তাড়াতাড়ি কেনিরি বরফস্তূপের গায়ে পতাকা বাঁধা দড়িটাকে খুলতে লাগল। বল্লম ছাড়া গাঁটটার কাছে পৌঁছবার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু গিঁটগুলো এত বেশী ভালো করে বাঁধা যে সঙ্গে সঙ্গে খুলবে না।

গর্জনটা যত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছিল তত দ্রুতই মিলিয়ে গেল। কেনিরি মাথা তুলে দেখল দুটো বরফস্তূপের মাঝখানে সুন্দরভাবে জড়ানো একটা গাঁট শক্ত হয়ে আটকে আছে। অবশ্য সেটা খোলার সময় সে পেল না, কারণ আবার পাক মেরে বরফখণ্ডটার দিকেই উড়ে আসতে লাগল বিমানটা।

এবার কেনিরি পড়ে গেল না। উবু হয়ে বসল, বসল তখনি যখন মনে হল বিমানের ডানা প্রায় তাকে ছোঁবে। খুশির হাসি হেসে সে বিমানটার উদ্দেশ্যে ডান হাত নাড়ল, বাঁ হাতে তখনো গাঁটটা ধরা।

আবার বিমান থেকে কিছু নেমে এল। এটা দু'নম্বরের গাঁট। কিন্তু বৈমানিক প্রথমবারের মতো ভালো টিপ করতে পারেনি। বরফে ঠোক্কর খেয়ে, বার কয়েক লাফ মেরে গাঁটটা গড়িয়ে পড়ল জলে।

বিমানটি বরফখণ্ডের উপর চক্কর দিচ্ছে। কেনিরি দড়িটা খুলে গাঁটটাকে আটকে বরফের উপর টেনে তোলাতে তখনি শুধু বিমানটা উপরে উঠল।

উড়ে চলে যাবার আগে বিমানটি ডানায় তিনবার ঝাঁকুনি দিল, কেনিরি অনুমান করল এটা তার প্রতি বৈমানিকের অভিবাদন। "এটা নিশ্চয়ই বৈমানিকের রীতি," ভাবল সে। ভদ্রতার খাতিরে সে তার হাতদুটো বাড়িয়ে বিমানটা যেমন তার ডানা দিয়ে করেছিল তেমনি ভাবে তিনবার ঝাঁকাল ...

গাঁটদুটো রকমারি জিনিসে বোঝাই, বরফখণ্ডের উপর ভেসে যাওয়া লোকের যা যা প্রয়োজন হতে পারে সেই সব। ওতে ছিল খাবার এবং গরম পোষাক, প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র, একটি তাঁবু এবং এমন কি দুটো বাড়তি ব্যাটারিসুদ্ধ একটা বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রত্যেকটি জিনিস অত্যন্ত আনন্দে ও বিস্ময়ে খুঁটিয়ে দেখে কেনিরি উল্লাসের চোটে শীস্ দিতে শুরু করল।

শীগ্গিরই তাঁবুর ভিতর একটা প্রাইমাস-স্টোভের চঞ্চল আওয়াজ শোনা গেল, কেনিরি সটান হয়ে শুয়ে আছে একটা ঘুমের থলের উপর, কেটলির জল কখন ফুটবে তার অপেক্ষায় আরামে পাইপ টানছে। ক্ষিধে আর নেই, গাঁটগুলো পরীক্ষা করার সময় সে এক প্যাকেট বিস্কুট আর দু'বাট চকোলেট সাবাড় করেছে।

গাঁটে পাওয়া সবকিছুর মধ্যে একটা জিনিসে সে সব চাইতে কৌতূহল বোধ করছে, প্রধানত এই জন্য যে শত চেষ্টাতেও জিনিসটা কী তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। ছোট্ট একটা নল, এমন একটা শক্ত অথচ অত্যন্ত হাল্কা ধাতুতে তৈরি যা কেনিরির জানা নেই। জিনিসটার শব্দ থেকে বিচার করলে সেটাকে ফাঁপা বলা চলে — বোধহয় এক ধরনের নল। কেনিরি অনেক চেষ্টাতেও সেটা খুলতে পারল না।

প্রাণভরে চা খেয়ে এবং রহস্যজনক নলটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে

কৌর্নির তার ঘুমের থলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। তার দুঃসাহসী অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এই তার প্রথম একটানা দীর্ঘ ঘুম।

জাগার পর তাঁবুর বাইরে এসে সে সমুদ্র, আকাশ এবং দিগ্‌বলয়ের দিকে চেয়ে দেখল। সমুদ্র শান্ত, আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। সূর্য উপরে। একটা ছোট্ট হাল্কা-ধূসর রঙের পাখি বরফখন্ডের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বিস্কুটের টুকরো ঠোকরাচ্ছে। কৌর্নিরকে দেখতে পেয়ে সেটা উড়ে বরফখন্ডের একটু দূরে জলের উপর বসল।

অনেকক্ষণ কৌর্নির বরফচাপের উপর ঘুরে বেড়াল কোথাও ফাটল বা গর্ত হয়েছে কিনা দেখার জন্য, পরীক্ষা করল ধারগুলোকে। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ, বরফটা আরো কিছুক্ষণ থাকবে। আনন্দময় আশার শান্তিতে মশগুল হয়ে এবং ওরা যে তাকে ভুলে যায়নি সেটা উপলব্ধি করে কৌর্নির বুঝতে পারল না কী করে সময় কাটাবে। একবার তাঁবুর বাইরে যায়, আবার ভিতরে ঢোকে, দেখে টিনবন্দী খাবারের উজ্জ্বল লেবেলগুলোকে, টর্চের ব্যাটারি বদলায়। ক্ষত এবং আঁচড়গুলোতে অনেকটা করে টিংচার আইয়োডিন লাগাল, এমন কি তার বাঁ হাতটায় একটা ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধল, ডান হাতের তুলনায় বাঁ হাতে বেশী আঁচড় আছে বলে নয়, বাঁ হাতের ব্যান্ডেজটা ডান হাতের চাইতে কম বিশ্রী দেখাবে বলে। আবার সে আকাশটাকে তন্ন তন্ন করে দেখে কান খাড়া করে রইল। সবকিছুই নিস্তব্ধ ...

দাবা খেললে কেমন হয়? সঙ্গী না থাকলেও বেশ চলে। কৌর্নিরের দাবার নৌকো মারা যাবার আগে আইগীনতো'র সঙ্গে শেষ খেলায় যেভাবে ঘুঁটিগুলো ছিল সেইভাবে সাজানো যেতে পারে। বেশী ঘুঁটির দরকার নেই, তখন তো ছকে তাদের বিশেষ ঘুঁটি ছিল না। ঘুঁটিগুলোকে ঠিক সেই সেই জায়গায় বসিয়ে খেলার শেষে আইগীনতো তাকে যেসব ফিকির বাত্‌লেছিল সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

কেনিরি বিস্কুট দিয়ে বরফের উপর দাবার ছক পাতল। সাদা এবং হলুদ চতুষ্কোণে দিব্যি একটি দাবার ছক হল। তারপর তাঁবুর ভিতর ফিরে চাকু দিয়ে প্রাইমাস-স্টোভের কার্ডবোর্ড থেকে কতকগুলো দাবার ঘুঁটি বানাল। কিন্তু ফিরে এসে দেখল সেই ছোট্ট হাল্কা-ধূসর পাখির একটা পুরো দল তার দাবার ছককে তচনচ করে দিয়ে পরম উৎসাহে যতটুকু বাকি ছিল তাও ঠুকরে সাবাড় করছে।

কেনিরির মেজাজ এখন এত ভালো যে ওদের উপর রাগ হল না। বরং ভাবল বাড়িতে গিয়ে যখন গল্পটা বলবে তখন তার ছেলেরা খুব আমোদ পাবে — এই যে সেয়ানা এক দল সাগরপাখির কাছে "দাবা খেলায় হেরে যাওয়া"।

তাঁবুর ভেতরের চাইতে বাইরের রোদ আরো উষ্ণ। কেনিরি নিজের জ্যাকেট বরফের উপর ছুঁড়ে ফেলাতে পকেট থেকে বেরিয়ে এল সেই নলটা যার রহস্য সে তখনো উদ্ধার করতে পারেনি। ওটা কুড়িয়ে নিতে প্রায় তার চেষ্টা ছাড়াই রহস্যটা নিজেই ধরা দিল। বোঝা গেল যে নলটার ভিতর একখানা চিঠি আছে। পড়ে যাওয়ার ফলে নিশ্চয়ই নলের স্ক্রুটা ঠিক জায়গায় সরে আসে, তখন ওটাকে খোলা মোটেই কষ্টকর হল না।

রোমাঞ্চিত হয়ে কেনিরি চিঠিখানা খুলল।

পরিষ্কার হস্তাক্ষর, যদিও তাড়াতাড়িতে লেখা:

"কমরেড কেনিরি!

"তিন দিন ধরে তোমার খোঁজ করেছি। হতাশ হয়ো না, অবশ্যই তুমি রক্ষা পাবে। আসল সমস্যা ছিল তোমাকে দেখতে পাওয়া, আর এখন যখন দেখতে পেয়েছি, তোমাকে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার করব।

"গাঁটের ভিতর তোমার দরকারি সব জিনিসই আছে। আবহাওয়া এখনকার চাইতে খারাপ না হলে তোমার সঙ্গে আমি আবার কাল দেখা করব।

বাকশেইয়েভ।"

জিনিসটা তাহলে এই, বৈমানিকের চিঠি; আর নলটা এ ক্ষেত্রে খামের কাজ করেছে। এখন সবকিছুই স্পষ্ট। কোনির যখন হাতে মুখ ঢেকে বরফের উপর পড়েছিল বৈমানিক তখন ওটা প্রথম গাঁটের সঙ্গেই নিশ্চয় ফেলে দিয়ে থাকবে।

"গাঁটের ভিতর তোমার দরকারি সব জিনিসই আছে ..." অবশ্যই এতে দরকারি সবকিছুই আছে, এমন কি তার চাইতেও বেশী মনে হয়। "আবহাওয়া এখনকার চাইতে খারাপ না হলে..." আজকের সকালের আবহাওয়া তো ভালো ছিল না, মোটেই না। তবু তো বাকশেইয়েভ আসবার ঝুঁকি নিয়েছিল।

কোনির ক্রমশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল উদ্ধার কাজে বহুলোক লেগেছে। আবার সে ভাবল, তেয়ুনে দুর্বিপাকের সংবাদ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ভামচের কাছে, কিন্তু এখন ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখা দিল। ভামচে উদ্বিগ্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উচিত স্থানে বেতারবার্তা পাঠাতে ওরা তার খোঁজে বিমান পাঠাল। এরিমধ্যে যে কোনো সময় রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যৌথখামার-কর্মীরা একখানা মোটরবোট উপকূল বরফের কিনারায় নামিয়ে রেখেছে। বাকশেইয়েভ তাদের ইতিমধ্যে খবর দিয়েছে কোন দিকে যেতে হবে আর ওরা রওনা হয়েছে ভাসমান বরফখণ্ড থেকে তাড়াতাড়ি কোনিরকে উদ্ধার করার জন্য।

কত লোকই না তার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে! একজন বেতারবার্তা পরিচালক, একজন বৈমানিক এবং বিমানবন্দরের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। এদের সে কোনোদিন দেখেনি। আর শুধু এরাই নয়। আনাদীরেও নিশ্চয় সবাই তার খবর পেয়েছে। সম্ভবত উপকূল বরাবর দৃষ্টি রাখার ও অনুসন্ধান করার ভার তাদের দেওয়া হয়েছে!

কোনির অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে তো বীর নয়, হোমরা-চোমরা ব্যক্তিও নয়। সে সামান্য একজন চুকচা শিকারী, যৌথখামার-কর্মী। আর সত্যি বলতে গেলে, সৎকর্মীও নয়, বরং পিছিয়ে-থাকা লোক। নিজেরি

দোষে সে ফ্যাসাদে পড়েছে ... বরফের কিনারায় ঘুমিয়ে পড়ে খেয়াল করেনি কখন বরফখণ্ড খসে গেছে।

আর কত না দামী জিনিস তারা বিমান থেকে তার কাছে ফেলেছে! হয়ত শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা ভুল হয়েছে? এ সবই কি শুধু তার একলার জন্য? হ্যাঁ, ঠিক সেই কথাই তো লেখা চিঠিখানাতে: "কমরেড কেনিরি ..." কোনো ভুল হতে পারে না। বৈমানিক বাকশেইয়েভ নিজ হাতে তার নাম লিখেছে।

বৈমানিক নিশ্চয়ই চমৎকার লোক: শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করেছে, বরফের উপর জিনিসগুলিকে ঠিক ফেলেছে আর নিজের থেকে একখানা চিঠি লিখেছে। তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছে: "হতাশ হয়ো না, অবশ্যই তুমি রক্ষা পাবে!"

কেনিরি আবার চিঠিখানা পড়ল। প্রত্যেকটি শব্দ ভালো লাগল, তার ইচ্ছে বৈমানিকের জন্য ভালো কিছু করে। "বাকশেইয়েভ" নামটা সে মনে মনে বলল কয়েকবার। "যদি কারো নাম দিতে চাও তো এটা খাসা নাম, একটা ছেলের এই নামই রাখতে হবে, যেমন কোলকার। নিকোলাই কেনিরিভিচ বাকশেইয়েভ ... মন্দ লাগছে না শুনতে!"

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার দিকে স্টীমার "ওয়েলেন" কেনিরিকে বরফখণ্ড থেকে তুলে নিল। কেনিরি যা ভেবেছিল মোটেই সে-ভাবে ঘটল না ব্যাপারটা। সে ভেবেছিল দূর থেকে একটা মোটরবোট আসছে দেখতে পাবে, উদ্ধারকারীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিশান নাড়বে আর তারপর ভামচে, উনপেনের ও রিনতুভগির হাতে হাত মেলাবে। ওরা ছাড়া আর কেউ যে তাকে উদ্ধার করতে আসছে এটা সে কোনো প্রকারে কল্পনা করতে পারেনি। তার অভিযান সম্পর্কে সে ঠিক করেছিল, তাকে প্রশ্ন না করলে সে কিছু বলবে না। শিকারীরা নিজেরা বুঝুক যে সে আর আগের মতো আত্মম্ভরী নয়।

কিন্তু সবকিছুই ঘটল অন্যভাবে। যৌথখামারের মোটরবোট সমুদ্রে দেখা দিল না। তার বদলে এল বড় একটা মাল ও যাত্রীবাহী স্টীমার। কেনির তার নিশান ওড়ায়নি, প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে সে তখন তার তাঁবুতে নিদ্রামগ্ন। স্টীমারটা থামল, একটা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল, দু'জন নাবিক নৌকো থেকে বরফখণ্ডের উপর এল কিন্তু তবু কেনিরির ঘুম ভাঙ্গল না। নাবিকরা ভয় পায় কিন্তু তাঁবুর কাছে এগুতে এমন শান্তিময় নাসিকাগর্জন শুনতে পেল যে সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশঙ্কা দূর হল।

দশ মিনিটের ভিতর বরফখণ্ডের উপর তাঁবুটাকে ভেঙে ফেলা হল। সবকিছু তোলা হল নৌকোতে; আর দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কেনিরি "ওয়েলেনের" ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঘিরে নাবিকরা, তাদের দিকে চেয়ে সে হাসছে।

নৌকোতে সে চেষ্টা করেছিল তার সব জিনিসগুলোকে নাবিকদের দিয়ে দিতে। শুধু পাঁচটি চকোলেটের বাট পকেটে রেখেছিল এই বলে যে ওগুলো হচ্ছে নিকোলাই, আলেক্সান্দ্র, এইগেলি, ওমরীলকোত ও তার স্ত্রী তেয়ুনের জন্য। তার আপত্তি সত্ত্বেও নাবিকরা তার উপহারে বিব্রত বোধ করে টিনের কৌটাগুলোকে তার থলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, কিন্তু কর্ণধার আপত্তি জানাল: 'শোন ছেলেরা, মানুষের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। ওঁর উপহার না নিলে নিশ্চয়ই ওঁর খারাপ লাগবে। তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে উনি তোমাদের সত্যিই খুশি করতে চান?'

স্টীমারে কেনিরিকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। ডাক্তার দেখলেন যে চারদিন বরফে ভাসা বা চুকচি সমুদ্রে অবগাহন, কোনোটাই তাঁর রোগীর শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। সেজন্য ডাক্তার যে আদেশ দিলেন তা হচ্ছে উষ্ণ ধারাজলে স্নান। এবং যেহেতু কেনিরির এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না, ডাক্তার স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হতে রাজী হলেন। তারা দু'জনেই মহানন্দে নৈশভোজনের সময় পর্যন্ত উষ্ণ ধারাজল ছিটিয়ে স্নান করল।

ইতিমধ্যে “ওয়েলেন” তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাপ্টেন “প্রভাত” যৌথখামারকে বেতার মারফৎ জানিয়ে দিলেন কৌর্নিরিকে নেবার জন্য কাউকে পাঠানো হোক। তাদের সঙ্গে মেলবার জন্য যৌথখামার বসতির প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে, উপকূলে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করলেন। বরফের যা অবস্থা তাতে এর চাইতে কাছের কোনো জায়গা বাছাই করা সম্ভব নয়।

কুকুর-টানা দুটো গাড়িতে দু'জন লোক উপকূলবর্তী বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলল বরফস্তূপের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে। সামনের স্লেজগাড়িতে বসে বৃদ্ধ মেমীল, দ্বিতীয়টায় রিনতুভগি। মেমীলকে এই মহৎ কাজের জন্য বাছাই করা হয় কারণ পর্ষদের আর কোনো কর্মী তার মতো ভালো করে কথা বলতে পারে না কিম্বা তার মতো জাঁকালো চেহারার নয়। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের খাতির সে হারাবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; তাদের ধন্যবাদ দেবার সবচেয়ে ভালো পন্থা সে বের করবে। আর রিনতুভগি, যৌথখামারের বিখ্যাত শিকারী ও সবচেয়ে শক্তিশালী লোক, মেমীলের সঙ্গে গেল যদি কৌর্নিরি সাহায্য ছাড়া একা নড়াচড়া না করতে পারে।

স্টীমার এবং কুকুরবাহিত দু'জন যৌথখামারী প্রায় একই সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছল। একটি নৌকো “প্রভাত” যৌথখামারের প্রতিনিধিদের “ওয়েলেন” স্টীমারে নিয়ে গেল।

তখন নৈশভোজনের সময়, কাপ্টেন সকলকে সেলুনে নিমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁর প্রথম সহচরকে বললেন ডাক্তার ও কৌর্নিরিকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে, তারা তখনো স্নানের ঘর থেকে ফেরেনি।

ওরা এল সব শেষে, লালচে গাল, আনন্দে উচ্ছল। ডাক্তার আসতে আসতে তাঁর জামার বোতাম লাগানো শেষ করলেন, কৌর্নিরি তখনো তার ভিজে নীলকালো চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। বাকি সবাই টেবিলে বসে গেছে।

কৌর্নিরিকে কাপ্টেনের ডান দিকে খাতিরের আসন দেওয়া হল। সে বসে রিনতুভগিকে দেখে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দু'জনা দু'জনকে জড়িয়ে ধরল ঘনিষ্ঠভাবে।

'রিনতুভগি, তুমি এখানে কী করে?'

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, কৌনিরি! আমরা এইমাত্র এসেছি। তোমাকে বাড়িতে নেবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে।'

'আর কে এসেছে তোমার সঙ্গে?'

'মেমীল!'

'মেমীল? কোথায় সে?'

'ঐ যে, কাপ্টেনের পাশে।'

কৌনিরি বাঁ দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের পাকা চুল-বোঝাই মাথাটি দেখতে পেল। বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে চোখ টিপল, কাপ্টেনের পিছন দিকে করমর্দন করল দু'জন। কিন্তু কথা বলার সময় পেল না, কাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।

রিনতুভগি ও মেমীলের সঙ্গে দেখা হওয়াতে কৌনিরি আনন্দে অধীর। প্রথমটায় মেমীলকে দেখেও তার আনন্দ হয়েছিল। তার আদি বসতি, তার যৌথখামার, আশৈশব অভ্যস্ত সবকিছু ছেড়ে থাকায় এত বেশী ঘরের জন্য তার মন কেমন করছিল যে তার বোধ হল চারদিন নয়, চার বছর সে বাড়ি ছেড়ে আছে, চার বছর বন্ধু ও প্রতিবেশীদের দেখতে পায়নি। এবং সত্যি বলতে গেলে বৃদ্ধ মেমীলই হচ্ছে বসতির প্রাণ — তাকে ছাড়া বসতির কথা ভাবাও কঠিন।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কৌনিরির ভয় হল যে বৃদ্ধ হয়ত অপ্রীতিকর কিছু বলবে। বৃদ্ধটি বেশীক্ষণ চুপ করে থাকবে না, এমনি চঞ্চল স্বভাব তার।

ধীরে ধীরে কৌনিরির শঙ্কা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল। হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলবে। ঠিক সেজন্যই সে এখানে এসেছে, তাকে নাবিকদের কাছে অপদস্থ করার জন্য। সে বলতে শুরু করবে যে সবকিছুই কৌনিরির নিজের দোষ, তাকে সবাই নিষ্কর্মা ও শ্রমশৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বলে জানে ... একাধিকবার কৌনিরি এ ধরনের কথা শুনেছে, তাকে সভায়

যে কত তিরস্কার করা হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। এবং বৃদ্ধ মেমীলই বোধ হয় তাকে সব চাইতে বেশী বকেছে। এত লোক থাকতে বৃদ্ধ মেমীলকে ওরা এখানে পাঠাতে গেল কেন? ভালো হত ভামচে যদি নিজে আসত, কিম্বা শিক্ষক এইনেসকে আসতে বলত ...

আর সেই মুহূর্তেই কেনিরি শুনতে পেল কাপ্টেন তার নাম উল্লেখ করছেন, কিছুক্ষণের জন্য সে তার সংশয় ভুলে গেল।

'আমরা সবাই,' কাপ্টেন বললেন, '"প্রভাত" যৌথখামারের শিকারী কমরেড কেনিরিকে উদ্ধারের সাক্ষী। আর আমরা সবাই এই উদ্ধার কার্যে কিছুটা যোগ দিয়েছি। অনুসন্ধান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন চুকচি সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সব পথটাতেই নজর রাখি, বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করি। "ওয়েলেন" তখন বেরিং প্রণালী হয়ে সবে চুকচি সমুদ্রের দিকে এগিয়েছে। ও অঞ্চলে অন্যান্য জাহাজকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈমানিক বাকশেইয়েভ যখন কমরেড কেনিরি ঠিক কোথায় আছেন সেটা বার করেন, তখন ঘটনাস্থল থেকে সবচাইতে কাছে ছিল "ওয়েলেন", আমরা নির্দেশ পেলাম আমাদের পথ থেকে সরে এসে কমরেড কেনিরিকে যেন ভাসমান বরফ থেকে উদ্ধার করি। মস্কোর কর্তৃপক্ষ থেকে বেতারে সরাসরি আমাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়। আর আমরাও তা তৎক্ষণাৎ পালন করি।'

"ও, তাহলে এই ব্যাপার!" কেনিরি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। তার অদৃষ্ট কেবল নিজের বসতির লোকদেরই বিব্রত করেনি, এমন কি আনাদীর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে গেছে বুঝতে পেরে তার খুব অস্বস্তি হল। এখন দেখা যাচ্ছে খাস মস্কো পর্যন্ত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ওরা সবাই উদ্বিগ্ন শিকারী কেনিরি যেন চুকচি সমুদ্রে ডুবে না মারা যায়।

আর তারি চিন্তাকে সমর্থন করে যেন কাপ্টেন বলতে লাগলেন:

"আমরা সোভিয়েতের লোকরা জানি যে পৃথিবীতে জীবন্ত মানুষের মতো মূল্যবান আর কিছু নেই। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের ভিতর এই

প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের দেশে মানুষের জন্য নেওয়া হয় এই মহান যত্ন। সেজন্য আমরা কমরেড কোনিরির উদ্ধার কার্যে যোগ দিয়ে এত আনন্দ পাই। আপনারা "ওয়েলেন" ত্যাগ করার পূর্বে আমি আমার সমস্ত নাবিকদের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাস্থ্য ও যাবতীয় কার্যে সুখ ও সাফল্য কামনা করি!'

কাপ্টেন এবং বাকি সকলে কোনিরির উদ্দেশে পানপাত্র তুলে ধরল, সে নিরাপদে ফিরে এসেছে বলে তাকে অভিনন্দন জানাল। পানপাত্র নিঃশেষ করে কাপ্টেন কোনিরির দিকে ও পরে মেমীল ও রিনতুভগির দিকে হাত এগিয়ে দিলেন।

'আপনাদের যৌথখামারের বিষয়ে, যার প্রতিনিধিরা আজ আমাদের এখানে আছেন, "ওয়েলেনের" নাবিকরা এই কামনা করে যে এর সমস্ত কর্মীর মঙ্গলের জন্য এবং আমাদের সমগ্র মহিয়সী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য এর সমৃদ্ধি ঘটুক!'

এবার দাঁড়াল বৃদ্ধ মেমীল। তাহলে বুড়ো কিছু বলবে। কোনিরি চঞ্চল হয়ে এমন কি তার প্লেটখানাকে পাশে সরিয়ে দিল।

'আমিও কয়েকটি কথা বলতে চাই,' আরম্ভ করল বৃদ্ধ মেমীল। 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, কমরেড কাপ্টেন এবং কমরেড নাবিকগণ আপনাদেরও। আমি সবকিছুর জন্যই আপনাদের সাধুবাদ দিচ্ছি, আপনাদের সহানুভূতিসূচক বাক্য ও আপনাদের সদয় কাজের জন্য, আমাদের কমরেডকে সাহায্য করার জন্য, আমাদের যৌথখামারী কোনিরিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য।'

বৃদ্ধের দৃষ্টি সকলের উপর ঘুরে নিবদ্ধ হল তার সামনে বসা একটি তরুণ নাবিকের মুখে। 'কাপ্টেন ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ, আমাদের দেশের সাধারণ লোক সবচাইতে বেশী যত্ন লাভ করে। কিন্তু সর্বদা এরকম ছিল না। আমি আপনাদের বলতে চাই আগের দিনে কী রকম ছিল ... একবার দাদার সঙ্গে শিকারে গিয়ে আমরা দুজনেই একখণ্ড বরফে ভেসে যাই।

আমাদের বয়স তখন কম — দাদার বিশ এবং আমার আরও কম। কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসেনি, এমন কি কেউ আমাদের খোঁজেও বার হয়নি। কোনো শিকারী সমুদ্রে হারিয়ে গেলে মনে করা হত তাকে কেলে নামক অপদেবতায় ধরে নিয়ে গেছে। এই ছিল আমাদের ওঝাদের কথা। "এর জন্য কেলে দায়ী," তারা বলত। "কেলের বিরুদ্ধে কখনো যাওয়া উচিত নয়, কাউকে উদ্ধার করতে যাবে না কখনো। কেলের একটা আহুতির প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ে গেছে।" এই ছিল তখনকার অবস্থা... তারপর, দাদা আর আমি সমুদ্রে দু'সপ্তাহ কাটাই, একেবারে জমে গেলাম, ক্ষিধেয় অবসন্ন হয়ে পড়লাম। এটা ঘটে শীতকালে, বরফখণ্ডটা গলে যায়নি, কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে বরফখণ্ডের চাইতেও আমরা বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলাম। দাদার পাদুটো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেল। শেষটায় আমরা তীরে এসে পড়লাম, আমাদের তীরে নয়, বিদেশের। মার্কিন এস্কিমোরা আমাদের উদ্ধার করে। দাদা কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেল কিন্তু আমি কোনোরকমে বেঁচে উঠলাম। প্রায় সাত বছর সেখানে কষ্ট করে কাটাই, তারপর সুযোগ পাই দেশে ফেরার। প্রায় সাত সাতটা বছর!'

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল, তার স্বর শান্ত। সবাই মন দিয়ে শুনছে। হঠাৎ এক গাল হেসে বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল।

'জানেন, এক সময় আমিও একটা আমেরিকান দুই-মাস্তুল জাহাজে নাবিকের কাজ করতাম। কিন্তু তার ক্যাপ্টেন আমাকে তার সঙ্গে টেবিলে বসতে দেয়নি। একেবারে উঁচু মাস্তুলটায় গলায় দড়ি লটকাবার ইচ্ছে হত, এমনি জঘন্য ছিল সেই জীবন... আমি এই কথাটা বললাম তুলনা দেওয়ার জন্য। মানুষের ভাগ্য নিয়ে কারো ভাবনা ছিল না। লোকে হারিয়ে গেলে, ব্যস আর কী—যেন কোন দিনই তার অস্তিত্ব ছিল না। কেবল তার মা আর বাবা একটু কাঁদবে। কিন্তু আজ সবকিছু একেবারে আলাদা। কোনির যখন হারিয়ে গেল তখন অভিজ্ঞ চালকের সঙ্গে একটা বিমান তৎক্ষণাৎ পাঠানো হল ওর খোঁজের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করার জন্য, তার কাছে খবরের

জন্য দিনে তিন বার করে বেতারবার্তা পাঠানো হত। "কৌনিরিকে কি এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছ? না? বেশ, খোঁজ করে যাও তাহলে, সন্ধান চালাতে থাক যতক্ষণ না তাকে দেখতে পাও!" এইভাবে আজকের দিনে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে!

'এরপর আমি আপনাদের যা বলতে চাই,' একটু থেমে বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'তা হল স্বয়ং কৌনিরির সম্পর্কে। ওকে নিয়ে অনেক কথা বলা চলে। ও আমাদের একজন সেরা শিকারী। নৌকোর আবরণ সেলাই বা স্লেজগাড়ি বানানো, ও যদি ইচ্ছে করে তাহলে ওর চাইতে ভালো কেউ পারে না। এসব ছাড়াও ও দাবা খেলোয়াড়। এমন কি ওর যৌথখামারের হয়ে জেলা প্রতিযোগিতায় সম্মান লাভ করে, যৌথখামারের জন্য পুরস্কার হিসাবে তিনপ্রস্থ দাবা ও তিনপ্রস্থ ড্রাফ্‌ট্‌স সরঞ্জাম পায়।'

কৌনিরি টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। মেমীল বাড়িয়ে বলছে না, যা বলছে তা সত্য, কিন্তু কৌনিরি সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলার আছে। বৃদ্ধ আজ এত সদয় কেন? সে কি স্থির করেছে কৌনিরিকে দয়া দেখাবে? কিন্তু তার তো খুব সম্ভাবনা নেই, মেমীল তো সেরকম করার পাত্র নয়। সে হয়ত ভেবেছে, যে লোককে নাবিকরা উদ্ধার করেছে তার দোষ ওদের জেনে কাজ নেই। তারা জানুক সে সৎ ও যোগ্য লোক। আর আলস্য ও অমনোযোগিতার জন্য, কৌনিরির জন্য যেসব জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং তার উদ্ধারে রাষ্ট্রের যা টাকা খরচ হয়েছে তার জন্য বৃদ্ধ মেমীল পরে তাকে বকবার সময় পাবে... কিম্বা হয়ত বৃদ্ধ মেমীল সে দিকেই এগোচ্ছে?

সবাই শ্রদ্ধাসহকারে কৌনিরির দিকে চাইছে, তার মনে যেসব তোলপাড় চলেছে কোনো ধারণাই তাদের নেই। কাপ্টেনের প্রথম সহচর একজন ঝানু দাবা খেলোয়াড়, এরকম একজন বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে খেলতে পারল না ভেবে দুঃখ বোধ করল। এ জানলে নিশ্চয়ই সে কৌনিরিকে নিয়ে ধারাজলে স্নানের জন্য অমূল্য সময় ডাক্তারকে নষ্ট করতে দিত না।

'তার জীবনে একবার যা ঘটে এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে,' বৃদ্ধ মেমীল বলে চলল। 'আমি কমরেড রিনতুভগির কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে এ বিষয়ে শুনেছি। কেনিরি এবং রিনতুভগি ছিল একই দলে, আমরা কমরেড কেনিরিকে সম্প্রতি উক্ত দলে বদলি করেছি, উন্নতিকল্পে ... ও, হ্যাঁ ...' কেনিরির দিকে কটাক্ষ করে মেমীল বলতে লাগল, 'শৃঙ্খলারই উন্নতিকল্পে।'

কেনিরির মাথা তখনো বিষণ্নভাবে আনত। হঠাৎ নাবিকদের মুখের দিকে সে চেয়ে দেখল। তারই মতো নয়, অন্য রকম অর্থে তারা মেমীলের কথা গ্রহণ করছে মনে হল। তারা ভাবল কেনিরির শৃঙ্খলাবোধ নয়, দলের শৃঙ্খলার উন্নতির প্রয়োজন ছিল। বেজায় চালাক লোক বটে এই মেমীল!..

কিন্তু কেনিরি হঠাৎ দেখতে পেল কাপ্টেন হেসে রিনতুভগির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। অতএব মনে হচ্ছে যখন সে ধারাজলে স্নান উপভোগ করছিল সে সময় বৃদ্ধ মেমীল নাবিকদের আরো কিছু বলে রেখেছে... কিন্তু কোন উদাহরণের কথা বলতে যাচ্ছে বৃদ্ধ মেমীল এখন?

বৃদ্ধ বলে চলল, 'ওদের একবার একসঙ্গে একটা মোটর নিয়ে যেতে বলা হয়। রিনতুভগি ছিল সামনে, মোটরটি তার ঘাড়ে, আর কেনিরি ছিল পিছনে। রিনতুভগি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ শক্ত জোয়ান, ওরকম একটা বোঝা ওর পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কটজনক জায়গাটায় ও হোঁচট খেল। বুঝতে পারল পড়ে যাচ্ছে, হয় মোটর ফেলে দিতে হবে নয় গড়িয়ে যেতে হবে সেই অতলগর্ভে ... ও বুঝল তার পা আর সামলাতে পারছে না। সেই মুহূর্তে কেনিরি পিছন থেকে ছুটে এসে ওর কাঁধ থেকে বোঝাটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে ওকে রক্ষা করে। পরে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা কেনিরি একাই ওটা বয় আর সেটা ছিল ওদের পথের সবচাইতে বিপজ্জনক অংশ। ব্যাপারটা এই রকম না, কমরেড রিনতুভগি ?'

'হ্যাঁ, মেমীল খুড়ো, আপনি যা বলছেন ঠিক তাই। কেনিরি না থাকলে মোটরটাও যেত আর আমিও যেতাম সেই অতলে।'

হ্যাঁ, এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে, কেনিরিরও মনে আছে। তাহলে সে যখন বরফে ভেসে যায় তখন ওরা ওর সম্পর্কে এই কথা বলাবলি করেছে! তাহলে তার কমরেড্‌রা এই ধরনের ঘটনা নিয়েই আলোচনা করেছে!

'এইখানেই, প্রিয় কমরেড নাবিকগণ, আমি শেষ করতে চাই,' মেমীল বলল। 'যৌথখামারটির তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে কমরেড কেনিরির স্ত্রী ও তার চার সন্তানের পক্ষ থেকে — তার দুই জোড়া যমজ, বড় দুটি — ওমরীলকোত ও এইগেলি এবং ছোট দুটি — আলেক্সান্দ্র ও নিকোলাই!'

শেষের কথাগুলি নাবিকদের উপর সবচাইতে বেশী দাগ কাটল। বৃদ্ধ মেমীল ইচ্ছে করেই কথাটাকে শেষে বলার জন্য রেখেছিল — ঐ ছোট্ট চারটি প্রাণীর তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। মেমীলের শেষ কথা শুনে নাবিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল, মনে পড়ে গেল নিজেদের বাচ্চাদের যাদের এই দীর্ঘ সমুদ্রভ্রমণে তারা পিছনে ফেলে এসেছে। তারা কেনিরির সন্তানদের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করতে শুরু করল — প্রত্যেকটির জন্য আলাদা করে এবং তারপর আবার প্রতি জোড়ার স্বাস্থ্য কামনা করে।

... সেই আলোখচিত রাত্রে, তুষারস্তূপের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে উপকূলের বরফবলয়ের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে কুকুরবাহিত দুটি স্লেজ। প্রথম স্লেজে রিনতুভগি আর পিছনেরটায় বৃদ্ধ মেমীলের সঙ্গে কেনিরি।

ভেরা ইনবের

কবি হিসেবে ভেরা ইনবের সুপরিচিতা। ১৮৯০ সালে ওদেসায় তাঁর জন্ম। স্কুলের মেয়ে যখন তখনি কবিতা লিখতে তিনি শুরু করেন, কিন্তু আসল নায়কনায়িকা ও বিষয়বস্তু তাঁর আয়ত্তে আসে শুধু অক্টোবর বিপ্লবের পর। প্রাক-বিপ্লব প্রাচ্যে নিপীড়িত মেয়েদের ভাগ্য তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে, তাঁর কয়েকটি সেরা রচনার অনুপ্রেরণা জোগায়। কয়েকবার উজবেকিস্তান ও ইরানে গিয়ে খুঁটিয়ে প্রাচ্যের লোকেদের জীবন তিনি দেখেন। "মধ্য এশিয়া, কখনো ভুলব না তোমাকে," এটি তাঁর কথা।

মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে তিনি থাকেন। তাঁর সুপরিচিত কবিতা "পুলকভোর দ্রাঘিমা" সহরের সাহসী রক্ষাকারীদের নিয়ে লেখা; "প্রায় তিন বছর" নামক লেনিনগ্রাদ ডায়েরীতে তিনি অবরুদ্ধ সহরের জীবন বর্ণনা করেছেন।

"নর-বিবির অপরাধ"এ বর্ণিত হয়েছে একটি স্ত্রীলোকের ট্র্যাজেডি যে মুক্তি পায় শুধু সোভিয়েত শক্তির কাছে, যে শক্তি তাকে মুক্তি ও সুখের "দণ্ড" দেয়।

নর-বিবির অপরাধ

নর-বিবি দোলনায় ঘুমন্ত। তার মা তাকে গেয়ে শোনাচ্ছে:

ঘুমো, মণি আমার, ঘুমো,
বড়ো হলে মিলবে জোড়া সেলাই-কল,
একটা চালাবি হাতে
আর একটা চলবে পায়ে,
সোনা আমার॥
মণি আমার, ঘুমিয়ে পড়েছিস?
বড়ো হলে খুলবে বেণীর বাহার,
রেকাবি থেকে মুঠো মুঠো
খাবি পেস্তা বাদাম,
সোনা আমার॥
বাচ্চারা তোর পেট পুরে খাবে
পোলাও কালিয়া,
আমার মতো হাঘরের তো
চাপাটিও জোটে না,
সোনা আমার॥
মোটাসোটা বাচ্চারা তোর
খেলবে নেচে কুঁদে।
আমার বাচ্চাদের মতো
তাদের যমে নেবে না,
সোনা আমার॥

সমরকন্দের বাজারে লাউ'এর খোলার ছোট ছোট ডিবে বেচে নর-বিবির বাবা। ঘোড়ার লোমের ছিপি দেওয়া জিনিসগুলোতে খৈনি রাখে লোকে।

লাউ যখন খুব ছোট আর নরম তখন সেটাকে সুতোয় জড়ানো হয় যাতে ঠিক আকারে দাঁড়ায়।

নর-বিবির বাবা বলত, 'ঠিক মানুষের মতো। আমাদের জড়ায় অভাবের নাগপাশ, যা খুশি তা করায় আমাদের দিয়ে।'

আস্তে আস্তে নর-বিবি বড়ো হল, দোলনায় আর আঁটে না। বেড়ে চলল সে। আটে পা দিয়েছে, বলতে গেলে সাদির বয়স। লেখাপড়া শেখেনি, জীবন কাকে বলে জানে না। একবার শুধু বাবার সঙ্গে গিয়েছে বাজারে যেখানে চাঁদি-টুপি বেচে। সমরকন্দের দু মাইল দূরে, আগালিক সড়কে সে থাকে হোজ্‌জা-আহ্‌রার মসজিদের কাছে, যে মসজিদে ঢোকা তার চিরকাল বারণ।

মসজিদের ভেতরটা সুন্দর। মাদ্রাসার কুঠরিগুলোর সামনে পরিষ্কার তকতকে, চুপচাপ চৌকো চত্বর। সেখানে থাকে আগামীকালের ইমামরা, ঋষিতুল্য শান্ত সব ছোকরা। চত্বরটার অদ্ভুত একটা গুণ আছে: এক প্রান্তে নিচু গলায় কিছু বললে সটান সেটা পেঁছিয় অন্য প্রান্তে শ্রোতার কানে। এটা করা হয়েছে ইচ্ছে করে: বিজ্ঞ নির্মাতারা ভেবেচিন্তে এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে ধার্মিক মোল্লা নিজের মহামূল্য গলা না ফাটিয়েই আল্লার গুণগান করতে পারে।

দশে পা দিল নর-বিবি। মেয়েদের যা কিছু চারুকলা শেখা উচিত তা সে রপ্ত করছে: সুন্দর বিনুনি বাঁধে, বাধ্য হয়েছে, ভুরুতে রঙ লাগায়, ভাজা পিঠের জন্য পেঁয়াজ গুঁড়োয়, বাচ্চাদের দেখাশোনা করে, রেশমকীটদের খাওয়ানোতে সাহায্য করে মাকে।

বসন্তকালে কুঁড়ির মধ্যে তুঁতপাতায় যখন সাড়া জাগে তখন মা তার মা ঠাকুমা যা করত তাই করে: রেশমকীটের ডিমের ছোট্ট একটা থলে গায়ে লাগিয়ে রাখে, যাতে উত্তাপে ক্ষুদে জিনিসগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছোট্ট থলেটা থাকে বগলে, মাঝে মাঝে সযত্নে দেখে ছোট ছোট দানাগুলো: রংটা আরো ফিকে হবার মানে গুটিপোকাগুলো দেখা দেবে শীগগির।

'রেশম' টাকাটা কত না দরকার মায়ের! রেশমকীটের ফসলের উপর

দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারটির কত কিছু না নির্ভর করে! রেশমকীটগুলো বিকবে তুচ্ছ দামে, সেটা অবশ্য ঠিক। ক্রেতারা জলের দামে কিনে সেগুলোকে পাঠাবে বিদেশে, সেখান থেকে তারা রাশিয়ায় ফিরে আসবে কাঁচা রেশম হয়ে, বিদেশী ছাপ নিয়ে। কিন্তু সেসব তো অনেক পরেকার ব্যাপার। আপাতত নর-বিবির বাপমায়ের প্রধান কর্তব্য হল সাফল্যবহ সব সনাতন রীতিনীতি মেনে চলা।

এক চিমটে গুটিপোকার ডিম নিয়ে বাপ হাটের দিনে যায় ক্লোভার ক্ষেতে। সেখানে জমিতে ছড়িয়ে দেয় ডিমগুলো — অগুনতি রেশমকীট হোক, বাজারে যত লোক আর মাঠে যত ক্লোভার তত।

গুটিপোকাগুলো বাড়তে থাকে। চারবার তারা ঘুমোয়, প্রত্যেকবার একটানা চব্বিশ ঘণ্টা। সে সময়ে খোলস খসে পড়ে, ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে তারা। জীবনের শেষ পর্বে আদির তুলনায় দশ হাজার গুণ বড়ো হয়।

বিশেষ তাকে — 'সুচ্চাক'এ তাদের পাতা হয়, গোটা ঘর জুড়ে বসে তারা। বাড়ির লোকজন তখন উঠোনে থাকে, চাঁদোয়ার নিচে গর্মিকালের আস্তানায়, খোলা চুল্লির পাশে। আর এখানে সূর্য ও তারার আলোয় তাদের দারিদ্র্যটা আরো চোখে বেঁধে: নোংরা তুলো বেরোনো জীর্ণ লেপ, এবড়ো-খেবড়ো ঝুলকালি মাখা কাঁসার পাত্র, মাটির ফাটা ভাঁড়।

ভাবী রেশমে উৎকণ্ঠায় নজর রাখে মা। কিন্তু তার অভুক্ত অস্নাত শরীরের ঘর্মাক্ত ভ্যাপসা দুর্গন্ধে তা-পাওয়া ডিমগুলো থেকে বেরোয় ক্ষীণ রুগ্ন পোকা।

'হায়রে পোড়া কপাল!' খোলস ছাড়ার প্রতি পর্বে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা। 'আবার ঘুমোতে চলল, জাগবে বড্ড দেরীতে। দাগ-দাগ গুচ্ছির ডিম। হায়রে কপাল! অনেকগুলোর দাগ হবে, কতকগুলো মুচড়ে যাবে, আর অনেক জোড়া আলাদা করা যাবে না!'

কিন্তু এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই নর-বিবির। তার কাজ হল তুঁতপাতা জোগাড় করা। গাছে উঠে একহাতে ডালের ডগা ধরে অন্য হাতে পাতাগুলো

ছি'ড়ে নিয়ে উইলো ডালপালায় বোনা একটা ঝুড়িতে সেগুলো রাখে। হাত ধরে গেলে গাছের উপরে বসে থাকে পাখির মতো, আর দেখে অন্য একটা পাখিকে — পাশের প্রাচীন প্লেনগাছে একটা সারসকে। পাখি পরিবারটিকে দেখে দেখে নিজেদের সঙ্গে অনেক আদল সে খুঁজে পায়। ওদেরো অনেকগুলো বাচ্চা, সব্বায়ের ক্ষিধে লেগে আছে হামেশা। মা কখনো বাসা ছাড়ে না। তফাৎ যা তা শুধু বাপেদের মধ্যে: সারসটা পাশের পুকুর থেকে ঠোঁটে করে ব্যাঙ ধরে আনে না, এমনটা ঘটে ক্বচিৎ কখনো। আর নর-বিবি কল্পনা করে, তার বাবা রোগা উদ্বিগ্ন মুখে আকাশে উড়ে চলেছে। ডানার মতো হাতের ঝাপট, লম্বা ডোরা-কাটা কোটটা ফৎফৎ করছে। বগলদাবা করে আছে এক টুকরো মাংস। আনন্দে জোর একটা হাঁক দিয়ে বাপ নামল নিচু মাটির দেয়ালে, সেখান থেকে মাটিতে। এরিমধ্যে মা পোলাও'র চাল বাছতে শুরু করেছে। রূপকথা!..

যা হোক, রূপকথার সময় ফুরল অচিরে। নর-বিবির বয়স হল বারো। সখীদের সঙ্গে উঠোনে বসে সে ভুরুতে রঙ লাগায়। ভাঙা একটা চায়ের পেয়ালায় সেচ খালের জল ভরে রঙ গোলে মেয়েরা। ছোট্ট একটা কাঠি রঙে ডুবিয়ে নাকের উপর রেখে ভুরুদুটো জুড়ে দেয়। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে মাথা হেলায়; ছোট ছোট নীলচে ধারা গড়িয়ে পড়ে গালে কিন্তু পরেকার রূপ খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সেগুলো তারা মোছে না। টিনের পাত আর ঝিনুকের ফ্রেমে বাঁধা একটা ছোট আয়না ঘোরে হাতে হাতে। বকবকানি চলে নিজেদের মধ্যে।

'এখানে আয়, সারা-খাঁ, রোদে বস। ছায়ায় থাকলে সব খারাপ হয়ে যাবে।'

'আমাকে আয়নাটা দে তো, গালহার। দেখিস, আমিই সবচেয়ে রূপসী হবো। কাল নতুন করে বিনুনি বাঁধব।'

'জানিস, এমন মেয়ে আছে যাদের ভুরু নেই, ন্যাড়া ন্যাড়া চোখ। ওদের সরম হয় না? বুঝি না ওদের।'

‘পাটিসাপটার এক টুকরো নিবি নাকি নর-বিবি? খালি এদিকে তাকাচ্ছিস।’

‘আমাকে আয়নাটা দে, আদালাত্।’

‘এবার আমাকে দে, শারিফা।’

আর ঠিক এভাবে নীল গাল একটুকরো পাটিসাপটা হাতে নর-বিবিকে দেখল ধনী পড়শী মির-শাহিদ। নর-বিবি রূপসী, সবচেয়ে রূপসী আর তার বাবা গরীব বলে নর-বিবিকে সাদি করার জন্য কিনে নিল মির-শাহিদ।

এই প্রথম নর-বিবির মুখ ঢাকা হল বোরখায়। প্রথমটায় তার ভালো লাগে, মনে হল বড়ো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার লোমের জালি দিয়ে ফুলন্ত খোবানিগাছটির দিকে তাকিয়ে (তখন বসন্ত) চিনতেই পারল না সে। ডালে ডালে ধূসর ফুল, মনে হল ছাই আর ধুলোয় তৈরি। ঝট করে বোরখা সরিয়ে দিল নর-বিবি, মিনিট খানেকের জন্য গাছটা আবৃত হল গোলাপী শিখায়, উপরে দীপ্ত নীল আকাশ। তুলোর মতন ধবধবে সাদা সারসী টুকটুকে লাল ঠোঁটে বসে আছে সবুজ প্লেনগাছে। কিন্তু আবার বোরখা নেমে এল মুখে, মিলিয়ে গেল সবকিছুর রঙ।

সাদি হল নর-বিবির। মা যা গাইত তাই হল — দুটো সেলাই-কল নর-বিবির — একটা হাতে চলে, অন্যটায় পাদানি আছে; তাছাড়া আর একটা যন্ত্র, গান-গাওয়া যন্ত্র, গ্রামোফোন। কিন্তু এসবে কী এসে যায়? স্বামী বুড়ো, নর-বিবি তাকে ভালোবাসে না। সাধারণ মেয়েলি অশান্তি, দুনিয়ার মতোই প্রাচীন। আর মির-শাহিদের প্রথমা স্ত্রী, নিজের বারো বছর বয়সের কথা সে ভুলে গিয়েছে কতদিন। যৌবনকে সে ক্ষমা করতে পারে না। তাছাড়া তার মনে বিষ।

মির-শাহিদ হিংসুটে স্বামী। নর-বিবি আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে পড়শীদের উঠোনে উঁকি মারছে দেখে চাকরবাকরদের বলল মাটির দেয়ালটা আরো উঁচু করে দিতে। নর-বিবি মাথায় বাড়ুক না তাড়াতাড়ি, দেয়ালটা আরো তাড়াতাড়ি উঁচু হতে থাকল।

ক্ষিপ্র লঘু পা নর-বিবির, দৌড়তে সে ভালোবাসে। উঠোনে একটা বাচ্চা গাধার পিছনে ছুটোছুটি করে, কিন্তু সতীন হাঁকে:

'দেখছি তুই মিয়ার ছেলেকে মেরে ফেলতে চাস, মোটাসোটা হাসিখুশি যে বাচ্চাটা শীগগিরই হবে। ফটকের দিকে তাকাস না, ছেলেটার ঠোঁট পুরু হবে! বৃষ্টিতে বাইরে বেরোবি না, বেরোলে ওর মুখে ফুটফুট দাগ হবে। তোকে দেখছি কেউ কিছুই শেখায়নি, হাঘরের পরী কিনা!'

মির-শাহিদ ভেবেছিল ছেলে হবে, কিন্তু হল মেয়ে।

বড়ো বিবি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বলল, 'জানতাম মেয়ে হবে। আগেই বলিনি? মির-শাহিদ, আপনাকে বলে রাখি ও শুধু মেয়ের জন্ম দেবে। এরকম বেসরম কী করে লোকে হয়!'

নর-বিবির মেয়ে দোলনায় ঘুমোয়। একলা থাকলে তার মা গান গায়:

ঘুমো, মণি আমার, ঘুমো!
বড়ো হলে ভরস্বাস্থ্য পাবি,
করবি সাদি, হোক না বর গরীব,
যোয়ান তো,
সোনা আমার॥

বরের ঘর করবি আলো,
থাকবে না সতীন।
খোকা হোক খুকু হোক,
বাপ কোলে নেবে আনন্দে,
সোনা আমার॥

ডালিম যে আঙুর নয়
সেটা কি ডালিমের দোষ?
আর ডালিমের চেয়ে তুই
কোন অংশে খারাপ শুনি?

বছর কাটতে লাগল। যারা কয়েক বছর আগে উঠোনে জড়ো হয়ে একসঙ্গে ভুরুতে রঙ লাগাত, মাঝে মাঝে তারা আবার একত্র হয়। সবায়ের সাদি হয়ে গিয়েছে। কয়েক জন তো এরিমধ্যে বুড়িয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা খেলছে

একটু দূরে। সূর্য ডুবুডুবু, প্রতি মিনিট তাই বাচ্চাদের ছায়াগুলো আরো লম্বা হচ্ছে। স্ত্রীলোকগুলি বিষণ্ণ; অকাল বার্ধক্য দীর্ঘছায়া মেলেছে সামনে।

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলেছে:

'এখানে এসে রোদে বস্, সারা-খাঁ। তুই এত ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস। শরীরে জুৎ নেই বুঝি?'

'আমার বাচ্চাটাকে কোলে নিবি নাকি নর-বিবি? খালি তাকাচ্ছিস ওর দিকে।'

'বোন, লোকে বলে কয়েকটা ছুঁড়ী নাকি বোরখা না পরে রাস্তায় বেরোয়। ছুঁড়ীদের আমি বুঝি না বাপু!'

'আমি বুঝি,' হঠাৎ বলে উঠল নর-বিবি।

'চুপ, চুপ, নর-বিবি! তুই বরাবরই অবাধ্য। দেয়াল পেরিয়ে তুই দেখতিস। মাঝে মাঝে তুই আবার মিয়ার মুখে মুখে কথা বলিস। সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করিস! সত্যি নাকি?'

নর-বিবি জবাব দিল না। না, কথাটা সত্যি নয়। অন্যদের মতোই ও বাধ্য আর অন্যদের মতোই অসহায়। এদিকে ওর পড়শীরা সভয়ে বলতে লাগল:

'চুপ, বোরখার নিন্দে করিস না। ওটাতে মুখ ঢাকা পড়ে, মুখে কী লেখা তা কারো চোখে পড়ে না। আর মেয়েছেলের পক্ষে সেটা ভালো। বোরখা না থাকলে মাঝে মাঝে অবস্থা আরো খারাপ দাঁড়ায়। গুলজামালের কথাটা মনে আছে তো?'

'গুলজামালের কী হল?' জিজাকের একটি স্ত্রীলোক শুধাল, এখানকার গল্পগুজব তার জানা নেই।

'জানিস না ? তাহলে শোন। গুলজামাল ছিল আমাদের বন্ধু। একদিন সন্ধ্যেবেলায় উঠোন থেকে বাড়িতে ঢুকল সে। কী ঘটবে জানলে কখনো ঢুকত না। কিন্তু নসীবের কথা কি বলা যায়? বাইরে ঠান্ডা — তখন শীতকাল — ঘরে একটা উনুন জ্বলছে। ঘরে বসেছিল দেওর। উনুনের পাশে গুলজামাল বসল, আগুনের তাপে মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

স্বামী যখন ঘরে ঢুকল তখন ওর গাল চেরির মতো লাল। পাশে দেওর বসে। স্বামী ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "বাইরে একবার এসো তো। একটা জিনিস কিনেছি, সেটা দেখাব।" উঠোনে যাওয়াতে বলল: "দেওরের সঙ্গে গরম হওয়াটা তোমাকে দেখাচ্ছি!" গুলজামালের পাঁজরে চার বার ছুরি চালাল সে। গুলজামাল পড়ে মরে গেল।'

জিজাকের স্ত্রীলোকটি কিছু বলল না, অন্য সবাই চুপ করে রইল। বলার কী আছে?

বছর কাটতে লাগল। এল ১৯১৭ সাল। রাশিয়াতে ঝড়ঝঞ্ঝা, কিন্তু আগালিক সড়কে হোজ্‌জা-আহ্‌রার মসজিদে কারুকার্য করা ছাদের বাহার তখনো আগেকার মতো, বড়ো ঘরের ছোকরারা কোরান পড়ে, আর শুক্লদাড়ি মোল্লার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যায় অদ্ভুত চত্বরে।

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের, প্রাচ্যে গৃহযুদ্ধের কালপঞ্জীর প্রতীক যে মিউজিয়মটি হবে তাশখন্দে সেটি খুলতে এখনো অনেক দেরি। মিউজিয়মের ভবিষ্যৎ সংগ্রহ এখনো নানা দিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে ধূলোর মতো। ছড়িয়ে আছে সারা মধ্য এশিয়ায়: স্থানীয় দস্যুদের সেই সব আধুনিক ইংরেজী রাইফেল আর প্রাচীন গাদাবন্দুক, কার্তুজ-বেল্ট, তরবারি, গাঁট্টা মারার পাত, হয় হাতে তৈরি নয় নিজ কারখানায়। জিন, চামড়ার বাক্সে সফরের পেয়ালা, ভূতপ্রেত আর গুলির বিরুদ্ধে কবচ, বাঁটে পীরোজাবসানো ছোরা, কাশগরের ছুরি। এরকম একটা ছুরি দিয়ে স্থানীয় একজন ডাকসাইটে দস্যুসর্দার গোটা একটা ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে একটি স্ত্রীলোককে কাটে পেট থেকে গলা পর্যন্ত, যতক্ষণ না তার ধকধকে হৃৎপিণ্ড অনাবৃত হয়। স্ত্রীলোকটির গাঁয়ের লোকেরা দস্যুসর্দারের পায়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে কাকুতিমিনতি করে ওকে যেন একটা মেহেরবানি করা হয়, মরতে দেওয়া হোক ওকে। কিন্তু দস্যুসর্দার মরতে দেবে না। প্রাণে না মেরে কী ভাবে ছুরি চালাতে হয় তা তার জানা। এ কাজে সে ঘাগী। আস্তে আস্তে ছুরির ফলাটা গলার দিকে চালাতে চালাতে সে ধীরে সুস্থে বলল:

'বোরখা খুলে মুখ দেখায় যে মেয়ে, সে নিজের কলিজাও দেখায়। তুমি যা কাজ শুরু করেছ তারি জের আমি টানছি, মেয়ে!'

ধুলোয় লুটিয়ে পড়া গাঁয়ের লোক কাতরে বলল, 'আপনি ভুল করছেন, হুজুর! আপনি ভুল করছেন, সাহেব! ও বোরখা খোলেনি, কখনো খোলেনি। খোদা কসম!'

'ও না হয় খোলেনি,' জবাব দিল দস্যুসর্দার, 'অন্য মেয়ে তো খুলেছে। আমার কাছে সবই সমান।'

২

সময় কাটে। ছোট বড়ো নানা ঘটনা। ছোটর মধ্যে একটার উল্লেখ করা চলে — মির-শাহিদের উঠোনের দেয়াল কিছুটা ধসে পড়েছে জোর বৃষ্টির ফলে। মেরামত করতে ভয় পায় মির-শাহিদ।

বড়ো বিবিকে সে বলে, 'লোকে বলবে মির-শাহিদ পয়সাওয়ালা আদমি। হয়ত বলবে নিজের সম্পত্তি ঢাকার এত তাড়া যখন তখন ওর নিশ্চয়ই অঢেল টাকা। কিন্তু আমি তো বড়োলোক সত্যি নই! গরীব আমি। ভিখিরীর মতো। তিনটে নোকর ছিল, এখন মাত্র একটা। তিনটে কল ছিল, দুটো সেলাই'এর আর একটা গানের। আজ একটায় দাঁড়িয়েছে — সেটা আর কী? আমি বড়োলোক নই। নিজে এসে দেখে যাও, ভাইসব। আমি ভিখিরী।'

নর-বিবির বয়স এরিমধ্যে পঁচিশ। তিন ছেলের মা, নিজেকে প্রবীণা মনে হয়। আর তিনটে মারা গিয়েছে, শনিদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য চাঁদি-টুপিতে গোঁজা পেঁচার পালক কাজ দেয়নি। এমন একটা অব্যর্থ দাওয়াই বৃথায় গেল। একটি গ্রীষ্মকালে আমাশায় তারা মারা গেল, কেন মরল, কীসে বাঁচত নর-বিবি জানে না।

ছোট বড়ো নানা ঘটনা ঘটে। মাটির দেয়ালের ফাটল দিয়ে রাস্তায় তাকালে প্রতিবার নতুন কিছু একটা নর-বিবির চোখে পড়ে। চোখে পড়ল প্রথম মোটরগাড়ি, দেখল প্রথম লরি, গাধা আর উটের জায়গা নিতে এসেছে।

বায়ুতুরঙ্গ হাওয়াই-জাহাজ একটা পাহাড় আর হ্রদ পেরিয়ে সটান নামল নিচে। গুজব যে সেখানে প্রকাণ্ড একটা আস্তাবল বানানো হয়েছে, তার নাম বিমানবন্দর।

আগালিক সড়ক হয়ে যে সব মেয়েরা যায় তাদের কয়েকজন বোরখা পরে না। নিরালায় মানুষ-হওয়া মাদ্রাসার মহামতি যুবারা হোজ্‌জা-আহ্‌রারের খোদাই-করা ফটক পার হয়ে চোখ কুঁচকে তাকায় সূর্যের দিকে, তারপর চিরতরে বিদায় নেয় সেখান থেকে। তাদের বুকে চাপা বইগুলোর মোমের মতো সব পাতায় জটিল আরবী হরফের জাল। চায়খানায় বসে উজবেক ছোকরারা খবরের কাগজ পড়ে। মসজিদের একেবারে পাশে ছোট সাদা বাড়িতে একটা ডিস্পেনসারি খোলা হল। বাচ্চারা স্কুলে যায়। কিন্ডারগার্টেন দেখা দিল।

সবকিছু দেখে নর-বিবি, কিন্তু সে থাকে সেই আগেকার মতো।

ভাবে, "এসব কমবয়সীদের পক্ষে ভালো, কিন্তু আমি ... আমি কোথায় যাব? আমার ছেলেপুলে আছে। ওদের খাওয়াতে পরাতে হবে। আমার তো টাকা নেই।"

তাই নর-বিবি থাকে সেই আগেকার মতো। মাটির দেয়াল ধসলে কী হবে, এখনো মির-শাহিদের অনেক দাপট। সোভিয়েত শক্তির পদতলে সে কুঁকড়ে থাকে, ভয়ে কাঁপে, কিন্তু তবু তো টিকে আছে। এখন একটিও নোকর নেই তার, গাধা নেই একটিও। সম্পত্তি বলতে শুধু দুটো বউ।

বুকে হাত রেখে সে বলে, 'আমি হলাম একেবারে অধম চাষী। যৌথখামার হল নিষ্পাপ গরীব চাষীর জায়গা, আমার মতো পাপী সেখানে যায় কী করে? ওদের সভাপতি হল আমার পুরোনো ক্ষেত-মজুর, তার বিজ্ঞ চোখে চোখ রাখার মুরদ আমার নেই। না ভাইসব, ওটি করতে আমাকে বলো না। সত্যি অনুরোধ করো না। আমি ওর যোগ্য নই। গুটিপোকার যে ঠিকে নিয়েছি, তাতেই আমার বাধো বাধো ঠেকে। আমাদের পেয়ারের সোভিয়েত রাজ, তার জন্য কিনা তুচ্ছ গুটিপোকাকে কাজে লাগাই! আমাদের

সুন্দর রাজের জুড়ি হল বুলবুল আর গোলাপ, তাদেরি শুধু কাজে লাগানো উচিত। আর আমার কথা যদি বল — না ভাই, শুক্রিয়া! চায়খানায় আমার প্রায়ই মুলাকাৎ হত বিদ্বান আজিমজানের সঙ্গে, সে গুটিপোকা পালত। সমরকন্দ থেকে আমাদের জেলায় ওকে পাঠায় কাজ শেখাতে, ওর সঙ্গে খুব দোস্তি জমে যায়। পাশাপাশি বসে দুজনে "কোক-চা" খেতে খেতে সংসারের নানা গল্প করতাম। ওর মতো যোগ্য লোককে সমরকন্দ সহর কমিটির সহকারী সেক্রেটারি কমরেড উর্কাবায়েভ বিস্তর নিন্দে করে কাজ থেকে সরিয়ে দিলেন, আফসোস কি বাত!

'সবুজ রঙের ছোট একটা গাড়িতে আমাদের এখানে এলেন কমরেড উর্কাবায়েভ। গাড়ি সমবায় দোকানের কাছে ছেড়ে চুপিসারে এলেন চায়খানার দিকে। ওঁকে অপমান করার সাহস আমার নেই, নাহলে বলতাম উনি একটা প্লেনগাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেন, বাচ্চারা যেমন লুকোচুরি খেলে ঠিক তেমন। আজিমজান কোক-চা খাচ্ছিল বরাবরকার মতো। গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কমরেড উর্কাবায়েভ দেখলেন চাষীরা পরামর্শের জন্য চায়খানায় যাচ্ছে, একপাশে ঝুঁকে পড়েছে নানা কাজের বোঝায়। তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জোরে হাঁক মারলেন, লুকোচুরিতে যেমন হাঁক দেয়: "আমি এখানে! আর আপনি? চায়খানায় জুটেছেন কেন?"

'আফসোসের কথা, সত্যি বড়ো আফসোসের কথা যে যোগ্য লোকটিকে হেনস্থা করা হল। আর তার জায়গায় কাকে পাঠানো হল — একটা মেয়েলোককে! লজ্জার কথা! মেয়েটা প্রতি বাড়িতে আড়ি পাতে, রুশী চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকায়। কী কপাল!

'সেদিনই কমরেড উর্কাবায়েভ আমাদের সামান্য গাঁয়ের অনেক জায়গায় গেলেন, আরো সব মানী লোক অপদস্থ হলেন। হায় নসীব! কমরেড উর্কাবায়েভ এলেন কিণ্ডারগার্টেনে। সেখানে সুখী সোভিয়েত বাচ্চারা দৌড়ঝাঁপ চালায়। আমার বাচ্চারা? না, না। আমি অতি অধম লোক। হ্যাঁ,

বাচ্চারা খেলাধুলো করে, ফুল নিয়ে কী একটা গান গায়, ওরা নিজেরাই তো ফুলের মতো। ওদের আর কী দরকার? ওদের সঙ্গে থাকত আমার জানপচান একটা মেয়ে। তাকেও চলে যেতে হুকুম দিলেন কমরেড উর্কাবায়েভ। কেন ভাইসব? হায় দুরদৃষ্ট!'

মির-শাহিদ যা বলে ঠিক সেরকমভাবে ঘটে ব্যাপারগুলো।

কিন্তু কমরেড উর্কাবায়েভের বক্তব্যটাও শোনা যাক।

বসন্তের একটি কর্মহীন দিনে, একটি বন্ধু ও মস্কো থেকে আগত দুজন অতিথি সঙ্গে কমরেড উর্কাবায়েভ পুরোনো সমরকন্দের দৃশ্য আর অতীতের অদ্ভুত সব চিহ্ন দেখতে আসে।

সহরের মধ্যভাগের চকে, রেগিস্তানে শির-দর মসজিদের পশ্চিম ফটকের একটি কুলুঙ্গিতে উৎকীর্ণ লেখাটি পড়ার জন্য তারা থামল। মসজিদ নির্মাতা লিপিতে নিজের সম্বন্ধে বলেছে:

"এমন একটি মাদ্রাসা তিনি নির্মাণ করেন যাহাতে পৃথিবী গগন স্পর্শ করে। প্রবেশদ্বারের উচ্চ চূড়ায় পক্ষের শক্তি ও কৌশলে পেঁছাইতে অনেক বৎসর লাগিবে মন-ঈগলের। দুর্গম মিনারগুলির চূড়ায় কল্পনার রজ্জু বাহিয়া উঠিতে অনেক শতাব্দী লাগিবে চিন্তা-বাজীকরের। সূক্ষ্ম নিখুঁত স্থপতি যখন প্রবেশদ্বারের খিলান স্থাপন করিলেন তখন গগনদেবতারা সেটিকে নূতন একটি চন্দ্র ভাবিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন।"

লিপিপাঠের পর তারা গম্বুজে ঢুকে ইটের সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, সিঁড়ির ধাপগুলো এত উঁচু যে পা টনটন করতে লাগল পরিশ্রমে। অবশেষে পাথুরে অন্ধকার থেকে তারা এসে পড়ল খোলা আকাশের নিচে উঁচু বারান্দাতে। দূর থেকে হালকা অথচ স্পষ্টভাবে কানে এল কারিগরদের কাজের নানা মিশেল আওয়াজ। কামারের হাতুড়ির ভারি শব্দ, কাঁসারির ঠুনঠুন, গাধার ডাক, উটের ঘণ্টা, একটা বাজনার তারের টংকার, একটানা গান — তেরো, চোদ্দ, পোনেরো শতকের সব মুখর ধ্বনিপ্রতিধ্বনি। হঠাৎ

এক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি যুগের শব্দ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল — একটা লরি যাচ্ছে। আর দরাজ একটা হাসি দেখা দিল উর্কাবায়েভের মুখে — সে হল দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনার মানুষ।

মস্কোর অতিথিরা সাগ্রহে তাকাল দূরে। দিগন্তে কাচের মতো ধারালো রেখায় উদ্যত তিয়েন-শান পর্বতমালা। এদিকে-সেদিকে ফুলন্ত বাগানের ছোপ বুকে সমতল হলদে সহরটা মিনারের নিচ থেকে প্রসারিত একেবারে পাহাড় পর্যন্ত। এখানে-সেখানে মাটির সমুদ্র থেকে উঠেছে এক একটা নীল ঢেউ: তৈমুরলঙ্গের সমাধি, বিবি-হানিম, শাহ-ই-জিন্দা আর অনেক দূরে তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুগ-বেগের মানমন্দির। আর ওদিকে, দক্ষিণে, হোজ্‌জা-আহ্‌রার মসজিদ অল্প উঁচু হয়ে উঠেছে।

'কী চুপচাপ আর কী শান্তি!' সবিশেষ তারিফ করে বলল মস্কোবাসী দুজন।

উর্কাবায়েভ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'শান্তি বটে! আপনারা কিছু জানেন না। আপনারা তাকিয়ে সুন্দর কিছু একটা দেখেন — প্রাচীনকালের চিহ্ন বা ওই ধরনের কিছু। কিন্তু এখানে সবকিছুতে ভীষণ আলোড়ন চলেছে। দেখুন ওদিকটা। ওটা হল হোজ্‌জা-আহ্‌রার মসজিদ, চারপাশে গ্রাম। আপনাদের একটা ঘটনা শোনাব,' তিক্ত উত্তেজনাভরে সে বলে চলল। 'ইটে হেলান দেবেন না — খুব নিরাপদ নয় ... একদিন ওখানে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম যে গুটিপোকা যারা পালে তারা সবাই কী কারণে যেন একপাশে ঝুঁকে গিয়েছে। ভাবতে লাগলাম অদ্ভুত রোগটা এল কোথা থেকে, আর গুটিপোকা যারা পালে তারাই এ রোগে ভোগে কেন?

'চায়খানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখতে লাগলাম। সত্যি, চাষীরা চায়খানায় যাচ্ছে আর ওরা সবাই একপাশে ঝুঁকে গিয়েছে, ডান হাতে বাঁ কনুই ধরে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলেছে। বগলে ফোড়া হয়েছে নাকি? তাহলে তো কাণ্ড বটে! কী ব্যাপারটা জানেন? গুটিপোকার ইনকিউবেটারের

বিষয়ে শেখাতে যে গিয়েছিল সেই আজিমজান সন্দেহজনক প্রকৃতির লোক। আর কেউ ছিল না বলে ওকে পাঠানো হয়। স্বভাবতই উজবেক সিল্ক ট্রাস্ট ওকে থার্মোমিটর দেয়, গুটিপোকার ঘরে থার্মোমিটরগুলো টাঙ্গিয়ে রাখার কথা। জানেন বোধ হয়, সবকিছু নির্ভর করে উত্তাপের ওপর, গুটিপোকার ঠাণ্ডা সয় না। তেইশ ডিগ্রির কম হলে গুটিপোকাগুলো সঙ্গে সঙ্গে জবুথবু হয়ে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। গুটিপোকা পালন বাড়াবার অনেক চেষ্টা আমরা করছি। ইনকিউবেটর বিশেষজ্ঞের অবশ্য উচিত সব ঘরে দিনে দুবার গিয়ে নিজে দেখা সবকিছু ঠিক আছে কি না। কিন্তু লোকটা নিজে না গিয়ে চাষীদের বলে থার্মোমিটরগুলো বগলের নিচে রেখে তার কাছে চায়খানায় নিয়ে আসতে। তাহলে তাকে আর উত্তাপ দেখতে হবে না, উত্তাপ হাজির হবে তার কাছে। আজিমজান থার্মোমিটরে হয়ত দেখল সাঁইত্রিশ ডিগ্রি বা সেরকম কিছু অর্থাৎ মানুষের শরীরের উত্তাপ, তখন বলত, "বড্ডো বেশি। বেজায় গরম। ঠাণ্ডাই লাগাও।" এতে যে গুটিপোকারা মরে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী।'

সবাই হেসে উঠল কিন্তু উর্কাবায়েভ চিন্তান্বিত:

'না, এটা হাসির ব্যাপার নয়,' বলল সে। 'অত্যন্ত দুঃখের কথা। শুনুন, আরো বলি। পথে আঞ্চলিক কিণ্ডারগার্টেনটা দেখতে গেলাম। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট দেখা করলেন, সুন্দর মহিলা, রুশী। বললেন, "এখানে সবকিছু চমৎকার। আমরা সবাই মহাখুশি। বাচ্চারা, সার বেঁধে দাঁড়াও!" সার বেঁধে দাঁড়াল তারা। পাঁকাটির মতো শরীর। দুর্বল ক্ষীণ গলায় উজবেক ভাষায় গাইতে লাগল তারা:

> সুন্দর এই বাগানে ফুলের মতো ফুটছি আমরা,
> আমরা থাকি রৌদ্র হাওয়ায় ...

গানটা মনে পড়াতে এত জোরে নড়ে উঠল উর্কাবায়েভ যে কনুইয়ের নিচ থেকে ইটের ধুলোর মেঘ উঠল।

'আর জানেন, গানটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ওরা মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যি ওরা আলো হাওয়া খেয়ে থাকত, কেননা ওদের খাবার চুরি হত নিয়মিতভাবে। আমি নিজেই দেখলাম। মেয়েটি কত ক্ষতি যে করে আপনারা ভাবতে পারবেন না! বাচ্চাদের কথা না হয় নাই বললাম। ওদের ভালো খেতে দেব নিশ্চয়, কিন্তু বড়োরা এত সহজে ব্যাপারটা ভুলবে না। মেয়েদের মধ্যে সোভিয়েত শক্তি প্রচারের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হল কিণ্ডারগার্টেন আর ক্রেসে। এখানকার মেয়েদের কণ্ঠহার হল ছেলেমেয়েরা।

'চমৎকার কথাটা,' একজন মস্কোবাসী মন্তব্য করলেন। 'আপনি দেখছি কবি!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল উর্কাবায়েভ।

গুটিপোকার তা কী করে দিতে হয় যে শেখায় সেই নতুন বিশেষজ্ঞ 'রুশ চোখো' মেয়েটির নাম শুরা পতাপভা। তার বাবা কৃষিবিজ্ঞানী, আদিবাস ভলগা অঞ্চলে — ব্যাঙের ছাতা আর বেরির যে দেশে লোকে গুটিপোকা বস্তুটি কী তাও জানে না।

পতাপভের স্ত্রীর টিবি হয়। চেহারাটা দাঁড়াল তাদের খাবার-ঘরের কোণের টেবিলে রাখা মোমের আপেলের মতো। স্ত্রীর পাণ্ডুর ঈষৎ-লাল গালের দিকে তাকিয়ে পতাপভ শুধু চোখ পিটপিট করে আর কাশে। ডাক্তার অবশ্য তাকে সান্ত্বনা দেয় যে "রোগের গতি চলেছে স্বাভাবিকভাবে"।

শেষ পর্যন্ত বসন্তের একটি আর্দ্র দিনে ডাক্তারও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

'আপনার স্ত্রীর যাওয়া উচিত দক্ষিণে,' ডাক্তার বলল। 'ক্রিমিয়া বা ককেশাসে।'

'খাবো কী করে?' রূঢ়ভাবে শুধাল পতাপভ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। একবছরের শুরা তখন একটা খবরের কাগজের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছে, কাগজটায় লিখেছে যে মার্ণ নদীতীরে খেয়ামাঝির কুটিরটা মিত্রশক্তি পুনরায় দখল করেছে।

‘তুর্কেস্তান হলে ব্যবস্থা করতে পারতাম,’ বলল পতাপভ। ‘একজন বন্ধু লিখেছে যে তাশখন্দে কৃষিবিজ্ঞানীর দরকার।’

আশ্বস্ত হয়ে ডাক্তার বলল, ‘চমৎকার! ওটাও তো দক্ষিণে। দরকার হল আলো আর রোদ। না গেলে চলবে না। তিনচার মাসের মধ্যে স্ত্রীকে দেখে আর চিনতে পারবেন না।’

আর সত্যি তাই হল — ছ মাস পরে তাশখন্দে স্ত্রীর কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে লিজাকে চেনা ভার, উপগ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্য আর ধুলো তাকে এমন ক্ষইয়ে দিয়েছিল।

লিজার কবরে একটা পপলার এত অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে বেড়ে উঠল যে দেখে মনে হল, এ অঞ্চল জয়ের পর জেনারেল কাউমফান যে সব বিখ্যাত পপলার পুঁতেছিলেন তাশখন্দে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতলব। প্রথম প্রথম পপলারটা টানত পতাপভকে, কিন্তু পরে অঞ্চলটি প্রিয় হয়ে উঠল তার কাছে। অভাগিনী স্ত্রীর কথা আর বেশি মনে পড়ে না। একবার শুধু চিমগানের পাহাড়ে স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরে পতাপভ মেয়েকে বলে:

‘ডাক্তার ঠিকই বলেছিল দেখছি। পাহাড়ের ওখানে আবহাওয়াটা চমৎকার। কিন্তু বিপ্লবের আগে ওখানে যেতে দিত না। আর পরে, তখন বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছে।’

প্রতি বসন্তে মেয়ের বাড়ন দেখে পতাপভ। তার কাঁধ পর্যন্ত যখন শুরা পেণছল তখন সে গুটিপোকা পালতে শেখায়। আর পতাপভ, সে গুটিপোকা পালন ইনস্টিটিউটে রেশমকীটের বর্ণসংকর নিয়ে কাজ করে।

একদিন সমরকন্দে কাজে যাবার জরুরী ডাক এল শুরার কাছে, পতাপভের কাছে সে দিনটা বিমর্ষ। দুনিয়ায় শুরা ছাড়া তার আর কেউ নেই, দুজনের ছাড়াছাড়ি কখনো হয়নি।

দুজনে গেল ইনস্টিটিউট সংলগ্ন তুঁতগাছ নার্সারিতে। বসন্ত এসেছে সবে। সব তুঁতগাছে, কী সাধারণ, কী বেঁটে, কী ঝোপড়া, কী পিরামিড

আকারের বা গোলাকার গাছে কুঁড়ি ধরেছে অজস্র। একটা আলাদাভাবে চোখে পড়ে — জাপান থেকে আনা বড়ো-পাতা সুন্দর একটা গাছ।

গাছের মধ্যকার একটা পথে পায়চারি করল বাপ-মেয়ে, ছোট সাদা বাড়িটা পর্যন্ত না গিয়ে। সেখানে একেবারে আলাদা করে বিশেষজ্ঞদের তদারকে রাখা হয়েছে পেব্রিনের* টিকে-দেওয়া পরীক্ষামূলক গুটিপোকা।

হাসতে হাসতে শুরা বলল, 'বাবা, মনে পড়ে, আমার ডিপথেরিয়া হওয়াতে একেবারে একলা রাখা হয়েছিল ওয়ার্ডে?'

কী যেন ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে সায় দিল পতাপভ।

'তোমাকে মনমরা দেখাচ্ছে,' মেয়ে বলল। 'কিন্তু না গিয়ে আমার উপায় নেই। আমি কমসমলের সদস্য, আমাকে যেতেই হবে। তাছাড়া আমি যেতে চাই। এটা আমার প্রথম স্বাধীন কাজ। ওখানে আড়াই শ বাক্স গুটিপোকার ডিম বাঁচাতে হবে।'

'তোকে যে যেতে হবে আর যেতে তুই চাস তা বুঝি। কিন্তু শুরা, দেশের একেবারে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে কেন? এখানে থাকলে তোর ভালো হবে না?'

'নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তুমি এটা বলছ, সেটা মনে হচ্ছে না?'

'হয়ত তাই,' মেয়ের দিকে চেয়ে বলল পতাপভ।

'তাহলে আর কী! নিজেই যখন বোঝো, তখন তুমি লজ্জিত নিশ্চয়ই।'

পতাপভ আবার মেয়ের দিকে তাকাল:

'আমি লজ্জিত, তা বটে,' উত্তরে সে বলল। 'কিন্তু দেখ্, শুরা, যতবার পারিস চিঠি লিখিস অন্তত। লিখিস নিশ্চয়। আর সব কিছু নিয়ে লিখিস। লিখবি তো?'

বাবার দিকে তাকিয়ে শুরা বলল, 'তা লিখব।'

---

* পেব্রিন — গুটিপোকার রোগ।

৩

সমরকন্দে খবর রটল যে সহরের প্রত্যেক অংশে বিশেষ একটি কমিশন ঠিক করবে কাকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে, কাকে হবে না। শুনে অনেকে অপ্রসন্ন হল। এদের একজন মির-শাহিদ।

সে বলল, 'ভাইসব, আমার মনে হয় যে ছয় ভাষায় "ছাড়পত্র" লেখা ছোট্ট কেতাবটায় সেদিনের জন্য ছ'গুণ বেশি করে আমাদের আফসোস হবে যেদিন ছাড়পত্র ছিল না। এই-ধরো, আমি। আমার দিলে বহুৎ দিন লেখা আছে যে আমি সৎ আর দয়ালু উজবেক, আমার বিষয়ে আবার কালিকলমে লেখার কী দরকার? হ্যাঁ, এক কালে আমি বড়োলোক ছিলাম, সত্যি। কিন্তু সেসব তো অতীতের কথা। আর যা অতীত, তা নিয়ে ভাবা কেন? আর একটা কথা। আলাদা ছাড়পত্রের সখ আমাদের বিবিদের মনে যদি জাগে, তখন কী হবে? দয়ালু সোভিয়েত সরকার ওদের একটা কেতাব দিলে মিয়াদের কি আর মানবে ওরা? বইতে ওদের নাম, বয়স আর খাস চিহ্নের বর্ণনা থাকবে, যেন ওরা ভেড়া, যেন ওদের বাঁট কী ধরনের, কোন পাটা খোঁড়া, সব জানা।'

এটা বলার সময়ে নর-বিবির কথা ভাবছিল মির-শাহিদ। নর-বিবির চোখে বিচিত্র একটা ঝিলিক ক্রমশ বেশি করে হানা দিচ্ছে আজকাল, সেটা দেখে ভাবনা জাগে মনে। কদিন পরে তার প্রতি প্রীতি আছে এমন কয়েকজনকে আবার মির-শাহিদ বলল:

'হ্যাঁ, ভাইসব! হঠাৎ টের পেলাম যে আমার নর-বিবি জেলা কমিটিতে গিয়ে ছাড়পত্রের কথা তুলেছে। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এসব কাজ, শুনে প্রথমটা খারাপ লাগল। ও বাড়ি ফেরার পর এই একটু বাতচিৎ করলাম ওর সঙ্গে। উমেদ আছে, মত বদলেছে। আমার তো মনে হয় ছাড়পত্রের কোনো জরুরত নেই ওর। ইন্তাকাল হলে — তোবা তোবা — আল্লা এমনিতেই চিনতে পারবেন, ছাড়পত্র লাগবে না, কেননা দেহে তো এখন

বিশেষ অনেক ছাপ পড়েছে। যা-যা লেখা দরকার ওর ছাল-চামড়ায় আমি নিজে হাতে লিখে দিয়েছি পাকা মুন্সীর মতো। এখন দেখলে অন্য মেয়ে বলে ভুল হবে না একেবারে।'

প্রায় একই সময়ে মেয়ের প্রথম দীর্ঘ চিঠি পেল পতাপভ।

"বাবা, আমি আসার আগে যাকে বরখাস্ত করা হয় সেই আজিমজান দেখা গেল আসল অন্তর্ঘাতক। ওর দরুন প্রায় সবকটা গুটিপোকা মরে গিয়েছে ঠাণ্ডায়, এবারের বসন্ত ঠাণ্ডা, সে তো তুমি জানো। আজিমজানের হুকুমে জায়গাটা গরম করা হয়নি, জানলাগুলো খুলে রাখা হয়। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এই যে, জানলা খোলার দরকার হলেও কেউ করতে চাইবে না, খুলতে বললে সন্দেহ জাগবে ওদের মনে। সর্বদা এরকমটাই হয়: খারাপ কর্মী শুধু ক্ষতি যে করে তাই নয়, অন্যদেরও বাধা দেয়। শুনছি লোকে বলাবলি করছে যে ইনকিউবেটর যখন ছিল না তখন গুটিপোকাগুলো বেশ ভালো থাকত। বুঝতেই পারছ এ সবের অর্থ কী আর আমার দায়িত্ব কতটা! আর তুমি চেয়েছিলে যে আমি এখানে না আসি!

"এখন জায়গাটার কথা কিছু তোমাকে বলি। আমি আছি একটা মসজিদে — কখনো ভাবিনি এমন জায়গায় থাকব। আগেকার কুঠরিগুলো বদলে তা-দেবার ঘর করা হয়েছে। একটাতে আমার আস্তানা। সেটাতে এখনো একটা ধোঁয়াটে জায়গা আছে, আগে ওখানটায় চুল্লি ছিল। কুঠরিতে বইয়ের একটা শেল্‌ফ্‌ আছে। আগে যেখানে ছাত্র থাকত সেখানেই ঘুমোই। আমার অফিস থেকে জিনিস যায় যৌথখামারী আর অন্য চাষীদের কাছে। কয়েকজনকে দিই গুটিপোকার ডিম, অবশ্য তৈরি পোকা দেওয়াটাই আমার ইচ্ছে। কিন্তু সবাই কাজ শেষ করে একই সময়ে গুটিপোকা নিতে আসে, এই যা মুশকিল। সার বেঁধে ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, আর আমি ও আমার সহকারীরা নিশ্বাস ফেলার সময় পাই না। আমাকে সাহায্য করে তিনজন —

যৌথখামারের দুটি মেয়ে-প্রতিনিধি আর একজন গাঁয়ের সোভিয়েতের প্রতিনিধি। উজবেক ভাষায় বোঝাতে বেশ পারি এখন।

"তুঁতগাছগুলো কাছেই কিন্তু ঝোপড়া জাতের নয়। এত উঁচু যে ওপরে ওঠা শক্ত। এখানকার বাচ্চারা পাতা জোগায় আমাদের। গাদাখানেক পাতা আনলে ওদের প্রত্যেককে গুটিপোকা ডিমের একটা খালি বাক্স দিই বলে ওরা বেশি আনার খুব চেষ্টা করে।

"আফসোসের কথা যে প্রায় সবকটা গাছ রাস্তার ধারে, তাই ধুলো লেগে থাকে। ধুলোভরা পাতা ভালো নয়, কিন্তু ধুয়ে গুটিপোকাকে স্যাঁৎসেঁতে পাতা দিলে ওদের পেটের অসুখ হবে, এই আমার ভয়। আমাকে লিখে জানিও তো সবচেয়ে ভালো উপায়টা কী।

"আর একটা চিন্তার কারণ হল বায়ুচলাচল ব্যবস্থা। এখানে জানলাটানলা নেই, দোরগুলো ভেতরের চত্বরমুখো, আর জানো, চত্বরটা এমন চমৎকারভাবে তৈরি যে এক প্রান্তে নিচু গলায় কথা বললে অন্য প্রান্তে শোনা যায়।

"আর জানো — একটা কুঠরিতে উজবেক সিল্ক ট্রাস্টের এক গাদা পোস্টার পেয়েছি — সবুজ হলদে রঙের পোস্টার, মাঝখানে বিরাট একটা গুটিপোকা, চারধারে উজবেক ভাষায় নির্দেশ। তার মানে, পোস্টারগুলো কাউকে দেয়নি আজিমজান, এক কোণে গাদা করে ফেলে রেখেছিল।

"জেলার ইনস্ট্রাকটর আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ চাই। তুমি অবশ্য পার্টির লোক নও, কিন্তু পাকা বিশেষজ্ঞ তো বটে, তাছাড়া আমার বাবা, সেকথা না হয় নাই বললাম।

"আজ তাহলে আসি, বাবা। রাতে আর ঘুম আসবে না চোখে। খুব সম্ভব গুটিপোকাগুলো দেখা দেবে ভোরবেলায় — এরিমধ্যে কয়েকটা 'অগ্রদূত' দেখেছি। আচ্ছা, তুমি কখনো দেখেছো, সদ্যোজাত গুটিপোকাগুলো ফিনফিনে কাপড় হয়ে তুঁতপাতায় গুড়ি মেরে যাবার

সময়ে ঠিক ট্রামের যাত্রীদের মতো হাবভাব দেখায়, ফাঁকা জায়গা পেলেই ঠেলেঠুলে কোনক্রমে ঢুকে পড়ে? এটা অবশ্য এমনি একটা কথা।

তোমার শুরা।”

দ্বিতীয় চিঠি:

“বাবা, অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম, এখন একটু হাঁফ ছাড়ার সময় পেয়েছি। গুটিপোকার সবচেয়ে বড়ো ভাগ বিলি করা হয়েছে। পোকাগুলো বেশ ভালো। হলদেটে পোকা খুব কম। যে সব পরিবারকে বিলি করা হল তাদের কাছে গিয়েছিলাম কাল। সঙ্গে যৌথখামারের একটি স্ত্রীলোক, তার নাম মুহাব্বৎ — অসাধারণ লোক, পার্টির সদস্য। ভদ্রমহিলার যৌবন আর নেই, নাতিপুতি আছে, কিন্তু অত্যন্ত হাসিখুশি। নিজের কথা হাসিমুখে বলেন যদিও জীবনে অনেকে ভুগেছেন। যেমন, ওঁর বিয়ের ব্যাপারটা। গরীব ঘরের মেয়ে, বাপমায়ের সপ্তম সন্তান। ষোল বছরের ‘আইবুড়ো’ মেয়ে যখন, তখন বিয়ে হয়। গরীবের মেয়ে বলে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। অবশেষে একজন পাত্র দেখা দিল, পয়সাকড়িওয়ালা পাত্র আবার। লোকটির গালিচা, লেপ, আলখাল্লা আর সামোভার ছিল। তাকে বিয়ে করে তিন দিন দাম্পত্য জীবন, বিশেষ করে সামোভারটা উপভোগ করেন মুহাব্বৎ। তারপর ফাঁস হল যে এ সব সম্পত্তি তার নয়, সব ভাড়া করা। প্রথমে স্বামীর একজন বন্ধু এসে নিয়ে গেল গালিচাগুলো, লেপগুলো নিল অন্য আর একজন, অন্য সব নিল তৃতীয় এক ব্যক্তি। সামোভারটা শুধু রয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটারো ধান্দায় লোক এল।

“মুহাব্বৎ বলে, ‘তখন সামোভারটাকে দু হাতে জড়িয়ে গাল ঠেকিয়ে বসে রইলাম। সামোভারটা ঠান্ডা, আমার শরীর কিন্তু জ্বলছে। কাঁদতে লাগলাম; কিছু বলল না সামোভারটা। কিন্তু তবু ওটা নিয়ে গেল। আজ ভেবে হাসি পায়। তখন বোকাসোকা গরীব মেয়ে ছিলাম, মাথায় ঢুকত না কিছু। কিছু না ভেবেই কাঁদতাম আর হাসতাম।’

"তার কথাবার্তার ধরনটা এরকম।

"আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরোলাম। গেলাম একটি যৌথখামারীর বাড়ি। দরজায় টোকা দিলাম — কোনো সাড়া নেই। রোদ আর আলো, স্তব্ধতা, অসাধারণ স্তব্ধতা। শুধু মাটির চালে ঢেঁড়ি গাছের দোলন, মৌমাছির গুনগুনানি। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল, ভেতরে ঢুকলাম। একটি বুড়ী এল, বয়স কমপক্ষে একশ বছর, রঙটা ময়লা, দাড়ি আর গলগণ্ড আছে। বোরখা ছেঁড়াখোঁড়া, বুড়ী নিজে ঝুরঝুরে ধুলোর মতন। পাশের বাড়ি থেকে এল আর একটি বুড়ী, তারপর আরো কয়েকজন। ওদেরি মতো জরাজীর্ণ একটি বুড়ো দেখা দিল। বাচ্চারা ভিড় করল। খাসা একটা দল বটে!

"'অন্যরা কোথায়,' জিজ্ঞেস করল মুহাব্বৎ। 'কাজে বুঝি?'

"'হ্যাঁ, কাজে।' বলল ওরা, 'সব্জিক্ষেত আর ফলের বাগানে আছে।' (ওদের যৌথখামারে সব্জি আর ফলের চাষ।)

"হঠাৎ একটি মেয়ে, বয়সে অন্য বাচ্চাদের চেয়ে বড়ো, বলে উঠল রুশীতে:

"'আর আমার বাড়ির লোকেরা আঙুর ক্ষেতে। ওরা নাইট্রেট এনেছে। জিনিসটা হল সার।'

"আর সব আদ্যিকালের বুড়োবুড়ী মাথা নেড়ে, হেসে বলল: 'নাইট্রেট, নাইট্রেট।' এই একটামাত্র রুশী শব্দ তাদের জানা। আসবার সময় ওদের বললাম:

"'আসি তাহলে, নাইট্রেট!'

"'নাইট্রেট, নাইট্রেট,' জবাবে তারাও সমস্বরে বলল।

"প্রথমে গুটিপোকাগুলো একবার দেখে নিলাম। একেবারে বন্ধ একটা ঘরে ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঝোড়ায় সেগুলো রাখা। ওদের পক্ষে ঠাণ্ডা আর ভ্যাপসা। লেপগুলো তক্ষুণি সরিয়ে জানলা হাট করে খুলে দিলাম। পরে মুহাব্বৎ আমাকে বলল:

“‘আমাদের মেয়েদের কাছে রেশম কী জিনিস তা তুমি জান না। রেশম হল ওদের স্বাধীনতার সূত্রপাত। “রেশম” টাকা হল মেয়েদের টাকা। গুটিপোকা নেবার সময়ে ভালো করে দেখা চাই সেগুলো মেয়েরা দিচ্ছে কিনা। তাহলে টাকাটা ওদের কাছেই যাবে। এমনও হতে পারে যে কাজটা করল মেয়েরা কিন্তু টাকাটা পেল পুরুষেরা।’

“আজ তাহলে আসি, বাবা।

তোমার শুরা।”

তৃতীয় চিঠি:

“শোনো, বাবা, যদি তুমি জানতে কী হয়েছে! কী হয়েছে জানো? আমরা আবার মুহাব্বতের সঙ্গে বেরোই। একটা বাড়ির সামনে এসে সে বলল: ‘এখানে ঢুঁ মারতেই হবে, যদিও লোকটা পাজী। নাম মির-শাহিদ। ওর দ্বিতীয় বৌ বড়োই অসুখী। নতুন জীবন বয়ে চলেছে সামনের রাস্তা ধরে, কিন্তু ওর উঠোনে প্রবেশ নিষেধ। ওর তিনটি বাচ্চা। সেজটি একেবারে কচি। অসুখ হয়েছে। ওকে নিয়ে কোথায় যাবে? বাড়িতে রেখে গেলে তো বড়ো বিবি ওর মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে।’

“ভেতরে ঢুকলাম। ঘরটা খাসা আর বড়ো। দেয়ালে অর্থবিভাগের ইনস্পেকটরের ফর্মের কাগজ আঁটা। গুচ্ছির চায়ের গেলাস, ট্রে, কাচের জার। ডাঁইবন্দী লেপ। গৃহকর্তার মুখে মধু, আমাদের খোশামোদ করতে লাগল। কোমরে শাল জড়ানো, তার মানে এখনো মেয়েদের মন ভোলানোর তালে আছে। চাঁদি-টুপিটা পেছন দিকে হেলানো, তার মানে নিজেকে নিয়ে বেশ খুশি। বাচ্চারাও ছিল ঘরে। ছোটটার পা বেঁকা। লোকটাকে বললাম:

“‘ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। রিকেট্স হয়েছে।’

“জবাবে বুকে হাত রাখল সে। আমি বললাম, ‘রিকেট্স,’ ও ব্যঙ্গ করে বলল, ‘রাখমাৎ।’ লোকটার পাশে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে ছিল। নিচু গলায় মুহাব্বৎকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই কি নর-বিবি?’

“অত্যন্ত নিচু গলায় মুহাব্বৎ বলল, ‘না। এ বড়ো বিবি। দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করি নর-বিবি কোথায়।’

“কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ সে পেল না।

“তারপর কী ঘটল জানো?

“গুটিপোকাগুলো দেখতে গেলাম: তা-দেবার কাজ লোকে নিজেরাই করেছে। গুটিপোকাগুলো সবে ফুটেছে — আর স্ত্রীলোকটি, বড়ো বিবি, এক টুকরো কাগজ দিয়ে ওদের জড়ো করছে।

“‘এভাবে কখনো করবেন না, বোন,’ তাকে বললাম। ‘মুরগীর পালক দিয়ে করা চাই। আপনাকে পালক একটা এনে দিই।’

“উঠোনে ছুটলাম, ভেবেছিলাম মুরগী একটা আছে নিশ্চয়ই। এক কোণে, মাটির বড়ো একটা কলসীর পাশে হাঁড়িচাঁচার পালক চোখে পড়ল। এতেও কাজ দেবে। আরো ঝোঁকাতে চোখে পড়ল কলসীটা ছোট একটা চালাঘরের দরজায় হেলানো। সেই দরজার নিচ থেকে কার যেন আর্তনাদ কানে এল। আর কেন জানি না, হঠাৎ মনে হল ওখানে অসুস্থ হয়ে নর-বিবি শুয়ে আছে, ওকে ওরা ওখানে রেখেছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। কথাটা মনে হয়েছে (ব্যাপারটা ঘটে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, মিনিটখানেকও কাটেনি), সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তা স্বয়ং বেরিয়ে গলায় মধু ঢেলে বলল:

“‘আমাদের আর আমাদের গুটিপোকা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, বোন, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু অনেকদিনই আমরা মুরগী পুষিনি।’

“আমিও গলায় মধু ঢেলে জবাব দিলাম:

“‘তাতে আর কী, ভাই মির-শাহিদ, হাঁড়িচাঁচার তুচ্ছ পালকেও কাজ দেবে।’

“এমন ভান করলাম যেন কিছু কানে যায়নি...

“বাবা, ঠিক এখন আর লিখতে পারছি না: মনে হচ্ছে বোলতা উড়ছে। আর বোলতাতে আমার ভীষণ আতঙ্ক, মাকড়সা বা ইঁদুরে অতটা নয়,

যদিও গুটিপোকার বড়ো ভক্ত ওরা। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হল বোলতা। এখুনি গিয়ে দেখতে হবে ওগুলো এত ভনভন করছে কেন। পরে সব তোমাকে জানাব। তারপর কী ঘটে যদি তুমি জানতে!"

যা ঘটে তা হল এই।

যৌথখামার কমসমলদের সেক্রেটারি কুর্কমাস নিজামভ আঙুরলতার মাঝখানে ট্রাকটর চালাচ্ছিল ক্লোভার আর মটর বোনার জন্য। আঙুরলতার মাঝখানকার জায়গাকে কাজে লাগানোর এটা নতুন পদ্ধতি। কয়েকজনে এই বলে আপত্তি করে যে এতে মাটি ক্ষয়ে যাবে, আঙুরলতার যথেষ্ট পরিমাণে সাশ্রয় থাকবে না। তাই একটা মাত্র জায়গায় পদ্ধতিটিকে পরখ করে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অত্যন্ত সাবধানে ট্রাকটর চালাচ্ছিল কুর্কমাস। সে দেখল এ ধরনের ট্রাকটর বড্ড চওড়া, পেলব আঙুরলতাগুলোর ক্ষতি হতে পারে। আরো ছোট ট্রাকটর দরকার, কিন্তু সেরকমটা ছিল না বলে কুর্কমাসের খুব উৎকণ্ঠা। তার চাঁদি-টুপি ঘামে স্যাঁৎসেঁতে, কানে গোঁজা বুনো টিউলিপ উষ্ণ গালের কাছে পড়াতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে।

ধুলোর মেঘে ট্রাকটরের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে এল শুরা।

'কুর্কমাস, থামো!'

তবু লাইনের শেষ পর্যন্ত ট্রাকটর চালিয়ে কুর্কমাস জিজ্ঞেস করল:

'কী ব্যাপার? ধুলোয় চেঁচাচ্ছে শুনলাম, কিন্তু কে চেঁচাচ্ছে চেনা ভার। কী হয়েছে? এ সময়টা আমার কাছে কত জরুরী, আর আপনি চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন!'

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা আরো জরুরী।'

রোদে গরম ট্রাকটরে হাত রাখাতে ছেঁকা পড়ল, তবু যাতে আবার চলতে শুরু না করে তাই চাকা ধরে শুরা কুর্কমাসকে ব্যাপারটা জানাল।

মিথ্যে কথা বলেনি মির-শাহিদ। নর-বিবিকে অন্য কোনো মেয়ে

বলে ভুল করা কঠিন হত। তার 'বিশেষ সব চিহ্ন' রক্তে দলা বেঁধে শুকিয়ে গেছে। চোখ থেকে জট পাকানো চুলে গিয়েছে বিশেষ গভীর একটা ক্ষত।

ছিন্নভিন্ন একটা লেপের ওপর, হাঁটু জড়িয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে চালাঘরে বসে ছিল সে।

'ওর জ্বর হয়েছে, কমরেড,' কাঁপতে কাঁপতে বলল মির-শাহিদ। 'জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে নিজেকে আঁচড়ায়, পড়ে গিয়ে জখম হয়, এমন জ্বর। তোমার জ্বর হয়েছে, সত্যি বলিনি, পেয়ারের নর-বিবি?'

চুপ করে রইল নর-বিবি। কুর্কমাস, শুরা, মুহাব্বৎ আর অঞ্চলের মিলিসিয়ার লোকও চুপ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। শেষ পর্যন্ত ডিসপেন্সারির মেয়ে-ডাক্তার বলল:

'ভাগ্যিস স্ট্রেচারটা আনা হয়েছে। সাবধানে, খুব সাবধানে তুলুন!'

নর-বিবিকে নিয়ে যাওয়া হল। মিলিসিয়ার লোক উরুনবে — তারো কানে টিউলিপ গোঁজা, টিউলিপের মরশুম কিনা — তখন বলল মির-শাহিদকে:

'তোমার বিবি বেঁচে যাবে। ডাক্তার সারিয়ে তুলবে। আচ্ছি বাত। একটা জিনিস শুধু খারাপ, সেটা হল যে ও বেঁচে যাবে বলে তুমিও জানে মারা পড়বে না। কিন্তু জলদি কর। তোমার জন্য কত বছর ওরা সবুর করে আছে ওখানে, ওদের বসিয়ে রেখ না।'

৪

কত মহামতি যুবাকে মানুষ করেছে প্রাচীন হোজ্‌জা-আহ্‌রার মসজিদ, সেখানে এখন মেয়েদের ভিড়। এই অসাধারণ সভাটির কথা কেউ ভাবেনি, কোনো প্রস্তুতি হয়নি। একটা সময়ে খবর রটল যে নর-বিবি — এখন সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে — হাসপাতাল থেকে সটান গিয়েছে তাশখন্দের

ইনস্ট্রাকটরের কাছে। একটা খোবানি-গাছের নিচে বসে চা খাচ্ছে দুজনে। খবরটা জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে, যৌথ ও সাধারণ চাষী, যাদের তখন কাজ ছিল না, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ না করেই চলল মসজিদের দিকে, চত্বর ভর্তি তাদের ভিড়ে।

হতচকিত শুরা শুধু আজিমজানের বাকি পোস্টারগুলো টাঙ্গাবার সময় পেল। পাথরের চৌকো চত্বর সবুজ আর হলদে রঙে গেল ভরে। মাদ্রাসার দেয়াল বরাবর, খোদাই-করা দরজার মাঝখানে গুড়ি মেরে চলেছে প্রকাণ্ড বড়ো গুটিপোকাটা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টারটাতে (আর একটিই মাত্র) আঁকা কমলা রঙের গাউন পরা একটি নবীনা, নর-বিবির চেহারার সঙ্গে সামান্য আদল তার, বুকে কমসমল ব্যাজ। সেটা ঝোলানো হল প্রবেশপথের সামনে, স্বাগতের মতো।

সভা আরম্ভ করল মুহাব্বৎ, তিন বার হাততালি দিল সে। চত্বরটার শব্দ ব্যবস্থা অতি চমৎকার, করতালির প্রতিধ্বনি উঠল তিন বার। মেয়েদের গাউনের খসখসানি, রুমাল, স্কার্ফ আর শালের ফৎফৎ। তারপর সব চুপচাপ। চত্বরের উপরে আকাশের চতুষ্কোণ অত্যন্ত নীল আর চাঁদের কাস্তেতে অলংকৃত, এ সময়টায় যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন।

চত্বরের মধ্যভাগে খোবানি-গাছের নিচে একটা বেঞ্চে নর-বিবি বসে আছে।

মুহাব্বৎ বলল, 'বোনেরা, এই তো সামনে রয়েছে নর-বিবি। আমরা সবাই ওকে চিনি। ওর জীবনের কথা বলা যাক।'

আবার খসখসানি, আবার সে শব্দ মিলিয়ে গেল।

'আগেকার দিনে আমাদের মেয়েদের পাঁচটা কর্তা ছিল। বড়ো বেশি নয়? তবু ছিল। প্রথম কর্তা হলেন আল্লা। তারপর আমির। তৃতীয় কর্তা হল যে কাজ দেয়, স্থল জল যার হাতে। চতুর্থ কর্তা হল মোল্লা। আর শেষের কর্তা হল মিয়া। এই যে নর-বিবি চারটি কর্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, পঞ্চমটি রেখেছে — তারি বিচার আজ আমাদের করতে হবে।

বিপ্লবের আগে মেয়েদের বেচত টাকা, চাল, রকমারি জিনিসের বদলে। বাচ্চা বয়সে সাদি দিত বুড়োদের সঙ্গে (কাঁদছ কেন, নর-বিবি?), যে সব বুড়োদের আরো বিবি থাকত। আমাদের ছেলেবেলাকে ছারখার করে দিত, তবু আমরা চুপ থাকতাম। নর-বিবি, তুমি অনেকদিন চুপ করে থেকেছ, এটাই তোমার অপরাধ। ও দোষী কিনা, বল তো বোনেরা?'

আর জলভরা চোখে বোনেরা উত্তর দিল:

'হ্যাঁ, দোষী!'

'নর-বিবি, দাঁড়িয়ে আমাদের চোখের দিকে তাকাও তো। নিজের শক্তিতে তোমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না, এটাই তোমার দোষ। স্বামীকে ছেড়ে যেতে তুমি ভয় পেতে, তুমি ভয় পেতে যে সোভিয়েত সরকার তোমাকে মাঝপথে ফেলে যাবে, ভয় পেতে যে সরকার অনেক দূরের ব্যাপার আর এত বিরাট যে তোমার ছোট্ট জীবন চোখে পড়বে না। কিন্তু চোখে পড়েছে সরকারের। এ সরকার হল আমি, আমরা সবাই, তুমি নিজে, নর-বিবি। মনে রেখো, তোমার এখনো বয়স আছে, নর-বিবি। তোমার স্বাস্থ্য ভালো, তুমি খাটতে পারো।'

'আমি কী আর করতে শিখেছি, মুহাব্বৎ!' নিচু গলায় জবাব দিল নর-বিবি, কিন্তু চত্বরটার অদ্ভুত গুণে সবাই স্পষ্ট শুনল কথাটা।

'কী করতে শিখেছ?' চত্বরটার চারদিকে ঝট করে চোখ বুলিয়ে নিল মুহাব্বৎ, যেন জবাব চায় ...

পরে শুরা বাপকে একটি চিঠিতে দৃশ্যটি বর্ণনা করে:

"নর-বিবি অত্যন্ত নিচু গলায় বলল (সবাই কিন্তু শুনতে পায়): 'আমি কী আর করতে শিখেছি?'

"আর মুহাব্বৎ — সুন্দর, চালাক মুহাব্বৎ, জহরের মতো মুহাব্বৎ — সারা চত্বরে চোখ বুলিয়ে নিল, যেন জবাব চায়। আর চারদিকে সে দেখল আজিমজানের পোস্টারগুলো, সেগুলো যেন এগিয়ে এল তার কাছে। বিশেষ করে উজবেক স্ত্রীলোক আর গুটিপোকা আঁকা পোস্টারটা

আর মুহাব্বৎ, আমার মুহাব্বৎ, গাঁট পড়া তামাটে আঙুল দিয়ে দেখাল পোস্টারটাকে।

“বলল, ‘আর এটা, এটা তো করতে পারো, পারো না? সবকিছু তোমার নাগালে, তুমি ভুলে গিয়েছ শুধু।’

“বাবা, কী আফসোস, সত্যি কী আফসোস যে তুমি শুনতে পেলে না ওরা কী করে নর-বিবির বিচার সেরে ওকে স্বাধীনতা আর সুখের দণ্ড দিল।”

দাশিরাবদান বাতোজাবাই

সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে সুন্দর হ্রদ বৈকালের কাছে সায়ান পাহাড়তলিতে বুরিয়াত প্রজাতন্ত্রে জন্ম দাশিরাবদান বাতোজাবাই'এর। স্মরণাতীত কাল থেকে পশুপালন করে এসেছে ক্ষুদ্র বুরিয়াত জাতি। বাতোজাবাই জন্মগ্রহণ করেন ১৯২১ সালে। তাঁর বাবাও ছিলেন পশুপালক। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী উলান-উদে'তে একটি নাট্য স্কুলে পড়েন বাতোজাবাই, পাস করার পর কিছুদিন অভিনয় করেন।

১৯৪১ সালে একটি বিমান স্কুলে তাঁকে পাঠানো হয়, বৈমানিক হিসেবে লড়েন নানা ফ্রণ্টে। যুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পর তিনি ঢোকেন মস্কো সাহিত্য ইনস্টিটিউটে, পাস করে বেরোন ১৯৫৭ সালে।

কয়েকটি নাটক ও ছোট গল্প লিখেছেন বাতোজাবাই। তাঁর সবচেয়ে নামকরা লেখা হল একটি ছোট উপন্যাস — "তোমার শিক্ষক কে?" ইঞ্জিন-নির্মাণ কারখানার কর্মী বুরিয়াত যুবকদের জীবন কাহিনী এটি।

"তুমেনের গান" মধুর একটি গল্প। এর প্রধান আকর্ষণ হল চরিত্রগুলির শুদ্ধতা ও স্বধর্মিতা আর দৃশ্যপটের কাব্যমুখর সৌন্দর্য।

তুমেনের গান

ভয়াল গর্জন বৈকালের, সমুদ্রের মতো বিরাট বৈকাল হ্রদ। শুক্লকেশ ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে পাহাড়ে, উত্তুঙ্গ গায়ে রেখে যাচ্ছে ফেনার বিপুল পুঞ্জ। পাহাড়ের মাঝখানের সরু তটে বার বার ধেয়ে এসে বালিতে রেখে যাচ্ছে ফেনার সাদা ফিতে, মুছে নিচ্ছে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। সোনালি বালি ভিজে চকচকে মসৃণ, জলে যে ঘোড়া নেমেছে তা বোঝা ভার।

বিরাট হ্রদের উপরে অনেক উঁচুতে ভেসে চলেছে মেঘ; কখনো কখনো মেঘ কেটে বেরিয়ে সূর্য সোনালি রেখা আঁকছে হ্রদের নীল বুকে।

বিরাট একটা পাহাড়ের নেড়া মাথায় নিঃসঙ্গ বার্চ গাছ দাঁড়িয়ে আছে দুরন্ত জলের উপর। হাওয়ায় শিরশিরে কম্পমান পাতাগুলো যেন গান গাইছে। কিসের গান, কার জন্য? পাথরের কঠোর জড় স্তূপকে গান শোনাচ্ছে? কিম্বা হয়ত সে গান অনেক নিচুতে উদ্দাম নৃত্যরত ঢেউগুলোর জন্য?..

পাহাড়ের ওধারে, হ্রদের অনতিদূরে ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় শান্তিতে চরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ার বড়ো একটা পাল। লালচে-তামাটে ঘোড়ায় চেপে বুড়ো অশ্বপালক নেমে এল জলের কিনারায়। জলের বুকে সোনালি সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, হাতের আড়াল করে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ধুধু নীল বিস্তারের দিকে। মনে হয় কী যেন দেখতে চায় সে, কার যেন অপেক্ষায় আছে।

সে আছে নৌকোগ্‌লোর প্রতীক্ষায়। যৌথখামারের জেলেদের ফেরার কথা এতক্ষণে, কিন্তু কোনো পাত্তা নেই তাদের।

বৈকালকে দেখতে ভালোবাসে ব্‌ড়ো, দেখার সময়ও বয়ে যায়নি। ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ সে বসে আছে; ভরপেট, লালচে-তামাটে ঘোড়াটাও ভারিকেশর মাথাটা জলের দিকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শান্তভাবে।

হঠাৎ একটা পাহাড়ের কোণ ঘ্‌রে পালের মধ্যে ছ্‌রির মতো পথ কেটে দৌড়িয়ে এল মস্তবড়ো, শাদা একটা ঘোড়া। আর তাকে ধেয়ে কালো ঘোড়ায় চেপে দেখা দিল জোয়ান দৈত্যের মতো তুমেন।

ঘোর কেটে যাওয়াতে চমকে উঠে ব্‌ড়ো বাদ্‌মা ঘোড়া ছ্‌টিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে। কিন্তু কোনো দরকার নেই সাহায্যের: চটপটে অভ্রান্ত হাতে তুমেন 'উর্গা' — বার্চ লাঠির কোণে লাগানো লম্বা ফাঁসওয়ালা দড়িটা ছ্‌ঁড়ে তেজী ঘোড়াটাকে কাছে টেনে তৎক্ষণাৎ ঝুঁটি চেপে তার পিঠে চাপিয়ে দিল জিন।

"বাহাদ্‌র বটে, আমাদের তুমেন!" ভাবল ব্‌ড়ো বাদমা। কেমন চটপট তুমেন ঘোড়াটাকে ধরে জিন পরিয়েছে, খ্‌ব তারিফ করল সে মনে মনে।

ঘোড়াটার ম্‌খে তুমেন খলীন গ্‌ঁজে দেওয়াতে ব্‌ড়ো বাহবা দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বেটা এবার জব্দ!' উত্তেজিত ঘোড়াটা চিঁহি ডেকে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করল জিনটাকে ঝেড়ে ফেলতে, কিন্তু পারল না।

ব্‌ড়োর বাহবায় সাড়া দেবার সময় ছিল না তুমেনের। ডান হাতে লাগামটা জোরে চেপে ঘোড়াটার ঝাঁকড়া মাথায় সে তখন বাঁ হাত বোলাচ্ছে, যেন মিষ্টি কথায় ভোলাতে চায়। আর জানোয়ারটাও যেন ব্‌ঝতে পারল ও দ্‌টো শক্ত জবর হাত ছাড়াবার কোনো উপায় নেই। তাই হঠাৎ সে শান্ত হয়ে এল, তব্‌ সারা শরীর তখনো থরথর করে কাঁপছে, কান দ্‌টো নড়ছে, পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

তুমেন আচমকা লাফিয়ে উঠল জিনে, এত হালকাভাবে যে বাদমার পর্যন্ত তাক লেগে গেল। বেশ জোরে চিঁহি ডেকে, পিঠের ওপর থেকে

অনভ্যস্ত বোঝাটা ঝেড়ে ফেলার জন্য পিছনের পায়ে ঝট করে দাঁড়াল ঘোড়াটা। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। শক্ত হয়ে জিনে চেপে বসে রইল তুমেন। তখন মাথা নিচু করে ঘোড়াটা এক ঝটকায় এগিয়ে পাগলের মতো দৌড় দিল...

ওর শাদা গায়ে কালো কালো ছোপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। কশা টানল তুমেন। কানে হাওয়ার শিস, গাছ, ছোট টিলা আর পাহাড় ঝড়ের মতো পেরিয়ে যাচ্ছে তাকে। মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল একবার। বুড়ো বাদমা পিছু আসার কোরশিস পর্যন্ত করেনি।

পাহাড়ের মধ্যে তুমেন উধাও হয়ে গেলে বাদমা একটু হেসে ভাবল:

"ঘোড়াটা জবর হবে বটে! ওহে ইয়ানজিমা, তোমার জন্যই কি তুমেন ওটাকে তৈরি করছে?"

আবার সবকিছু আগেকার মতো: চওড়া সবুজ উপত্যকায় ঘোড়াগুলোর শান্ত চারণ, হাওয়ায় বৈকালের দাপট, পাহাড়ের তলায় ঢেউয়ের আঘাত। বুড়ো আবার ঘোড়ায় করে জলের ধারে নেমে, হাতটা চোখের উপরে মেলে তাকিয়ে রইল দূরে। কতক্ষণে জেলেরা আসবে? ঝড়ের শেষ তো নেই! কিছু একটা ঘটেছে না কি?..

সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যাবে বৈকালের নীল জলে।

হাওয়ার মুখে ভেসে এল গান-গাওয়া পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর। আসছে পাহাড়ের ওধার থেকে, ক্রমশ কাছে আসছে। কথাগুলো এবার বাদমার কানে এল:

> কী তীব্র ডাক আমার এই দুরন্ত ঘোড়ার ...
> দল ছাড়া করেছি ওকে,
> ছিনিয়ে নিয়েছি ওর স্বাধীনতা,
> তাই ওর হৃদয়ের অস্থির স্পন্দন ...
> কিন্তু আমারো হৃদয় অস্থির,
> কী প্রবল আমার হৃৎস্পন্দন,
> কী প্রবল কম্পন!
> এর মূলে আছে ইয়ানজিমা!

'তুমেন গাইছে! গানেও ভোলে না পেয়ারের ইয়ানজিমাকে!' সামনের ঢালু জায়গাগুলোতে চোখ বুলিয়ে আবার হেসে উঠল বাদমা।

পাহাড়ের ওধার থেকে ঘোড়া আর ভেড়ার পাল আসছে হ্রদে জল খেতে। নিজের যৌথখামারের পালে বাদমা দেখল শাদা ঘোড়াটায় চেপে আসছে তুমেন। গান গাইছে সে ...

হঠাৎ হাওয়া থেমে গেল। সন্ধ্যেবেলায় এরকম প্রায়ই হয় বৈকাল হ্রদে। ঢেউগুলো ঢিমিয়ে আলসে হয়ে গেছে। জানোয়ারগুলো নিঃশঙ্কে এল জলের কাছে।

তুমেন গেয়ে চলেছে। সূর্যাস্তের সময় গাইতে সে ভালোবাসে, সূর্যোদয়ের সময়েও গানে বন্দনা জানায়। সূর্যের বিরাট চক্র নিচে নামছে ধীরে, ইতস্তত করে, যেন ভয় ওদিকের সুদূর তীরে পাহাড় চূড়োয় পাইনের নীল ছুঁচলো কাঁটায় যদি বিঁধে যায়।

ঝিমিয়ে আসা জলে গোলাপি আভা। ঢেউয়ের আলোড়ন কমে আসাতে একটি কম্পমান চিকচিকে সোনালি পথ প্রসারিত হল বৈকালের বুকে। আকাশে চঞ্চল কাদাখোঁচা আর পিউইটের জটলা; সমৃদ্ধ দূর ক্ষেত থেকে সংক্ষিপ্ত রাত্রি কাটাতে আসা হাঁসগুলো ধপাধপ নামছে জলে।

গেয়ে চলেছে তুমেন। তার গান ক্রমশ বেড়ে বিস্তার পেয়ে ভরে উঠছে, স্বচ্ছন্দ ভরাট সে গান মুক্তকণ্ঠে নিঃসৃত।

বাদমা একমাত্র শ্রোতা নয় এখন। এতক্ষণে ঘর-ফিরতি জেলেদের কানে গিয়েছে তার কণ্ঠস্বর।

'তুমেন নয়?' কান খাড়া করে বলল এক দাঁড়ি।

'আর কে হবে?' তুমেনের বাবা বুড়ো জারগাল হেসে উত্তর দিল পাশের ইভান কালাশ্নিকভের দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে। দৃষ্টিতে গর্বের আভাস।

মজ্জায় মজ্জায় কালাশনিকভ বৈকালের জেলে, বুরিয়াত যৌথখামারে যোগ দেয় বহু বছর আগে। তুমেনের মতোই সে লম্বা আর প্রকাণ্ড।

'তুমি তো নেহাৎ ক্ষুদে দেখতে, জারগাল, তোমার এমন দৈত্যির মতো ছেলে হল কী করে?' বুড়োকে চটাবার জন্য বলল কালাশনিকভ।

ঠাট্টার জবাব হল ঠাট্টা। জারগাল খুৎসই জবাব দিল:

'ওটা হয় খামারের গোস্ত রুটির দৌলতে। অল্প বয়সে আমার তো এরকম খাবার জোটেনি ...'

জবাবটা দিয়ে খুসিতে বুড়ো হেসে উঠল।

তুমেনের গান এবারে আরো স্পষ্ট কানে আসছে। দাঁড়ের শব্দে শোনার ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সে জন্য ওরা থেমে গেল, স্থিরভাবে চেয়ে রইল সামনে যেখানে তীরের চড়াই আর সূর্যাস্তের আলোয় ঘোড়ার পিঠে গাইয়ে বসে আছে।

জলের উপরে মুখর হয়ে উঠল সেই গান:

এখনো পোষ-না-মানা একটা ঘোড়া
পাগলের মতো দাপাচ্ছে আমাদের পালে।
ধরা দেয়নি আমার ফাঁসে।
আমার গতি ঘূর্ণিঝড়ের মতো,
বাহবা দেয় খামারের লোক,
কিন্তু ওর চোখের ফাঁস এড়াই কী করে!

'গানের পাত্রীটি কে?' জেলেরা জানতে চাইল।

হেঁয়ালিভরা হাসি হাসল বুড়ো জারগাল। ইয়ানজিমা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে টের পেত গানের পাত্রীটি কে। কিন্তু সে নৌকোয় নেই, তীরেও নেই।

'নিজেকে নিয়ে গান গাইছে আর কি,' বুড়ো বলল।

তীরে ভিড়ল নৌকোগুলো। বুড়ো বাদমা স্বাগত জানিয়ে টুপি নাড়াল, কিন্তু শাদা ঘোড়ার সওয়ারী তুমেন চলে গেল পালে। মুখে তার কথা নেই এখন, এত লোকের সামনে গান তার ভেগেছে।

সেদিন আবার বৈকালের জল ফুঁসে কালো হয়ে উঠল; আকাশে

ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু আবহাওয়া ভালো হল না। সূর্য লোকের অগোচরে অদৃশ্য হল পাহাড়ের পিছনে।

ধিকি ধিকি শিবির আগুনের সামনে বসে আছে বাদমা আর তুমেন। আগুনের উপরে ধোঁয়ায় কালো কেটলি, টিনের মগে করে দুজনে চা খাচ্ছে রয়ে সয়ে।

কাছে চরছে ঘোড়ার পাল। ঘোড়ার দাঁতে ঘাস কাটার আওয়াজ, খুরের শব্দ, খেলুড়ে বাচ্চা ঘোড়ার ডাক।

ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বারবার চোখ মেলে তুমেন দেখে নিচ্ছে লম্বা পা, পাতলা একটা বাচ্চা ঘোড়াকে, সেটার কপালে একটা শাদা ছোপ। সমান বয়সের অন্য সব বাচ্চার চেয়ে অনেক লম্বা সে, মাথার গড়ন এবং দীর্ঘ কমনীয় ঘাড় তাকে নিজস্ব একটা চেহারা দিয়েছে। তাছাড়া অত্যন্ত দ্রুতগতি সে। একবার যদি দৌড়বার খেয়াল জাগে তাহলে তিন বছর বয়সের ঘোড়াগুলো পর্যন্ত পাল্লা দিতে পারে না।

বাচ্চাটার দিকে তাকালেই স্নেহে ভরে যায় তুমেনের চোখ। তার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে, পালে নতুন জাতের একটা ঘোড়া পাবার জন্য কত খেটেছে যৌথখামারের পশুপালন বিশেষজ্ঞ, নবীনা ইয়ানজিমা! জাতটা হল প্রসিদ্ধ দন নদী তীরের ঘোড়া আর বুরিয়াতের শক্তসমর্থ ঘোড়ার সংকর। সে ছাড়া আর কে জানে, কত রাত্রি ইয়ানজিমা কাটিয়েছে নতুন জাতের বাচ্চাগুলোর লালনপালনে — সে-সব রাত্রে সেই তো ওকে সঙ্গ দিয়েছে। এখন তাদের হাতে আশ্চর্য সুন্দর এই বাচ্চাটা। তার দিকে প্রতিক্ষণ চোখ না বুলিয়ে কী করে থাকে সে, কেননা যতবার তাকায় ততবার মনে পড়ে প্রিয়ার কথা!

অন্ধকার ভারি হয়ে এল, ছোট্ট ঝর্ণার পাশে বার্চের গুঁড়িগুলো ধূসর অস্পষ্ট। মেঘগুলো নেমে এসেছে, মনে হয় পাহাড়ে চাপ দিচ্ছে তারা।

'আজ রাতে বৃষ্টি হবে,' বলে কাতরিয়ে উঠে দাঁড়াল বাদমা। 'পিঠটা সারাদিন কনকন করেছে কিনা ...'

তুমেনও উঠে দাঁড়াল। বাকি চাটুকু আগুনে ছলকে ফেলে হিসহিসে কয়লাগুলো বুট দিয়ে নিভিয়ে মগ আর ঠাণ্ডা মাংসের বাকি টুকরোটা থলেতে ভরে নিল। রোগা ছোটখাটো বাদমার পাশে তাকে বিরাট দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ, দারুণ ঝড় আসবে, আমার পিঠ কনকনানি নেই তবু মেঘ দেখে বলে দিতে পারি,' হেসে বলল সে মোলায়েমভাবে যাতে বুড়ো মনে ব্যথা না পায়। আবছা আলোয় ঝকঝক করে উঠল তার শক্ত, সমান দাঁত।

'আমার পিঠটা তোমার মেঘের চেয়ে কাছে তো,' পাইপে টান দিতে দিতে গরগরিয়ে বলল বাদমা। পাইপের আলোয় মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হল তার বলিকীর্ণ গাল। 'এ সব লক্ষণের কথা বললে তোমার হাসি পায় জানি। কিন্তু এবারে আমার কথা সত্যি হবে দেখো।'

'মিথ্যে হবে বলছি না, বাদমা খুড়ো,' বুড়োর কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল তুমেন। 'লোকের পিঠ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা উচিত নয় জানি,' হেসে যোগ করল সে।

ওরা এক সাথে কাজ করেছে বহুদিন। বেশ বন্ধুত্ব দুজনের, বিশেষ করে এ জন্য যে দুজনেই গানবাজনা ভালোবাসে। বাদমা 'খুর'* বাজানোয় ওস্তাদ। কিন্তু তবু সুযোগ পেলে দুজনে দুজনকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়ে না। আর সেটা স্বাভাবিক: মাসের পর মাস দুজনে ঘোড়াগুলোকে চরায়, থাকে একসঙ্গে, কথা বলার আর কোনো প্রাণী মেলে কদাচিৎ। তাছাড়া জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক হওয়া সম্ভব নয়, বয়সের বড্ড তফাৎ।

'বেশ, বেশ!' বাদমা খিটখিটিয়ে বলে উঠল। বোঝা গেল তার পিঠের বিষয়ে আলাপ শেষ হয়েছে। 'এখন আমরা কী করব?'

'গিরিখাতে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গেলে ভালো হয় মনে হচ্ছে।'

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ সায় দিল।

নিঃশব্দে ঘোড়ায় চেপে দুজনে বিপরীত দিকে গেল ঘোড়াগুলোকে

---

* দু একটা তারের বুরিয়াত জাতীয় বাজনা বিশেষ।

জড়ো করার জন্য। এরিমধ্যে এত আঁধার হয়ে এসেছে যে মুখ ঘুরিয়ে তুমেন অতি কষ্টে দেখতে পেল বাদমার অপসৃয়মান মূর্তিকে।

হঠাৎ তার মনে হল কাছে কোথায় যেন নেকড়ের গর্জন শুনেছে। পালের ঘুড়ীগুলো দারুণ চেঁচিয়ে বাচ্চাদের ডাকতে লাগল। তারপর কানে এল শত শত ঘোড়ার খুরের মুখর দ্রুত শব্দ, গোটা পালটা তাকে পেরিয়ে ছুটে গেল পাগলের মতো।

ঠিক সে সময় মেঘের ফাঁকে দেখা গেল চাঁদের কাস্তে, ঝাপসা আলোয় তুমেনের চোখে পড়ল তিনটি ঘোড়ার বাচ্চা দল থেকে পিছিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে গিরিখাতের শেষ দিকে। আর বড়ো বড়ো লাফ মেরে তাদের পিছন ধাওয়া করেছে প্রকান্ড একটা বুড়ো নেকড়ে।

কাঁটা জুতো ঘোড়ার গায়ে জোরে চেপে জিনের পিছন দিক থেকে তুমেন ছিনিয়ে নিল রাইফেল। কিন্তু মেঘ আবার জমাট বেঁধেছে, আগের চেয়ে অন্ধকার। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে এগোল শিকারে। কান খাড়া করে আছে, উদ্ধারের আশায় কাতর চিঁহিডাক যে কোনো মুহূর্তে হয়ত শোনা যাবে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কেমন যেন মনে হতে লাগল বড্ড বেশিক্ষণ সে চলেছে, বেচারী ঘোড়ার বাচ্চাগুলোর কাছে এতক্ষণে পেঁাছিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না কিছু।

আশা সে ছেড়ে দিতে বসেছে এমন সময় হঠাৎ একটা টিলার উপরে আকাশের পটভূমিতে একটা বাচ্চার শরীর স্পষ্ট চোখে পড়ল। সেই তিনটের একটা নিশ্চয়ই! ঘোড়াটাকে ঝটকায় সে দিকে ফেরাল তুমেন, কিন্তু বাচ্চাটা ততক্ষণে টিলার মাথায় পেঁাছিয়ে ওধারে চলে গিয়েছে, আর যেখানে সে এই দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে নেকড়ের দ্রুত ছায়া সামনে এগিয়ে গেল তীরের মতো।

পাকা হাত তুমেনের, কাঁধে রাইফেল চেপে ঘোড়া টিপল সে। বন্দুকের আওয়াজ, কান ঝনঝন করে উঠল, সেটা থেমে যেতে অস্বাভাবিক একটা

স্তব্ধতা চারদিক থেকে যেন তাকে আচ্ছন্ন করল। এমন কি সামান্য খসখস শব্দ পর্যন্ত নেই, ঘোড়ার বাচ্চা বা নেকড়ের টুঁ শব্দ নেই।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল। হ্রদের উপরে কোথাও বিদ্যুতের চমক, স্তব্ধতা চিরে বজ্র নির্ঘোষ। বাচ্চা ঘোড়াটাকে যেখানে দেখেছে তুমেন সেখানে সে একটা চক্কর দিল কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে চলল। ভাবল এভাবে চললে আরো সহজে ঘোড়ার পালের সন্ধান পাবে।

শেষ পর্যন্ত দেখা পেল পালের। গভীর সংকীর্ণ একটা গিরিখাতে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে বুড়ো বাদমা। আবহাওয়া খারাপ থাকলে এখানটায় সচরাচর আশ্রয় নিত তারা ...

সারা রাত মুষলধারে বৃষ্টি, বিদ্যুতের হিম নীল চমক আর থামে না, স্বল্প মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে ফুটে উঠছে গরমের জন্য ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলোর দরদর বৃষ্টিতে ভেজা পিঠ।

তুমেন আর বাদমা ভিজে জবজবে, কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রশ্ন ওঠে না। একবারও তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল না।

ভোরের প্রথম অস্ফুট আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তুমেন বাচ্চা ঘোড়াগুলো গুনতে গেল। যা আশংকা করেছিল ঠিক তাই: শাদা ছোপওয়ালা সেই ছিমছাম বাচ্চাটা নেই।

তুমেনের মনে হল বুকটা তার খালি হয়ে গিয়েছে। কুয়াসার মধ্যে সামনে যেন দেখল ইয়ানজিমার মুখ, গাঁয়ের সব লোকের মুখ। বড়ো সেই সভায় সে যখন কথা দেয় পালের বাচ্চাগুলোর দায়িত্ব তার, সবাইকে বিনা ব্যতিক্রমে নিরাপদে সে দেখবে তখন কী হাততালিটাই না পড়ে! পাকাদাড়ি রাখাল রাবদান বলিকুঞ্চিত মুখে তার দিকে চেয়ে বাপের মতো সস্নেহে বলেছিল: 'ওর ওপরে পুরো ভরসা আমাদের!'

আর ইয়ানজিমা, সে সন্ধ্যায় সে কী ভাবে তার দিকে তাকায়, দুজনের দৃষ্টি মেলাতে কী আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার চোখে! মনে হল সে বলছে, "তোমার ওপর ভরসা রাখি, তুমেন!"

বেজার মুখে বলল তুমেন, 'আমি চললাম, বাদমা খুড়ো, ওকে খুঁজে বের করবই... বের করতেই হবে!'

কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে সায় দিল বুড়ো।

অনর্গল বৃষ্টিতে ঘোড়ায় চেপে তুমেন চলেছে তো চলেছে অমূল্য সেই বাচ্চা ঘোড়াটির খোঁজে। দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রাত কাটিয়ে চোখ আর খুলে রাখা যাচ্ছে না। ক্লান্তিতে মাথা ঝুঁকে পড়ছে বুকে। জিনে বসে থাকা কঠিন। অসুখী মনে উতরাই আর চড়াই ভালো করে দেখে ভাঙা গলায় ডাকছে পেয়ারের বাচ্চাটাকে, কিন্তু উত্তরে কানে আসছে শুধু খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি ধারার কলকল ধ্বনি।

সূর্যোদয়ের আগে বৃষ্টি ধরল। ছেঁড়াখোঁড়া মেঘগুলো বিদায় নেওয়াতে দেখা দিল স্বচ্ছ নীল আকাশ, তাতে স্বল্প গোলাপি আভা।

একটা বড়ো টিলার মাথা থেকে তুমেন দেখল বাদমা গিরিখাত থেকে ঘোড়াগুলোকে বের করে আনছে। ঘোড়াগুলো একে একে সংকীর্ণ খাত থেকে বেরিয়ে উপত্যকার বৃষ্টিতে ধোওয়া উজ্জ্বল ঘাসে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে, সুন্দরভাবে চোখে পড়ল। দিনের শুরু হল গতানুগতিকভাবে, যেন সেই অস্থির রাত্রি আর নিষ্ঠুর ঝড়বৃষ্টি ঘটেনি কখনো।

দূরে সায়ানের সূর্যালোকিত চূড়োগুলোর দিকে একবার তাকাল তুমেন, তারপর বৈকালের প্রশান্ত জলে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে সে দেখল চারদিকের বৃষ্টিতে ধোওয়া শ্যামলিমা আর বিষাদে মন ভরে গেল। ব্যাপারটা না ঘটলে কী খাসা লাগত! উদয়াচলের সূর্যকে কী মুখর গানে স্বাগত জানাত সে!..

"কী বলবে ইয়ানজিমা এখন?" ভেবেই তার বুক হিম হয়ে আসে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সমস্ত বিষণ্ণ চিন্তাকে খেদিয়ে খাড়া হয়ে বসল তুমেন। খুঁজে যেতে হবে, খোঁজ চালাতেই হবে! বাচ্চা ঘোড়াটার কী হয়েছে সেটা জানতেই হবে, জানতেই হবে সেটা কোথায় উধাও হয়েছে!

এখনো যে জায়গায় যায়নি সেখানটা দেখে আসার জন্য দৃঢ়ভাবে সে ঘোড়া চালাল বৈকাল তীরের দিকে।

রেল বাঁধের কাছে আসাতে ট্রেনের গুরুগুরু ধ্বনি কানে এল। রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রেলপথটা সে দেখল। সেটা ফাঁকা। "ট্রেনটা সুরঙ্গে," ভাবল সে। আর সত্যিই তাই, তখনি পাহাড়ের কেটে-ফেলা গা থেকে ঝট করে বেরিয়ে এল ধোঁয়ার ছোট্ট একটা কুণ্ডলী। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ইঞ্জিন বেরিয়ে এল রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত বিস্তারে, তারপর দেখা গেল মস্কো এক্সপ্রেসের নীল, ঝকঝকে জানলা গাড়ির সারি। সুরঙ্গের পাথর-বাঁধানো অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে দ্রুত ছুটল ট্রেনটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পাহাড় যেন ঝাঁপিয়ে কাছে এল, পাহাড়ের মাঝে আর একটা অন্ধকার বিষণ্ণ গহ্বর। "কটা সুরঙ্গ এখানে?" মনে করার চেষ্টা করল তুমেন। "উনপঞ্চাশ বোধ হয়। না একান্ন?.."

ঠিক সে মুহূর্তে দ্বিতীয় সুরঙ্গের ওমুখের বাঁধটায় তার চোখ পড়াতে আতঙ্কে শিঁটিয়ে উঠল তুমেন। সুরঙ্গটার ওধারে, যেখানে ট্রেনটা ঢুকবে এক্ষুণি, ঘোড়ার বাচ্চাটা, তার বাচ্চাটা, কপালে শাদা ছোপ সেই বাচ্চাটা বাঁধের ঢালুর ঘাস অলসভাবে চিবোতে চিবোতে ধীরে ধীরে উঠছে রেললাইনে।

ট্রেনটা নিজের থেকে কতদূরে হিসেব করে নিল তুমেন। ইঞ্জিনটা এরিমধ্যে সুরঙ্গে ঢুকেছে, ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে পিছনে। পাহাড়ের গুমগুম শব্দে বাচ্চা ঘোড়াটা মাথা বাড়িয়ে আতঙ্কে এক ঝটকায় ঘুরে রেললাইনের ওপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

"রেললাইন কিছুতেই এখন বাচ্চাটা ছাড়বে না, সটান সামনে দৌড়বে যতক্ষণ না ক্লান্তিতে পড়ে যায়," মরিয়া হয়ে ভাবল তুমেন। "আর ড্রাইভারের নজরে কিছু পড়বে না।"

ভাববার সময় নেই একদম। ঘোড়ার গায়ে জুতোর কাঁটা চেপে চাবুক হানল তুমেন। অবসাদের কথা মনে নেই আর — যেন বৈকালের হাওয়া

সেটাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করেছে... এরিমধ্যে ট্রেনটা বেরিয়েছে সুরঙ্গ থেকে, অতি দ্রুত এসে পড়ছে বাচ্চা ঘোড়াটার কাছে।

'ধরে ফেলতেই হবে, না হলে চলবে না!' ফিসফিসিয়ে উঠল তুমেন।

সত্যিই কি সেটা তার ফিসফিসানি না রগে রক্তের দপদপানি — কে জানে? ঘোড়ার মাথার উপর ঝুঁকে প্রায় শুয়ে এই প্রথম সে ঘোড়াটাকে নিষ্ঠুরভাবে খোঁচা দিল। কানে হাওয়ার সনসন, চোখ কেটে যাচ্ছে হাওয়ায়।

এখন সে নিজেই রেললাইন বরাবর ঘোড়া ছুটিয়েছে, তবু পিছনে ক্রমশ কাছে-আসা চাকার ঘড়ঘড়ানি কানে আসছে না, ইঞ্জিনের ক্রমশ গরম উত্তাপ অনুভব করছে না। একটা মাত্র জিনিস তার বোধে আর মনে — সামনে ঘাড় উঁচিয়ে ছোটা ঘোড়াটা।

মুহূর্তের জন্যও চোখ না ফিরিয়ে সে উর্গাটা বাগিয়ে রেখেছে, ঠিক মুহূর্তে ছুঁড়বে কখন তার প্রতীক্ষায়। টিপ ফসকালে হবে না, ফসকালে চলবে না!..

তারপর সে জিনে খাড়া হয়ে বসে হুপ করে উঠল, সর্পিল দড়িটা শিস দিয়ে উঠল হাওয়ায়, কিন্তু গলায় না পড়াতে পিছলে এল ঘোড়াটার পিঠ থেকে। চমকে উঠে বাচ্চাটা লাফ মারল একটা আর তারপর আরো দ্রুত বেগে ছুটল সামনে, কান মুড়ে। দাঁতে দাঁত চাপল তুমেন। যেতে যেতে উর্গাটা তুলে নিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে যত জোরে পারে চাবুক কষাল, আর ঘর্মাক্ত জানোয়ারটা পাগলের মতো দৌড়বার শেষ চেষ্টা একটা করল। আর এক সেকেন্ড, তারপরই বাচ্চা ঘোড়াটা ঢুকবে সুরঙ্গে... আবার উর্গা ছুঁড়ল তুমেন...

ইঞ্জিনের হুইসেলের বিকট আওয়াজে চাপা পড়ল আর সব কিছু। ভার মুক্তির একটা অসাধারণ বোধ তুমেনের সারা শরীরে — সে দেখেছে এবারে ফাঁসটা বসেছে বাচ্চা ঘোড়াটার গলায়! কিন্তু পর মুহূর্তে তার জ্ঞান লোপ পেল: ঘোড়াটার সঙ্গে সে গড়িয়ে পড়ল খাড়া বাঁধ থেকে।

মনে হল ট্রেনটা থেমেছে... চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে যাত্রীরা। ভিড় ঠেলে বিড়বিড় করতে করতে আসছে বুড়ো বাদমা। কী বলছে সে? মনে হল কাল রাতে দেখা একটা স্বপ্নের কথা বলছে। সেটা কী করে সম্ভব: দুজনে তো একদণ্ড ঘুমোয়নি!..

চোখ খুলে অনেক চেষ্টায় তুমেন শেষ পর্যন্ত বলল, 'কী? কী হয়েছে?'

বাঁধের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে।

ততক্ষণে ট্রেন চলে গেছে অনেক দূরে। পাহাড়গুলোর উদ্যত কিনারায় লেগে আছে শাদা ধোঁয়ার রেখা। পাথর আর ঝোপঝাড়ে আস্তে আস্তে রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বে। তার ঘোড়াটা ধীরে সুস্থে ঢালু হয়ে চলেছে বৈকালের দিকে, পিঠের জিনটা বেঁকে গিয়েছে। তার পাশে পাশে ছুটেছে শাদা ছোপওয়ালা বাচ্চাটা। গলায় উর্গার কালো ফাঁস।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে তুমেন উঠে পড়ে নেংচাতে নেংচাতে ঘোড়াগুলোর পিছনে চলেছে, পেছন থেকে কানে এল বুড়ো বাদমার গলা।

'পাহাড়ের মাথা থেকে সবকিছু দেখেছি, তুমেন,' সে বলল। 'উর্গা ছোঁড়ার পর পড়ে যাবার সময় ছেড়ে যে দাওনি তাই রক্ষে ... তোমার যেমন টিপ তেমনি উর্গা ছোঁড়ায় হাত বটে ... ধরো, নাও এটা!'

ফিরে দাঁড়াল তুমেন। বাদমার হাতে নেকড়ের সদ্য-ছাড়ানো একটা ছাল।

দুজনে ঘোড়ার পালে ফিরল হেঁটে। পাইপ ধরাতে গিয়ে কাশতে কাশতে বাদমা ঘোষণা করল:

'যাই হোক, লক্ষণে বিশ্বাস না করাটা তোমার অন্যায়। কাল সকালে যখন বেরোচ্ছি তখন আমার ঘোড়াটা দুবার হোঁচট খায়। তখনি জানতাম যে বিপদে পড়ব।'

তুমেন জবাব দিল, 'হোঁচট না খেলেও ঘটত। তোমার ঘোড়া কী সবজান্তা, বাদমা খুড়ো?'

'বেশ, বেশ, ও নিয়ে আর তর্ক করব না,' গরগর করে বলল বুড়ো। 'কিন্তু এটা বলব তুমেন: তুমি খাসা ছেলে!'

একটু চুপ করে থেকে ধূর্ত চোখে তাকিয়ে সে যোগ করল:

'যা হোক, ইয়ানজিমা, মানে যার জন্য তুমি গাইলে, সে না থাকলে তুমি বাচ্চা ঘোড়াটাকে বাঁচাবার এত চেষ্টা করতে না। সেটা তো মানো? ঠিক না?'

ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকাল তুমেন, কিছু বলল না। কী লাভ বলে? বৃদ্ধ যা খুসি ভাবুক।

যদি সে বলে যে শুধু ইয়ানজিমাকে নিয়ে ব্যাপারটা নয়, তাহলে হয়ত বুড়ো তাকে বিশ্বাস করবে না।

গেওর্গি গুলিয়া

চা আর তামাক ক্ষেত, লেবু ও কমলালেবুর দেশ আবখাজিয়া কৃষ্ণ সাগর উপকূলে ককেশাসে অবস্থিত।

হিংস্র জাত-শত্রুতার নানা রীতিনীতি এখানে এককালে ছিল আইনের সামিল, সেসব দিনের কথা এখনো মনে আছে বুড়ো পাহাড়িয়াদের। সময় বদলেছে, আগেকার ভয়ঙ্কর জিনিসকে এখন মনে হয় হাস্যকর। "বেড়ার ভরসা হল খুঁটি,. মানুষের ভরসা হল মানুষ" — একথাটা এখন আবখাজিয়ার চাষীদের প্রিয়। "আবার দেখা"য় আবখাজীয় চাষীদের মনোজগতের পরিবর্তনের কথা বলেছেন গেওর্গি গুলিয়া।

গুলিয়াদের পরিবারে লেখনী হল বংশানুক্রমিক। গেওর্গি গুলিয়ার (জন্ম ১৯১৩) বাবা দ্মিত্রি গুলিয়া (জন্ম ১৮৭৪) আবখাজিয়ার লোককবি এবং আবখাজীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। ছেলের লেখাও সমান জনপ্রিয়। পাঠকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হল তাঁর তিন খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস, যেটাতে তিনি আবখাজীয় গাঁয়ের কথা বলেছেন। খণ্ডগুলির নাম: "সাকেন'এ বসন্ত", "ভালো সহর" ও "কামা"।

আবার দেখা

ওরা অধ্যাপক নান্‌বা'র প্রতীক্ষায় ছিল। হোটেলে তাঁর জন্য একটা ঘর ভাড়া করা হয়েছে। যৌথখামারের সভাপতি আলেক্সেই তাম্‌বিয়া তাঁকে আনতে স্টেশনে গেলেন।

বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স নানবা'র। পুরু শেলের চশমার দরুন চেহারাটা বেজার-বেজার ঠেকে, কিন্তু সে ধারণা সত্বর কেটে যায় তাঁর ব্যগ্র বন্ধুজনোচিত ব্যবহারে।

হোটেলে তাঁর ঘরটা রাস্তার উপরে — রুপোলী পপলারগুলো সেখানে পাতলা চুড়ো তুলে ধরেছে আর ছড়িয়ে-পড়া তুঁতগাছ সকালের ঝরঝরে হাওয়ায় গুঞ্জরিত। জানলা খুলে আনন্দের সঙ্গে তিনি সে গুঞ্জন শুনলেন, মনে হল তাঁর কাছে অদ্ভুত-ঠেকা নিঃস্তব্ধতাকে আরো ফুটিয়ে তুলেছে এ গুনগুনানি।

ক্রমশ হেমন্ত সকালের তাজা ভাব কেটে গরম পড়ল। মাটি থেকে ভাপ উঠে দূরের সব গিরিখাতে নীলাভ মেঘে জমাট বেঁধে ঢালু বেয়ে উঠল সূর্যকে দেখতে। একেবারে কাছের পর্বতমালা পেরিয়ে তুষারাবৃত কয়েকটি গিরিশেখর সূর্যের আলোয় খড়্গের মতো জ্বলন্ত। সকালটা স্বচ্ছ। তুহিনকণার ডগায় জলবিন্দুর মতো স্বচ্ছ।

'পাহাড়!' বলে উঠলেন নানবা, যেন আগে কখনো জিনিসটা দেখেননি। 'আহা, পাহাড়!'

'হ্যাঁ, ওগুলো দেখবার মতো বটে,' প্রসন্নভাবে সায় দিলেন তামবিয়া।

'আর কুয়াশা!' সোৎসাহে বলে চললেন নানবা। 'কতদিন পরে আবার এই কুয়াশা দেখলাম!'

নানবা তাঁর জন্মভূমি আবখাজিয়ায় এসে পড়েছেন দৈবাৎ। একমাস আগে তিনি ভাবতেও পারেননি যে আবার সেই পরিচিত ধূসর পাহাড়, নীলাভ কুয়াশা আর স্বচ্ছ আকাশ উপভোগ করবেন। এ সব অঞ্চলের স্মৃতি তাঁর মনে অনুরাগ ও তীব্র বিরাগের কষ্টকর বিরোধী অনুভূতি জাগায় সর্বদা, স্মৃতিগুলো তিনি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞ অধ্যবসায়ী লোক তিনি, ভাববিলাসে নিজের কাজের ক্ষতি করতে পারেন না। তাই উত্তেজনা দমিয়ে তিনি তামবিয়ার সঙ্গে আগেকার আলাপ চালালেন।

'আপনি যা লিখেছিলেন তা সব সত্যি?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর।'

'তার মানে আপনাদের লেবুগাছ মাইনাস বারো পর্যন্ত সইতে পারে!' উত্তেজিতভাবে বললেন নানবা। 'বারো! ঠিক বলছেন? কৃষিবিদদের বলেছেন? ভেবে দেখি তো।'

নিজেকে সামলে ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগলেন তিনি, বক্তৃতার সময় যেমন থেমে থেমে বলেন ঠিক তেমনি।

'তাহলে শীতের ধকল সয় আপনাদের লেবুগাছ...'

'দুটো শীত, প্রফেসর।'

'দুটো শীত, আর মাইনাস বারো ঠাণ্ডা পড়ে? তবু ফল ধরে গাছে, সত্যি? কোনো ভুল করেননি তো?'

সেয়ানা চোখে তামবিয়াকে দেখছিলেন নানবা, কিন্তু তামবিয়া তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন দৃঢ়ভাবে। যা বললেন তাতে সন্দেহ করা চলে না।

'এখানকার আবহাওয়া খারাপ,' বলে চললেন তামবিয়া। 'লোকে ভাবত এখানে লেবুগাছ আমরা গজাতে পারব না। ঠাণ্ডা থেকে গাছ বাঁচাবার

জন্য আবরণ তৈরি করাতে বেশ পয়সা লাগে। তাই শীত সইতে পারে এমন একটা জাত বের করার চেষ্টা চালাতে হল। মনে হচ্ছে আমরা সফল হয়েছি! আপনার গবেষণা আমাদের অনেক কাজ দিয়েছে, প্রফেসর। কিন্তু আরো বেশি আশা করি আপনার কাজ থেকে।'

পরের বছরের পরিকল্পনার কথা নানবাকে জানালেন তার্মবিয়া। প্রথম পরীক্ষাগুলি বেশ কাজ দিয়েছে, এবার দু হেক্টর জমিতে যৌথখামার শীত-সওয়া লেবুগাছ লাগাবে। জেলার কর্তৃপক্ষরা সাহায্য করার কথা দিয়েছেন।

জোড়কলম লাগানোর পদ্ধতি বিষয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন নানবা। তার্মবিয়া যা বললেন তার অনেকটা অবিসংবাদিত, কিন্তু কিছুটা নয়। আর যে সব জিনিস নিয়ে খটকা সেগুলো ঠিক করার কথা অধ্যাপকের।

দু বছর আগে শীত-সওয়া লেবুগাছ বের করার সম্ভাবনা নিয়ে একটা বই লেখেন নানবা। এ দু বছর তাঁর কাটে নানা চাপে, একের পর অন্য বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হয় ক্রমাগত। "আমার পথটা ঠিক," নিজেকে বারবার বলেন তিনি, "ফলটা ভালো হবেই।" কিন্তু ফল পেতে সময় লাগে বেশ। কয়েকটি দক্ষিণী রাষ্ট্রীয় খামারে তাঁর পদ্ধতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। হয়ত খুঁটিনাটি জিনিস লোকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলে। তিনি ভাবেন যে গিয়ে দেখে আসবেন, কিন্তু সহর ছেড়ে যেতে মন চায়নি, দক্ষিণের সূর্যদীপ্ত বিস্তারের চেয়ে ফলরাখা কাঁচের ঘর তাঁর বেশি পছন্দ।

তারপর এল অপ্রত্যাশিত খবরটা! আবখাজিয়া থেকে আসাতে সবচেয়ে অবাক হলেন নানবা। একটি যৌথখামারের সভাপতিমণ্ডলী তাঁর জরুরী সাহায্য চেয়ে পাঠান — "ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল — শীত-সওয়া লেবুগাছ বিবর্তনে সাফল্য আরো বিকশিত করা," চিঠির বক্তব্য ছিল এই। নিমন্ত্রণটি এত লোভনীয় যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

রওনা হতে দেরি হয়নি। কিন্তু পথে এবং গন্তব্যে পৌঁছিয়ে তাঁর মনে

খট্‌কা জাগে — সত্যি সত্যি গাছটা আছে তো? ফাঁদ নয় তো? অস্পষ্ট দ্বিধায় তিনি বিচলিত হন ...

ইতিমধ্যে নিজের বক্তব্য শেষ করে তামবিয়া পরবর্তী প্রশ্নের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস না করে খুসিতে বুক ভরে তাজা হাওয়া নিয়ে কী একটা ভাবতে ভাবতে নানবা বললেন, 'পোনেরো বছর এমন কিছু নয়, তবু মনে হচ্ছে এই প্রথম এখানে এসেছি ...'

ভাবনাচিন্তার একটা টুকরো তিনি উচ্চারণ করেন এতে, অর্থটা জানা শুধু তাঁরি কাছে। তবু তামবিয়া আবার কথা বলতে শুরু করাতে তিনি বিরক্তি বোধ করলেন — অর্থটা তাহলে ধরা পড়েনি ওর কাছে।

একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে তামবিয়া বললেন, 'আমি অবাক হইনি। অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটা আমার জানা। কিছুদিন আগে তিন মাসের একটা রিফ্রেসার কোর্স নিতে সহরে যাই। ফিরে এসে দেখলাম খামারে কী একটা বদলেছে। নতুন খবর কী, জিজ্ঞেস করলাম। কয়েকজন নতুন বাড়ি বানিয়েছে, নতুন আসবাবপত্র কিনেছে কয়েকজন, একটা দিবা-নার্সারি খোলা হয়েছে। "ব্যস, এই সব?" জিজ্ঞেস করলাম। "হ্যাঁ, এই সব," ওরা বলল। কিন্তু কেমন যেন মনে হল ওরা কী একটা জিনিস আমার কাছে গোপন রাখছে, কী — সেটা ধরতে পারলাম না। আমাদের পাহারদারকে একদিন কথাটা বললাম। সে কী বলল জানেন? "লোকের মনোভাব বদলে গেছে ... কিন্তু কাগজে কলমে তার তল্লাস করবেন না, ওটা তো মানুষের ভেতরকার ব্যাপার!" শনে ভাবলাম বুড়োর মনোগতি বদলে দিতে হবে যাতে পরমব্রহ্ম গোছের কিছু একটা বলে না বসে শেষ পর্যন্ত।'

'হেরে গেলেন ওর কাছে, আশা করি?' বাধা দিয়ে নানবা বললেন।

'হারা বলে হারা!' উৎফুল্লভাবে জবাব দিলেন তামবিয়া। 'আমার যুক্তিতর্কে লোকটা এত ক্ষেপে গেল যে চেঁচাতে শুরু করল। ডেস্ক থেকে ঝট করে একটা খবরের কাগজ তুলে আমার নাকের সামনে ধরল। "লেখাপড়া

শিখে আমি বুদ্ধির দিক দিয়ে যে লাভ করেছি সেটা কোন বইতে লেখা আছে?” এর মানে মানুষের ভেতরকার ব্যাপার!’

‘আপনি হার মানলেন?’

হেসে উঠলেন তার্মবিয়া, ‘ঠিক হার মানিনি তবে তথ্যের মুখোমুখি হওয়াতে হটে এলাম।’

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে জোর দিয়ে বললেন নানবা, ‘হটা আপনার উচিত হয়নি। অবশ্য পোনেরো বছরে অনেক কিছু হয়েছে, সেটা তো এমন কি আমার মতন বাড়িতে-বসা কর্মীর কাছেও স্পষ্ট। তবু, আপনার পাহারাদার যা বলেছে তেমন রাতারাতি যদি আমরা বা আমাদের মনোভাব বদলে গিয়ে থাকে তাহলে জীবনের চেহারাটা অন্য হত অনেকভাবে... সত্যি বলছি...’

বেশ জোর দিয়ে শেষের কথাগুলো বললেন নানবা, যেন কিসের একটা ইঙ্গিত করছেন।

‘এ নিয়ে তর্ক করব না,’ বলে চললেন তার্মবিয়া, পিছু হটতে তাঁর ইচ্ছে নেই... ‘এ নিয়ে আমিও ভাবছি। আপনি বিদ্বান লোক, সবকিছু বোঝেন, আপনি আরো পরের কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি — আমার চারপাশে যা দেখি বা যার মধ্য দিয়ে গিয়েছি শুধু তা নিয়ে কথা বলতে পারি। একটা উদাহরণ দিই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা, আবখাজিয়ার মানুষরা, ছিলাম তমসায় আর অজ্ঞতায়, রাজা উজীরদের কাছে মাথা নুইয়ে চলতাম। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের জগতের সীমা ছিল আঙিনার বেড়া। প্রত্যেকে থাকতাম নিজের জগতে, নিজের গর্তে যেমন ভালুক থাকে। এটা আমার যেমন জানা তেমনি আপনারো। আর এই সেদিন তো জ্ঞানের জন্য কোথায় যেতে হয় আমরা শিখি, আর এখন আপনার মতো বিজ্ঞানী দেখা দিয়েছে আমাদের মধ্যে। আপনিও তো সেই নতুন মনোভাবের অংশ শেষ পর্যন্ত। তাই নয়?’

বিব্রত হয়ে নানবা বললেন, ‘আমার কথা তুলবেন না। বরং বলুন কখন খামারে রওনা হব?’

‘গাড়ি আসবে একটায়।’

'চমৎকার। আর যদি নতুন জিনিসের কথা তুলতেই হয়, তাহলে আমি বলব প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত আপনাদের, আপনাদের খামারের — বড়ো একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান আপনারা করছেন। আচ্ছা, পরীক্ষার ভার কার হাতে ছিল সেটা তো আপনি বলেননি। এখানকার কৃষিবিজ্ঞানী না বাইরের লোক?'

'দুটোর একটাও নয়। লোকটি সাধারণ খামারী, আমাদের একটি দলের নেতা। আমরা ওর নাম দিয়েছি- "লেবু-মানুষ", লোকটা লেবুগাছ নিয়ে পাগল।'

'কিন্তু কে সে?' বাধা দিয়ে বললেন নানবা।

'সালুমান আরান।'

'আরান?'

'হ্যাঁ, গুদিমের ছেলে। আপনি চেনেন হয়ত?'

'কী নাম বললেন, আরান? না, চিনি না,' এক পা পিছিয়ে, বুকে হাত রেখে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন নানবা। বুকটা ধড়ফড় করছে, রগে দপদপানি। 'মাফ করবেন, এটা হল স্নায়ুপীড়া ইত্যাদি... আর কি। রাস্তার ধকলে ক্লান্ত লাগছে একটু। জিরিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি কার্যনির্বাহ কমিটি বের করে নিতে পারব। একটু হয়ত দেরি হবে, এই যা...'

'আমি তো বলেছিলাম আপনার ঘুমোনো দরকার,' ভর্ৎসনার সুরে বললেন তামবিয়া। অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

চিন্তার খেই পাবার চেষ্টা করলেন নানবা কিন্তু মাথাটা কেমন ভারি হয়ে গিয়েছে, অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার পর যেমন হয়। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অদ্ভুত!

পিছনে হাত মুড়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন, দীর্ঘ দেহ, একটু কুঁজো। মেঝের পাটাতনের ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ। সময় যেন কাটে না।

নিজের সঙ্গে লড়ছেন নানবা, লড়ছেন বাপ-ঠাকুর্দার সেই সব খেলো ভাবধারণার সঙ্গে যেগুলি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে ঠেসে ধরা হয়েছে, গাদা

বন্দুকে বারুদ যেমন ঠেসে ভরা হয়। বারুদটা অল্প মিইয়ে গেছে বটে, তবু জ্বলে উঠতে পারে এখনো। সেটা নানবা অনুভব করেন।

মনের প্রশান্তি ফিরে আনার অনেক চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু গনগনে লোহা জলের ছোট পাত্রে ডোবালে যা হয় তার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাঁর চেষ্টার ফলকে — জল একেবারে উবে যায়, লোহাটা শুধু অল্প কালচে হয়।

নানবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল; পায়চারি করে চললেন তিনি ...

গরম বাড়ছে ক্রমশ। পাহাড়গুলো স্বপ্নালসভাবে ধূমায়িত, পর্বতমালায় অগোচর গিরিখাতগুলো ধরা পড়ে পাতলা ফিনফিনে মেঘের রেখায়। জানলার তাকে কনুই রেখে স্মৃতির সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন নানবা ...

দুটো পরিবারের মধ্যে জাতশত্রুতা, সেই ধরনের চিরাচরিত শত্রুতা যার উৎপত্তির কথা কেউ জানে না বা মনে নেই কারো। দুটো পরিবার পরস্পরকে ধ্বংস করার, নিশ্চিহ্ন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জিঘাংসা বংশপরম্পরায় চলে এসেছে প্রপিতামহ থেকে পিতামহে, পিতামহ থেকে পিতায়, পিতা থেকে পুত্রে, পুত্র থেকে পৌত্র ও প্রপৌত্রে। সে জিঘাংসা নানবা পরিবারের কাছে পূত। আর আরান পরিবার, ওরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যতদিন একটি মাত্র নানবা বেঁচে থাকবে ততদিন তরবারি কোষে ঢোকাবে না। অনেক, অনেক দিন ওরা ওৎ পেতে আছে ক্ষুধিত নেকড়ের মতো, কখন এ-ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দুটো পরিবারেরি মুরুব্বী আছে — প্রিন্স দুজন। যখনি শোকে বা অবসাদে ওদের জিঘাংসা ঢিমিয়ে আসে, শান্তির জন্য দুটি পরিবার প্রস্তুত হয়, তখনি অন্য লোকের দুঃখে যাদের লাভ সেই প্রিন্স দুজন আবার উত্তেজিত করে তোলে ওদের। আবার শুরু হয় সবকিছু: রক্তপাত, অশ্রুজল, শপথগ্রহণ। আবার সব ফিকির কাজে লাগে — সাপের ধূর্ততা, শেয়ালের বেইমানি, মানুষের ঘৃণা।

একাধিকবার নানবাদের উঠোনের ফটক বিষণ্ণভাবে কিচকিচ করেছে দীর্ঘকাল, তার মানে ফেল্ট ক্লোকে আবৃত মৃতজনের আগমন। কবরখানায়

কফিন চলে যাবার পর বিকট আওয়াজ করে বন্ধ হয়েছে ফটক। বনের মধ্যে কবরের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে আঙুরলতার মতো।

আরানদের আঙিনাও অশ্রুজলে সিক্ত, লোনা স্তেপভূমির মতো তিক্ত সেখানকার মাটি। কান্নাকাটি করে না আরানরা, শুধু গোঙায়, গভীর চাপা গোঙানি। শুধু এ ভাবে তাদের দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। একগুঁয়ে অটল আরানরা ভয়াল প্রতিহিংসা নেয় বলে খ্যাতি আছে।

একদিন নক্ষত্রখচিত, শেয়াল ডাকা সাঁঝে সালুমানের বাবা গুদিম আরান ঢুকলেন নানবাদের আঙিনায়। এক টুকরো রুটিতে কুকুরগুলোকে থামিয়ে ঢুকলেন চোরের মতো চুপিচুপি। বৃদ্ধ কান নানবা আগুনের পাশে ছেলের সামনে বসে একটা প্রাচীন উপকথা শোনাচ্ছিলেন।

দোরগোড়ায় হঠাৎ এসে গুদিম বললেন, 'নমস্কার। কাজ সারতে এসেছি...' ঝট করে পিস্তল টেনে গুলি চালালেন গুদিম। কী একটা বলার চেষ্টা করে পারলেন না কান, কথাগুলো গলায় আটকে গেল, আগুনের মধ্যে ঝুঁকে পড়ল তাঁর দেহ। ব্যাপারটা ঘটল চকিতে, বজ্রপাতের মতো।

বৃদ্ধ কানের দেহ ঘিরে বিলাপ চলল চারদিন। পুরো চারদিন আলেকসান্দ্র নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল মরা বাপের মুখে। মাঝে মাঝে তার মনে হল বাবার ঠোঁট নড়ছে, কী যেন বলতে চাইছেন তিনি, আর তখন মনে পড়ল কী তিনি বলেছেন তাকে।

'বাছা, সূর্য ওঠে পাহাড়ের পেছন থেকে, অস্ত যায় সমুদ্রের ওপারে; তুষারের একটা তাল সূর্যের আলোয় ঝলকিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে, আর মানুষ প্রতিহিংসা নেয়, তারপর মরে। কথাগুলো মনে রাখিস।'

বৃষ্টির পরে লাঙল দেওয়া মাটির মতো ভাপসা সেই সব ধূসর রাত্রে বাবা ছেলেকে বলতেন বারবার:

'রক্তের গন্ধ হল কড়া, শকুন যেমন জানোয়ারের লাসের গন্ধ পায় তেমনিভাবে রক্তের গন্ধ পায় জিঘাংসু মানুষ। আর শিরায় রক্ত আটকে

রাখতে পারে, এমন কিছু নেই। বরাবর এরকম চলে এসেছে, বরাবর এরকম থাকবে। কথাগুলো মনে রাখিস।'

জীবনের অমোঘ আইনে এভাবে বাপ বেটাকে পাঠ দিয়েছেন, কত শতাব্দীর সঞ্চিত অশুভ এবং নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা সমর্পণ করেছেন।

বাবার কথাগুলো পরিহার করার জন্য কী না আয়াস করতে হয় অধ্যাপক নানবাকে! ওগুলো তো সটান গিয়েছিল তাঁর মর্মস্থলে। স্বপ্নে দেখতেন যে বাবা বলছেন, প্রতিহিংসা না মেলাতে তিনি পচে যাচ্ছেন, উত্তেজিতভাবে দোহাই দিতেন পিতার প্রতি সন্তানের প্রেমের, শাসাতেন, অনুনয়-বিনয় করতেন। বৃদ্ধ নানবার জীর্ণ ঠোঁট ফিসফিসিয়ে উঠত: "আরানরা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে দুনিয়ায়!"

স্বপ্নগুলো দৈহিক যন্ত্রণার মতো!

১৯২১ সালে জীবনের গতানুগতিক ধারা গেল বদলে। লোকে বলাবলি করতে লাগল বলশেভিকদের কথা, নতুন একটা জীবনযাত্রার কথা। কেউ বা সে কথা বলত আশা আর সহানুভূতির সঙ্গে, কেউ বা বলত আতঙ্কে আর ঘৃণায়। অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। মনে হল এমন কি চাঁদ পর্যন্ত অন্যভাবে আলো ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। সে সময় আলেকসান্দ্র নানবা যায় সহরের প্রথম বোর্ডিঙ স্কুলে। তাঁর মনে ঘুরত পরিত্যক্ত গৃহের কথা, বনের জন্য ব্যাকুল বন্দী নেকড়ের বাচ্চার মতো। লোকে তাঁকে কাপুরুষ ধরে নেবে ভাবলেই শরীর মুচড়ে উঠত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফিরে যাওয়া। "বরাবর এরকম চলে এসেছে, বরাবর এরকম থাকবে!" বাবার মুখে শোনা কথাগুলো ভোলেননি তিনি।

পরে একটা বড়ো সহরে তিনি গেলেন পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্য। সেখানে কানে এল যে একজন নানবা হত্যা করেছে গুদিম আরানকে। একদিন গুদিমের ঘোড়া তাঁকে ফিরিয়ে আনে, বসার ধরনটা অস্বাভাবিক, উল্টো দিকে মুখ করে। ফেল্ট ক্লোকে সযত্নে আবৃত বৃদ্ধ জিনের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন। অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ না দেখলে কারো বিশ্বাস হত না যে তিনি মৃত ...

বছরের পর বছর কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত, গাঁয়ের লোকে যেমন বলে, বড়ো আদমি হয়ে বড়ো সহরে গুছিয়ে বসলেন আলেকসান্দ্র ...

অপ্রসন্ন চিন্তায় মগ্ন অধ্যাপক নানবা ঘরে পায়চারি করছেন। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ঠিক সে সময়ে "বড়ো আদমি" কথাটা শোনাচ্ছে ব্যঙ্গের মতো।

"বোকার মতো কেন এখানে এলাম," তিনি ভাবলেন। "কী হঠকারিতা! কী করে সমস্ত কিছু ভুলে গেলাম?"

নিজেকে নিয়ে তিনি চিন্তিত নন অবশ্য। অধ্যাপক তিনি, শিক্ষিত লোক, প্রতিহিংসা পর্বকে বর্বর একটা প্রথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা তাঁর পক্ষে হাস্যকর হবে। কিন্তু অন্য লোকটি এখনো হয়ত পুরনো ধারাকে আঁকড়ে আছে, অজ্ঞতার দরুন পুরনো রীতি অনুযায়ী হয়ত প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করবে। এ ধরনের অজ্ঞতা একেবারে বিলোপ পেয়েছে, সেটা শপথ করে কেউ বলতে পারে না। তার সঙ্গে দেখা না হবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কী করে?

দরজায় কে ধাক্কা দিল। হোটেলের লোক নিশ্চয়ই।

'ভেতরে আসুন,' চেঁচিয়ে বললেন নানবা।

দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চাষীর সাদাসিধে পোষাকে একজন লোক। বাঁ কাঁধটা একটু এগিয়ে দিল সে যাতে দশাসই কাঠামোটা দরজা হয়ে ঢুকতে পারে।

'মাফ করবেন,' ব্যস্তসমস্তভাবে সে বলল। 'কাজ সারতে এসেছি। শুধু আমার ব্যাপার হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। এই দেখুন, কয়েকটা লেবু এনেছি।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন অধ্যাপক। ও মুখ আর ইস্পাত-ধূসর চোখের হিম দীপ্তি তাঁর পরিচিত।

'আমার নাম সালুমান আরান,' বলে স্মিতমুখে হাত বাড়িয়ে দিল চাষীটি।

নানবা হাতটার দিকে তাকালেন এমনভাবে যেন ওটা বিচিত্র একটা জিনিস। কী ঘটল হৃদয়ঙ্গম করার আগেই হাতটা তিনি ধরলেন। যন্ত্রবৎ চাপ দিলেন তাতে, শক্ত কড়াগুলো নিজের হাতে লাগল। প্রতিক্রিয়াটা হল বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো।

‘জানি,’ মৃদুকণ্ঠে বলে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন অতিথিকে। আর হঠাৎ তিনি বুঝলেন যে তাঁর মুখ লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

নরা আদামিয়ান

বর্তমান আর্মেনিয়ার মেয়েদের কথা প্রধানত লেখেন নরা আদামিয়ান (জন্ম ১৯১০)। তাঁর ছোট গল্পের নায়িকাদের কেউ হল পুষ্পকৃষিবিদ, কেউ বা পশুশালাবিশারদ, কেউ বা বিজ্ঞানী।

"জারেভশানের ডাক্তার" গল্পের জারিক চাষী পরিবারের সাধারণ নম্র মেয়ে, চিকিৎসা ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে নিজের গাঁয়ে ডাক্তার হয়েছে। সারা আর্মেনিয়ায় জন পঞ্চাশেক মাত্র ডাক্তার, সে সব দিন কেটে গেছে অনেক কাল। এখন সাদা ওভারঅল পরনে হাজার হাজার লোক সর্বদা বিনা পয়সায় অসুস্থদের সেবার জন্য প্রস্তুত, যত দূর পাহাড়ে গ্রামে থাকুক না কেন তারা। কিন্তু ভালো কাজের কি কোনো সীমা নির্দেশ করা যায়? আর লোকের জন্য সবকিছু করেছে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে জারিক কি স্বচ্ছন্দ ও সুখী হতে পারে?

গল্পটির সুর চাপা, শান্ত। কিন্তু আমরা অনুভব করি জারিকের মতো লোক লেখিকার কতো প্রিয়, কেননা তারা হল তাঁর স্বজনেরি চমৎকার ছেলেমেয়ে।

জারেভ্‌শানের ডাক্তার

শনিবার ডাক্তারখানায় কম বসতে হল জারিককে। ফসল তোলা শুরু হয়েছে, এ সময় ডাক্তারকে বেশি জ্বালায় না যৌথখামারীরা। বাইরের ব্যাগ নিয়ে একেবারে কাছের ক্ষেত-ঘাঁটিগুলোতে ঘুরে জারিক ছোটখাটো চোট-জখমের চিকিৎসা করল। চোখ ধোবার জল আর কিছু ওষুধ ভেজানো গোজ নিয়ে গেল ঝাড়াই-কলে, ওখানে ধুলো লেগে সব সময় লোকের চোখ কড়কড় করে।

সরসর শব্দে শস্য চলেছে। ওষুধ ভেজানো গোজ লোককে দিয়ে জারিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিফ করতে লাগল।

'এদিকে এসো তো, জারিক,' ডাক দিল ছোটখাটো শ্যামবর্ণা একটি স্ত্রীলোক। তার কাঁধ আর মাথায় ধুলোর পুরু স্তর।

'এই জারিক, একটু হাত লাগাও দেখি', নতুন শস্যের বস্তা বাঁধতে বাঁধতে হাঁকল কয়েকটি মেয়ে।

ওরা সবাই জারিকের বাল্যবন্ধু। ডাক্তার হবার আগে এই ঝাড়াই-কলেই এদের সঙ্গে সে কাজ করেছে কয়েক বছর। খুসি হয়ে আজ এদের সঙ্গে আরো থাকত হয়ত কিন্তু খামারের দলপতি আভাক সান্তরসিয়ান তাকে হতাশ করেছে। ভাঁড়ারে বড়ো কয়েকটা চওড়া বেলচা পাওয়ার সুখবর জারিক তাকে দেয়, জলা সংস্কারে বেশ লাগবে, কিন্তু আভাক অপরাধীর মতো তার চোখ এড়িয়ে বিড়বিড় করে উত্তর দিয়েছে:

'এ হপ্তায় জলার কাজ হবে না।'

'তার মানে?'

'গালুস্তের হুকুম। আগে ফসল ঘরে তুলতে হবে।'

আবার সভাপতি প্রবর! ম্যালেরিয়া নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই কোনো। নাকের ডগা ছাড়িয়ে আর কিছু তার নজরে পড়ে না।

'গালুস্ত কোথায়? কোথায় গেলেন সভাপতিমশাই?' বারবার সে খোঁজ করেছে। কিন্তু পাত্তা পায়নি কোথাও। সারা দিনের জন্য সভাপতি খামারের উঁচুজমির জোতে গিয়েছে।

ডিসপেন্সারিতে ফেরার পথে অত্যন্ত বিচলিত জারিক স্কুলে গিয়েছে একবার, সেখানে তখন গ্রীষ্মের দিবা-নার্সারি। জানলার পর্দা নামানো, ঘরগুলো চুপচাপ, ঠান্ডা। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। ছোট ছোট খাটের সারি হয়ে পায়চারি করেছে জারিক।

মোটাসোটা বাচ্চা আনুশ, আসপ্রামের মেয়ে, ওখানে ঘুমোচ্ছে হাত দুটো ছড়িয়ে, হাতের মুঠি বেজায় পাকিয়ে; আস্তে আস্তে সমান ছন্দে নিশ্বাস পড়ছে। আর ওখানে শুয়ে আছে সবায়ের পেয়ারের আশোতিক, চাদরটা সরে গেছে পায়ের ঠেলায়, দেখা যাচ্ছে ছোট্ট নগ্ন একটা পা। তার বিছানার ধারে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াবার বেজায় লোভ হল জারিকের, কিন্তু না থেমে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল সে: আশোতিক তার ভাইপো আর ডাক্তার সবাইকে এক চোখে দেখে না এ ধারণা কারো হওয়া উচিত নয়। কিন্তু শেষ খাটটার কাছে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে সে দেখেছে রোগা পাতলা একটি মেয়েকে। মৃত অবস্থায় তার জন্ম। ক্ষুদে নীল শরীরটা নিয়ে কত খেটেছে জারিক, জীবনের অস্থির শিখা যদি আবার জ্বলে ওঠে! 'কী করছ? কোনো লাভ নেই,' সবাই বলেছে তাকে। 'মরাকে তুমি জিয়োতে পারবে না।' কিন্তু সফল হল জারিক, আরো একটি মানুষের জীবনে সমৃদ্ধ হল পৃথিবী। আর কি মিষ্টি না হয়েছে মেয়েটা!

জারিকের পিছু পিছু, প্রায় তার পা মাড়িয়ে চলেছে মানিশ; গোলগাল ছোটখাটো বকুনতুড়ে স্ত্রীলোকটির হাতে নার্সারির ভার, নার্সারি নিয়ে তার বেজায় জাঁক।

সুর করে সে বলল, 'সকালে ভাঁড়ারে গিয়েছিলাম মাখনের জন্য আর লোকটা দিল নোনতা মাখন। বাচ্চাদের জন্য নোনতা মাখন! তাই খুব শান্তভাবে বললাম তাকে: "মিষ্টি মাখন রেখেছ কার জন্য?" ও বলল: "মিষ্টি মাখন — সে তো সহরে নিয়ে যাচ্ছি বেচতে। সভাপতির হুকুম।" এক্কেবারে জ্বলে উঠলাম। মাখনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ওর মুখে ...'

মানিশের দৌড় জানার জন্য তার দিকে তাকাল জারিক।

'যাই হোক, পিপেতে ছুঁড়ে দিলাম তো মাখনটা,' ভুল শুধরে বলল মানিশ। 'বললাম, "বাচ্চাদের নোনতা মাখন দিলে ডাক্তার আমাকে খেয়ে ফেলবে যে!" লোকটা বলল: "কোন ডাক্তার? সাকো সারোয়ানের মেয়ের কথা বলছ? ও তো কিস্সু নয়, ওকে আমি ডরাই না।" '

'আর মাখনটা?'

'মাখনটা দিল। আমাকে চটাবার মুরোদ আছে ওর?'

রোদে-ভরা বারান্দায় বেরিয়ে আসাতে জারিকের চোখে পড়ল খালিপায়ে ছোট্ট একটি মেয়ে হলদে শূন্য পথে স্কুলের দিকে দৌড়িয়ে আসছে।

'শীগগির আসুন, জারিক, আমো'র অসুখ হয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বাচ্চাটি।

তার সঙ্গে যেতে যেতে জারিক আর একবার ভাবল গ্রাজুয়েট হবার পর গ্রামে ফিরে আসাটা বুদ্ধিমানের মতো হয়েছে কি না। কিন্তু আর কোথায় যেত? জারেভ্শানে তার বাড়ি, যাকে ভালোবাসে সে থাকে এখানে, এখানকার সব কিছু তার পরিচিত, তার প্রিয়।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকমতো দাঁড়ায়নি। যে সমাজে তাকে সবাই ছোটবেলা থেকে দেখেছে, যেখানে এমন কি বাচ্চারা পর্যন্ত তাকে নাম ধরে ডাকে সেখানে ডাক্তারের যোগ্য সম্মান অর্জন করা মুশকিল। যেমন, যৌথখামারের

সভাপতি, সে তো জারিককে কেউ-কেটা বলে ধরে না, তার কথায় কান দেয় না। জলা-সংস্কারের যে আদেশ জেলা কার্যবাহী কমিটি এবং গ্রামের সোভিয়েত দিয়েছে সেটাকে সে প্রায় আমল দেয়নি, মাত্র একবার জলাভূমির সংস্কারে লোক পাঠিয়েছিল।

রোগীর বাড়িতে ঢুকল জারিক। অবিশ্বাস্য রকমের জ্বলজ্বলে পশমের কম্বলের নিচে সোফার উপর শুয়ে আছে একটি যুবক, সুন্দর মুখ জ্বরে লাল হয়ে উঠেছে।

'কী হল তোমার, আমো?' উদ্বেগ ও সহানুভূতিভরে জিজ্ঞেস করল জারিক।

'যা হোক একটা কিছু করো, জারিক,' অনুরোধ জানাল আমো, তার লাল টকটকে চোখে অনুতাপের ছাপ। 'শুয়ে থাকার সময় এখন নয়।'

'ওকে বলো তো জারিক, বলো তো তুমি! বিছানা ছেড়ে এখনি কাজে যাবার জন্য ছটফট করছে। সেখানে না গেলে এতক্ষণে ঠিক হয়ে যেত!'

'মা!' কাতরিয়ে উঠল আমো।

'কোথায় গিয়েছিল?' কিছু না ভেবে, থার্মোমিটর দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল জারিক। 'যা ভেবেছিলাম! প্রায় চল্লিশ!'

'কোথায়? বলছি। আভান্‌লুতে গিয়েছিল। বলতে গেলে রোজ রাত্তিরে সেখানে যায়। তাই অসুখ হয়েছে।'

রোগীকে চিৎ হয়ে শুতে সাহায্য করল জারিক। আঙুলের নিচে ধরা পড়ল পিলে ফুলেছে। তাই বৃদ্ধা আভানলুর কথাটা বলেছে!

'ম্যালেরিয়া,' জারিক জানাল।

'আমিও তাই বলেছিলাম,' সুর মেলাল আমো'র মা।

বাইরের ছোট উঠোনে জারিকের হাতে জল ঢালতে ঢালতে সে বলল, যেন ছেলের সাফাই গাইছে:

'মেয়েটি থাকে আভানলুতে। হেমন্তে ওদের বিয়ে হবে।'

বাড়ির উঠোনটা খাড়া খাদের ধারে। উঠোনে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়

জারেভশান গ্রাম পাহাড়ের কতো উঁচুতে। পাহাড়গুলো ঢেউ খেলে চলেছে দিগন্তে, ক্রমশ উঁচু হয়ে শেষ পর্যন্ত যখন দিকচক্রবালে পৌঁছয় তখন তারা উত্তুঙ্গ পর্বত, মাঝখানে বাঁধা পড়েছে প্রশস্ত একটি উপত্যকা। নিচে ছোট একটা নদী এঁকেবেঁকে উপত্যকা পেরিয়ে গিয়েছে আভানলু গ্রামে। নদীটা নিয়ে জারিকের মাথাব্যথা, আমো'র অসুখের কারণ এটি। বসন্তে ও গ্রীষ্মে পাহাড়ের বরফ গলাতে নদীটা কূল ছাপিয়ে যায়, গড়ে ওঠে ছোট একটা জলা। সে নিয়ে কেউ ভাবে না, আভানলু ও জারেভশানের কয়েকজন লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত না হওয়া পর্যন্ত।

ব্যাপারটা আরো বেশি অপ্রীতিকর এ জন্য যে প্রজাতন্ত্রে ম্যালেরিয়া এখন কদাচিৎ হয়, অনেক দিন আগেই ম্যালেরিয়ার ডিপো সাফ করা হয়েছে।

একটি তদন্ত কমিশন তারি কথায় এসে জলা সাফ করার আদেশ দিয়েছে, এ নিয়ে জারিকের গর্বের ভাব আছে।

জলাটা বড়ো নয়। ম্যালেরিয়াবাহী মশার ডিমে একটি মিশ্র ওষুধ ছড়ানো হয়, আভানলু এবং জারেভশানের যৌথখামারীদের বলা হয় জলার জল সরাতে।

"ওষুধ ছড়িয়ে লাভ হয়নি," কাতরাতে থাকা আমো'র দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে ভাবল জারিক। "আভানলুর চেয়ে জারেভশানের লোক ম্যালেরিয়ায় বেশি ভোগে কেন? আভানলুর জমিতেই তো জলাটা, আভানলুর আরো কাছে, কিন্তু ওখানে বলতে গেলে কারো ম্যালেরিয়া হয়নি, হয়েছে শুধু তাদের যারা ওখানে নতুন এসেছে আর জারেভশানের লোকেদের যারা উপত্যকায় গিয়েছে। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে জিজ্ঞেস করতে হবে ..."

জারিক ভাবল, আজ তো জলার কাজ হবে না, তাই যে সব নতুন তথ্য সে সংগ্রহ করেছে সেগুলো আভানলুতে গিয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে বলা ভালো।

এ মানুষটি লোকের কাছ থেকে খাতির আদায় করতে পারে বটে! জারিক রাত-দিন কলে যায়, কিন্তু বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ নির্দিষ্ট সময় কাজের

পর কখনো কলে যান না। অত্যন্ত জরুরী কল হলে অবশ্য আলাদা কথা। প্রথমেই সে জানিয়ে দিয়েছে, "আমাকে গবেষণা করতে হয়, শান্তিতে তাই থাকতে হবে।" তার উক্তিতে এমন একটি চরমভাব ছিল যেটাকে প্রশ্ন করা যায় না। সবাই, এমন কি যৌথখামারের সভাপতি পর্যন্ত ভয় শ্রদ্ধা করে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে।

খামারীরা বলাবলি করে: 'আমাদের ডাক্তার যে কোনো প্রফেসরের চেয়ে তুখোড়।' আর জারিক সর্বদা তার শ্রেষ্ঠতা মেনেছে। এমন একজন ওয়াকিবহাল ও অভিজ্ঞ লোক পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার, তার নিজের গর্ব এতে ক্ষুণ্ণ হলেও কিছু এসে যায় না।

'আমি যাচ্ছি আভানলুতে,' অনেক দিনের বেতো রোগী সভাপতির শাশুড়ী বলল সে দিন। 'ডাক্তার বাগ্রাত আমাকে তাঁর সেই মলমটা দেবেন। ওষুধটা খুব কাজের ...'

বিরক্ত হয়ে জারিক বলে, 'ওটার প্রেসক্রিপসন আমি লিখে দিতে পারি। ডাক্তার বাগ্রাত তোমাকে দেখবেন না। কেন দেখবেন?'

'দেখবে বই কি!' ধূর্ত হাসি হেসে জবাব দিল বুড়ী। 'ওকে কী করে বাগাতে হয় আমার জানা আছে। প্রথমে ওর মায়ের কাছে যাব, ঠিকমতো খাতির করলে বুড়ী খুসি হয়। তুমি এতে কিছু মনে করো না, বাপু, তুমিও ডাক্তার খারাপ নও,' জারিকের বিব্রতভাব দেখে সে অনুকম্পার সুরে যোগ করল।

বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের সাহায্য জারিককে নিতে হয় প্রায়ই, তবু এ ধরনের মন্তব্য গায়ে না লেগে পারে না।

প্রথম সাক্ষাতের দিন বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ জারিককে বলে, 'আপনার জেলায় সমস্ত সংক্রামক কেসের খুঁটিনাটি রিপোর্ট যদি লিখে রাখেন তাহলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হব, প্রিয় সহকর্মী।'

এটা হল বছর খানেক আগের কথা। এখন তাকে নাম ধরে ডাকে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ, আর তার কাছে জারিক নিয়মিতভাবে পরিষ্কার গোটা

গোটা অক্ষরে লেখা নোট নিয়ে আসে। গবেষণার কাজে যোগ দিতে পেরে সে খুসি, যোগদান যৎসামান্য হলেও।

ডিসপেন্সারিতে ফিরে এসে মাড়-চকচকে ওভারঅল খুলে ফেলল জারিক। স্নাতকোত্তর হবার পর কম সময় কাটেনি, কিন্তু এখনো কোটটা দেখলে গোপন একটা গর্বের পুলক জাগে তার মনে — এ তো পিছনে আর কব্জিতে ফিতে দিয়ে বাঁধা চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের ছাত্রের মামুলী ওভারঅল নয়, রীতিমতো ডাক্তারের ওভারঅল, ঝিনুকের বড়ো বড়ো বোতাম, পকেটগুলো চওড়া।

এ সময় গাঁয়ের রাস্তায় লোক নেই। শুধু কাঠের বারান্দায় বসে বুড়ীরা শস্য বাছছে বা পশমের সুতো কাটছে।

গুমোট স্তব্ধতায় জারিকের ছোট্ট মেয়ে কারিন্‌কাকে বিশেষ তাজা আর চঞ্চল মনে হয়। বাড়ির গেট হয়ে তীরের মতো বেরিয়ে এসে, খুসিতে হাসতে হাসতে ছোট হাত বাড়িয়ে সে এল মায়ের কাছে।

'তুমি আর বেরোবে না তো?' এটা হল তার রোজকার অবধারিত প্রশ্ন।

জারিক শক্ত ছোট শরীরটা ধরে ফেলল।

'কিণ্ডারগার্টেনে যাওয়া হয়নি কেন, কারিন্‌কা?'

অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিল ক্ষুদে মেয়েটি।

'ওখানে সবাই ঘুমোচ্ছে,' নিচু গলায় বলল। 'আর আমার ঘুমোতে ভালো লাগে না।'

'মানে তুই পালিয়ে এসেছিস!' ভর্ৎসনার সুরে বলল জারিক। 'তোকে তাই বাগ্রাত জ্যেঠামশায়ের কাছে আজ নিয়ে যাব না। ভেবেছিলাম নিয়ে যাব, কিন্তু যাব না।'

'সত্যি বলছ, মা? না, সত্যি নয়। আমাকে নিয়ে যাবে, তাই না? পায়ে পড়ি, মা! বল, আমাকে নিয়ে যাবে!'

আগ্রহে থরথর করে কেঁপে চোখে প্রায় জল এসে গেল কারিনকার।

নিজের মনের দুর্বলতার জন্য নিজের উপর বেজায় চটে, এড়িয়ে-যাওয়া গোছের ভাবে জারিক বলল, ‘এখন থেকে সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত তোর ব্যবহার দেখি, তারপর দেখব...’

উঠোনে কাঠের একটা ঢাকার নিচে জারিকের শাশুড়ী ‘লাভাশ’ সেঁকতে ব্যস্ত। মায়াবিনীর মতো চটপটে হাতে ময়দার তাল ঘুরিয়ে লম্বাটে চেপটা করে, তারপর ঝুঁকে মাটির নিচের গনগনে উনুনে সেটাকে চাপড়ে বসিয়ে দিচ্ছে। দুতিন মিনিট অন্তর অন্তর গোলাপী খাস্তা ‘লাভাশ’ আঁকড়া দিয়ে টেনে বের করে তক্ষুনি সেঁকা সুগন্ধি জিনিসগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্য হয় চওড়া টেবিলে নয় বারান্দার কাঠের রেলিঙে রাখা হচ্ছে। আগুনের তাপে লাল চোখ তুলে বৃদ্ধা তাকাল জারিকের দিকে। মাথা নেড়ে উঠোনে প্রতীক্ষমাণ একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিল। মাথা নাড়ানোর মানে, “তোমার কাছে এসেছে!” পিতৃপ্রধান পরিবারের কড়া আদবকায়দার মানুষ জারিকের শাশুড়ী স্বল্পভাষী।

উঠোনে পাথরের টালির উপর হাতপাখার মতো চওড়া স্কার্ট ছড়িয়ে বসেছিল দর্শনার্থি — সনা খুড়ি। জারিককে দেখামাত্র রোদে পোড়া ইটের মতো তার লাল মুখে এল তীব্র যন্ত্রণার একটা ছাপ।

“গেছি বাবা রে!” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল জারিক।

‘সাংঘাতিক খারাপ লাগছে, সাংঘাতিক,’ সনা খুড়ি শুরু করল, যেন জারিকের ভাবনার উত্তরে। ‘উনি বললেন “ডিসপেন্সারিতে যাও,” কিন্তু আমি ভাবলাম, কেন সেখানে যাব? ডাক্তার আমাদের সাকোর মেয়ে নয়? আমাদের গিকরের শ্যালী নয়? আমরা কি পর? আমার ঠাকুমা আর গিকরের মা খুড়তুতো বোন নয়? তাই ওনাকে বললাম, “না, ডিসপেন্সারিত গেলে জারিক ক্ষুণ্ন হবে।” তাই এখানে এসেছি!’

কথাটা বলা হল এমনভাবে যেন সনা খুড়ি আসাতে জারিকের কৃতার্থ হওয়া উচিত।

"বোধহয় রক্তচাপ বেড়েছে," সনা খুড়ির দশাসই দেহ এবং মুখের লালচে আভার দিকে চেয়ে ভাবল জারিক।

'রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না, বুক ব্যথা করে, পিঠ ব্যথা করে, হাত ব্যথা করে,' ঘ্যান ঘ্যান করে বলল সনা খুড়ি। 'রোগে আমাকে পেয়ে বসেছে। সভাপতি বলে, "আমরা যখন ফসল তুলি তখন তুমি হাঁসমুর্গীর খামারে কাজ করো গিয়ে।" কিন্তু কাজ করি কেমনে?..'

জারিকের শাশুড়ী একটা ময়দার তাল ঠিক করতে করতে সনা খুড়ির দিকে এমনভাবে তাকাল যে সে থেমে গেল। জারিককে জিজ্ঞেস করল ক্ষিধে পেয়েছে কি না।

তার দৃষ্টি ও বাধাতে জারিক বুঝল যে শাশুড়ী সনা খুড়িকে পছন্দ করে না।

'আপনাকে শেষ পর্যন্ত ডিসপেন্সারিতেই যেতে হবে মনে হচ্ছে,' বলল জারিক। 'যন্ত্রপাতি আর ওষুধ সব তো ওখানে।'

'আমাকে এখনকার মতো একটা চিরকুট দাও না কেন?' সাহস করে বলল সনা খুড়ি।

কিন্তু জারিক তখন কী করতে হবে তা ঠিক করে ফেলেছে।

কূটবুদ্ধি লোকের মতো সে বলল, 'না, আপনার হয়ত খারাপ অসুখ হয়েছে, আপনাকে হয়ত সহরে পাঠাতে হবে বিশেষজ্ঞের কাছে।'

মাটি থেকে অতিকষ্টে উঠে স্কার্ট দুলিয়ে সনা খুড়ি গেল গেটে।

'তুমি খেয়ে নাও,' বলল জারিকের শাশুড়ী। 'সবুর করতে হবে না। আর্শো কখন ফিরবে তার ঠিক নেই।'

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল জারিক। বীজ বপন এবং ফসলের সময়ে হপ্তার পর হপ্তা দেখা হত না স্বামীর সঙ্গে, সেটা প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হত। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তার জন্য সে অত্যন্ত ব্যাকুল, যে সব ব্যাপারে সে চিন্তিত, তা নিয়ে আলোচনা করতে চায়।

অসন্তোষের ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে ভেতরে গেল সে।

সন্ধ্যেবেলায় যৌথখামারের গাড়ি এসে থামল জারিকের বাড়িতে। কোচওয়ানের পাশের সীটে হাঁচড় পাঁচড় করে প্রথমে উঠল কারিনকা, সেখানে বসে গাড়ির চারপাশে ভিড় করা খেলার সাথীদের দিকে তাকাল বিজয়িনীর মতো।

জারেভশানের সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে আভানলুর চমৎকার একটা দৃশ্য চোখে পড়ে। অনেক বাগান সমেত গ্রামটা বড়ো কালো একটা ছোপের মতো রয়েছে নিচের উপত্যকায়। চওড়া শক্ত রাস্তায় ঘোড়াগুলো গাড়ি সহজে টেনে নিয়ে চলেছে। গরম কমে গিয়েছে, আকাশ জ্বলজ্বলে, হাওয়া স্বচ্ছ। নদী থেকে আসছে একটা তাজা ভাব। তীরের ঘন সবুজ ঘাসের ছোপ দৃষ্টিকে নিয়ে যায় জলা ভাগগুলিতে। নিচে তাকাল জারিক। ওখানে, একেবারে কিনারায় যে কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত তার চিহ্ন। কিন্তু কাজটা এখন পর্যন্ত যৎসামান্য! জল বের করে দেবার নালাগুলো সুতোর মতন সরু!

আঁকাবাঁকা ক্রমশ ঢালু হয়ে যাওয়া একটা পথ বেয়ে ঘোড়াগুলো নামল গিরিখাতে। দূরত্বটা সামান্য, মাত্র পোনেরো মাইল, কিন্তু উচ্চতার তফাৎটা স্পষ্ট বোঝা যায়। যেন একটা জোলো ঝাঁঝালো হাওয়া ছুটে এসে ভাগিয়ে দিচ্ছে তাজা শুকনো পাহাড়ে হাওয়াকে। বাগানের একটা মেখলা আর সারি সারি আঙুরক্ষেত পেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা পেীছল গাঁয়ে।

দুটো গ্রামের পার্থক্যের কথা ভেবে জারিক বরাবর অবাক হয়ে যায়। হলুদ আর তামাটে রঙের অত্যন্ত স্বল্প প্রলেপে কঠোর তুলিতে জারেভশান আঁকা। সবটা মাটি, বালি আর গম। আর আভানলু হল সবুজ রঙা ছোপের অফুরন্ত বৈচিত্র্য, পশাতা গাছের পাতলা রুপোলি-ধূসর রঙ আর নবীন আঙুরলতার নরম মরকত থেকে ফেনিল-মাথা বাদাম গাছের ঘন সবুজ। জারেভশান থেকে নিঃসৃত হয় টাটকা খরখরে একটা ভাব। নালা আর ঝর্ণামুখর আভানলু থেকে ওঠে জোলো ভাপ। অভ্যাস এবং ঐতিহ্যও আলাদা, এমন কি বাসনকোসনও। জারেভশানে লোকে ব্যবহার করে চওড়া চেপটা পাত্র: সালি — বুনট করা বড়ো ঝুড়ি, আর শস্য বাছাই, শুকনো ও

খোসা ছাড়ানোর জন্য বারকোষ। আর আভানলুতে আছে কারাসি নামের বিরাট মাটির কলসী, পাতলা-গলা কমনীয় বদনা, মদ, আঙুর আর তুঁতফলের ভদকা রাখার জন্য খড়-জড়ানো বোতল। জীবনধারণের সুরটা পর্যন্ত আলাদা। যেমন, এখন ফসল তোলার সময় পাহাড়িয়ারা সবচেয়ে ব্যস্ত থাকে, আর সে সময় উপত্যকায় শান্ত জীবনযাত্রা, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আভানলুর শস্যক্ষেত বিশেষ বড়ো নয়, নিম্নভূমিতে তাড়াতাড়ি পাকা শস্য অনেক দিন আগে ঘরে তোলা হয়েছে। আভানলুর প্রধান উৎপাদ্য হল আঙুর, কিন্তু তখন লতায় সবেমাত্র গজিয়ে আঙুরগুলো বিরস ভারি সবুজ পুঁতির মতো ঝুলে রয়েছে।

ছোট পরিষ্কার শাদা একটা বাড়ি, দরজার উপরে লেখা 'ডিসপেন্সারি'। সামনের সিঁড়িতে জারিক ও তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের।

'কারিনকা, তুই ছুটে আমার মায়ের কাছে চলে যা!' হুকুম দিল ডাক্তার। 'আমার হাতে আজ একটা কেস আছে, হাম হতে পারে।'

বাগানের পিছনে সাগ্রহে দৌড়ল কারিনকা। তার খুব চেনা কুটিরের দরজায় একটি মোটাসোটা বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে, চোখগুলো নবীন আর খুব কালো, সাদর অভ্যর্থনায় স্মিত। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের চোখজোড়া ঠিক তারি মতন, একটু বেরিয়ে আসা, চঞ্চল সজীব, ফুর্তিতে আর চতুরভাবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চায় — "কিছু বলতে হবে না, সব জানা আছে, তুমি জানার অনেক আগে ..."

জারিকের যদি শুধু এই প্রশান্তি আর স্থৈর্য থাকত, থাকত নিজের ক্ষমতায়, নিজেতে এরকম বিশ্বাস। এ ছাড়া তো ডাক্তারের চলে না! বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ জারিককে বলত, "রোগীর কাছে লেশমাত্র ইতস্তত ভাব যে ডাক্তার দেখায় সে কাজের ডাক্তার নয়। তাহলে রোগী তাকে একেবারে বিশ্বাস করবে না, তাই প্রেসক্রুপসনের কোনো মানে হবে না। ভালো ডাক্তার কিছুটা অভিনেতাও বটে। আত্মপ্রত্যয় হল আমাদের একটা হাতিয়ার।"

জমকালো চেহারার এই লোকটি সহজেই আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলতে পারে বটে!

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসের চাকরির জন্য প্রথম আসাটার কথা কখনো ভুলবে না জারিক। ওকে জিজ্ঞেস করে, "ওহে খুকি, এখানে এসেছ কেন?"

বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের ডিসপেন্সারিতে সবকিছু শৃংখলাবদ্ধ। ঝকঝকে তকতকে জায়গা, সবকিছু নাগালের মধ্যে। আর এমনটা জারিক কখনো করে উঠতে পারে না নিজের ডিসপেন্সারিতে। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের হাতে তিনটে ঘর, তাছাড়া আভানলুতে হাসপাতাল আর ওষুধের দোকান, এদিকে ছোট গ্রাম জারেভশানে এরকম সুবিধে নেই বলেই তফাৎটা, — এ কথায় নিজেকে ধোঁকা দিতে পারে না জারিক।

তাকে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলে, "চোখ বুজে ডিসপেন্সারিতে কাজ করতে জানা চাই। সবকিছু থাকা চাই নিজের জায়গায়।"

অনেক চেষ্টা করেছে জারিক। প্রায়ই সে ডিসপেন্সারি ধুয়ে মুছে সাফ করে, কিন্তু জায়গাটাতে দৈনন্দিন শৃংখলা বজায় রাখার মতো সময় বা ধৈর্য তার নেই। 'চোখ বুজে' ঘোরার কথা তো ওঠেই না। এই তো সেদিন, লজ্জার ব্যাপার, একটা রোগীর সামনে পটাসিয়ম ম্যাঙ্গানেটের দরকারী নলটা খুঁজে বের করতে তার পুরো পাঁচ মিনিট লাগে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঝকঝকে শাদা একটা টুলে বসল জারিক।

'আমার কাজ এক্ষুণি শেষ হবে, তারপর চা খাওয়া যাবে,' বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলল।

'আরো তথ্য জোগাড় করেছি। এবার অসুখটা আমো'র, ট্রাকটর যে চালায় তার। ট্রেনিং থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। ফসল কাটা চলেছে, ও কিন্তু শয্যাগত। ম্যালেরিয়া। রোগের গতি প্রবল। জ্বর চল্লিশ ডিগ্রি।'

বেশ খুসি দেখাল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে। 'চমৎকার! চমৎকার! গুরুতর ব্যাপার!'

'চমৎকার কী আছে? একেবারে ফুরসৎ নেই ঠিক সে সময়ে আমাদের সেরা ট্রাকটর-চালক কাহিল।'

ডিসপেন্সারির অল্প-খোলা দরজার আড়ালে কে যেন কেশে আস্তে দরজাটায় টান দিল।

'এসো হে!' হাঁক দিল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। 'কে আবার?'

ঘরে ঢুকল একটি বৃদ্ধ, বেঁটেগোছের, একটু কুঁজো, তামাটে কর্কশ মুখে ফিকে বলিরেখা। সযত্নে সাজগোজ করেছে আসার আগে। চকচকে নীল সার্ট আর নতুন স্যুটে ভাঁজ পড়েছে, গন্ধ বেরোচ্ছে ন্যাপথলিনের। মিষ্টিভাবে হেসে, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বৃদ্ধ হাঁটুতে বড়ো তামাটে হাত রেখে বসল টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে।

'বেশ, ইয়েগিশে খুড়ো, বলো কী ব্যাপার? তোমার কী হল?' — খুঁটিনাটি টুকে রাখার একটি কার্ডের উপর কলম বাগিয়ে জিজ্ঞেস করল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

'এমন কিছু নয়, ডাক্তার,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল বৃদ্ধ। 'এই গিন্নী পেছনে লাগে আর কি, এখানে পাঠিয়েছে সেই ... আমার এমন কিছু ব্যথাটাথা হয়নি, জ্বর বা অন্য কিছু নেই। শুধু কিছু একটা মুখে দিলেই ভয়ানক ভারি লাগে, মনে হয় ভেড়ার একটা আস্ত পা গিলেছি। বুকের নিচে কেমন যেন একটা চাপ। আর আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে গেছি। তা ছাড়া আর কিছু না ...'

রোগীকে কোমর পর্যন্ত জামা খুলতে বলল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। নড়বড়ে আঙুলে কোটের বোতাম খুলে ইয়েগিশে খুড়ো সার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেলল। বুড়োর শরীরে হলদেটে একটা ভাব, রোদে-পোড়া মুখ আর হাতের সঙ্গে বিষম একটা বৈসাদৃশ্য। কী একটা বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলল:

'এবার চুপ করো তো! যদি কিছু জানতে চাই, আমিই জিজ্ঞেস করব। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো।'

শাদা কোচে বৃদ্ধের পাশে বসে তলপেটে হাতের চাপ দিয়ে বলল, 'নিশ্বাস নাও ... আরো জোরে...'

আদেশ পালন করল ইয়েগিশে খুড়ো। উঠে দাঁড়িয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ মাথা নাড়াল জারিকের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে জানাল, "তুমি একবার একে দেখ তো।"

কোচের উপর ঝুঁকে বৃদ্ধের তলপেটে আঙুল চালাতে জারিক টের পেল ছোট শক্ত একটা টিউমর। টিউমর যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'তোমার কত বয়স বললে, ইয়েগিশে খুড়ো?' জিজ্ঞেস করল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

'ষাট হবে, বাছা।' এবারে বৃদ্ধ ধীরে সুস্থে জামাকাপড় পরছে অবিচলিতভাবে।

আরো প্রশ্ন তাকে করল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। সঠিক ও পরিষ্কার প্রশ্নগুলির তারিফ করল জারিক। মনে হল প্রত্যেকটি প্রশ্নের ফলে সন্দেহের কুয়াসা খসে গিয়ে রোগটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বেশ চটপটভাবে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ সার কথাটায় এল, 'আমার যা বলার আছে শোনো। তোমাকে সহরে যেতে হবে, বুঝলে? ওরা তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ছুরি চালাবে।'

ছোট্ট একটা হাসি হাসল ইয়েগিশে খুড়ো:

'না। এখনো তো চলাফেরা করছি, কোন না কোনভাবে ওটা সেরে যাবে ...'

'কোন না কোনভাবে সারবে না বলে মনে হয়। তোমার দরকার অপারেসন।' তোয়ালেতে হাত মুছল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল ইয়েগিশে খুড়ো। চোখের হাসি মিলিয়ে দেখা দিল কঠোর ও একাগ্র একটা ভাব।

বিরসকণ্ঠে জানাল, 'অপারেসনে আমি রাজী হব না।'

'ভেবে দেখো, ইয়েগিশে খুড়ো! একমাস বাদে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এলে দেরি হয়ে যাবে।'

ল্যাটিন ভাষায় রোগের বিষয়ে তার নির্ণয়টা জারিক জানাল।

'ঠিক বলেছ! কোনো সন্দেহ নেই। একেবারে স্বমূর্তিতে দেখা দিয়েছে!' বলল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

যে রোগীর ভাগ্য তারা নির্ণয় করে দিয়েছে তার অবোধ্য ভাষায় দুজনের এই সংক্ষিপ্ত আলাপে মনটা মুষড়ে গেল জারিকের।

ইয়েগিশে খুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সতর্ক জিজ্ঞাসু চোখ এ ডাক্তার ও ডাক্তারের দিকে ঘুরছে।

'আমাকে কিছু একটা ওষুধ দাও। হাসপাতালে আমি যাচ্ছি না!' হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে সে জানাল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষুধসুদ্ধ একটা শিশি বের করল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। অকেজো ওষুধটা সন্তর্পণে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল ইয়েগিশে খুড়ো।

'ব্যস!' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। 'চল, চা খাওয়া যাক।'

সযত্নে টেবিলে কাগজপত্তর একত্র করে ইয়েগিশে খুড়োর কার্ডের দিকে চেয়ে রোগটা কী লেখার পর যোগ করল: "অপারেসনে রাজী হয়নি।" তারপর শাদা কোটটার বোতাম খুলতে লাগল।

'এখন ওকে নিয়ে কী করবেন?' চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল জারিক।

'কাকে নিয়ে?' বুঝতে না পেরে তার দিকে ফিরল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

মাথা নাড়িয়ে কার্ডটা দেখাল জারিক।

'কী করতে পারি? লোকটা তো শিশু নয়। এটা ঠিক অপারেসন করলে আরো তিন বছর নিশ্চয়ই বাঁচবে। আর এমন কেসও দেখেছি যাদের রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে ...'

'অপারেসন না করলে বুড়ো নির্ঘাৎ মারা যাবে।'

'হ্যাঁ, চার পাঁচ মাস আয়ু ওর। বড়জোর, ছ মাস। বুড়ো বেশ শক্ত লোক।

'তাহলে অপারেসনের কথাটা আপনাকে জোর দিয়ে বলতে হবে।'

'তুমি কি চাও ওকে টানা হেঁচড়া করে অপারেসন টেবিলে নিয়ে যাব? তার কোনো অভিলাষ নেই। আর সত্যি বলতে, অধিকারও নেই।'

বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বিরক্ত হচ্ছে দেখেও জারিক থামল না।

'ওর জায়গায় যদি আপনার প্রিয় কেউ হত, তাহলে কী করতেন?'

'দেখ, জারিক,' কঠোর ভর্ৎসনার সুরে বলল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ, 'এটা ভুলো না যে তুমি আর আমি কাজ করছি পাড়াগাঁয়ে। অপারেসনের পর বুড়ো মারা গেলে সারা গাঁয়ে হৈচৈ পড়ে যাবে। বলবে যে আমিই ওকে শমনের কাছে পাঠিয়েছি। আমাদের পেশার মর্যাদার কথা না ভাবলে চলে না।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা আছি একশ বছর পিছিয়ে,' বলল জারিক।

বিমর্ষ ও হতচকিত লাগছে তার। শুধু কথার অপচয়। সে বুঝল এ নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নেই।

বসবার ঘরে কয়েকটি রোগী বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের জন্য বসে আছে। ছোটখাট একটি বুড়ী, আর বাচ্চা নিয়ে একটি স্ত্রীলোক।

'তোমরা দেরিতে এসেছ,' বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলল। 'আরো আগে আসা উচিত ছিল।'

বাচ্চাসুদ্ধ স্ত্রীলোকটি কী যেন বলতে চাইল, জারিক থেমে দাঁড়াল, কিন্তু চোখ কুঁচকিয়ে মাথা নেড়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ জানিয়ে দিল আর কিছু সে শুনতে চায় না।

'কাল এস। আজ কিছু করতে পারব না। আমিও তো মানুষ, আমারো বিশ্রাম দরকার।'

স্ত্রীলোকটির হাত থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে দেখার প্রায় সহজাত একটা আগ্রহকে প্রাণপণে দমন করল জারিক।

'ওদের একবার লাই দিলে রক্ষে নেই, এক মিনিট জিরোতে দেবে না,' ছিমছাম ছোট কুটিরটার সদর সিঁড়িতে জারিককে আগে যেতে দিয়ে গজগজ করে উঠল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। আঁকাবাঁকা আঙুরলতা ঢেকেছে বাড়ির দেয়াল।

ডাক্তারের মা বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী। ছেলে আর তার 'ছাত্রীর' মধ্যে — পেছনে জারিককে এই বলে সে ডাকত — অপ্রিয় কিছু একটা ঘটেছে তৎক্ষণাৎ টের পেয়ে জারিকের সঙ্গে আরো মধুর মিষ্টি ব্যবহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা সে করতে লাগল। কিন্তু কেন জানি না গাঁয়ের লোকেদের কাছে শোনা সেই কথাটা জারিকের বারবার মনে পড়তে লাগল যে ডাক্তারের মা পিছন দোর দিয়ে রোগীদের কাছ থেকে মুরগীর ছানা, ডিম আর মাখন নেয় দক্ষিণার বদলে। সোভিয়েত চিকিৎসকদের রীতিনীতির সেটা অমার্জনীয় লঙ্ঘন।

ইতিমধ্যে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের মেজাজ আবার খোশ হয়ে উঠেছে। এক কাপ চা হাতে পায়চারি করতে করতে সে চুমুক দিচ্ছে গরম কড়া চায়ে।

সে বলল, 'তোমার মনের ভাবটা আমি বুঝি, জারিক। তোমার বয়স কম, আগ্রহ আছে। কিন্তু ডাক্তার হওয়াটাই বেশ কঠিন ব্যাপার, তার ওপর সংসারের আর সব ঝামেলা বওয়া চলে না। তোমার ভালো করে বোঝা উচিত যে রোগীর চিকিৎসা হল তোমার কাজ, তোমার পেশা, আর শান্ত ও ঠান্ডাভাবে জিনিসটা নেওয়া চাই। এই ধর না কেন, জলা সংস্কারের ব্যাপারটা। রোমান্টিক ন্যাকামি, আর কিছু নয়! তোমার সাহায্য ছাড়াই ওরা জলা সাফ করবে। একটা কথা তোমার সর্বদা এবং প্রথমেই মনে রাখা উচিত — আরো ভালো বিশেষজ্ঞ হওয়া তোমার চাই। সেই বাচ্চার মতো কান্ড আর যেন কখনো না ঘটে। আমি তো বারবার তোমার পাশে এসে দাঁড়াব না, সেটা ভুলো না।'

হ্যাঁ, সেই লজ্জাকর ব্যাপারটা। বাচ্চাটির সাধারণ একটা ফোলাকে সার্কোমা ভেবে মাঝরাতে আভানলুতে হুড়মুড় করে এসে জারিক বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে ঘুম থেকে তোলে, ভয় পাইয়ে দেয় শিশুটির মা-বাবাকে।

একগংয়ের মতো জারিক বলল, 'ও কথা ছেড়ে দিন। ওরা আমাকে পাঠক্রমের বাইরের ট্রেনিংএ পাঠাবে বলেছে। ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করে করে আমার অরুচি। সব ব্যাপারটা এক্ষুণি খতম করা যায়। আর ব্যাপারটা আমার নয় তো কার?'

সে বলতে চেয়েছিল "আপনারো ব্যাপার," কিন্তু থেমে গেল।

খোশমেজাজে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলল, 'বেশ। কথাটা এখানেই মুলতুবি থাক। ওটা তোমার ব্যাপার, আর এটা আমার,' জারিকের নোট এইমাত্র যে ফোল্ডারে ভরেছে সেটাতে সস্নেহে একটা চাপড় মারল ডাক্তার।

ওপরে 'থিসিসের জন্য তথ্য' লেখা মোটা ফোল্ডারটি দেখাচ্ছে বেশ ভারিক্কি। দেখে শ্রদ্ধা জাগে। আপনা থেকে জারিকের মনে পড়ে গেল জলার ধারে সেই সরু, তুচ্ছ, ছোট নালাগুলোর কথা। তার ব্যাপারটা এগোচ্ছে না বিশেষ!

রাস্তায় বেজে উঠল গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ। কারিনকা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এবারে সজাগ হয়ে মাকে তাড়া দিতে লাগল। গেট পর্যন্ত ওদের পেঁাছিয়ে ডিসপেন্সারিতে ফিরে গেল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

গেটের পাশে গাঁয়ের কয়েকটি লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল আভানলু যৌথখামারের সভাপতি; বৃষস্কন্ধ চওড়া কোমর লোকটি বড়ো চেঁচায়, বড়ো গর্জায়।

'নমস্কার!' নির্লিপ্তভাবে মাথা নাড়িয়ে অভিবাদন জানাল জারিক, কিন্তু তার কাছে এসে না থেমে পারল না। জিজ্ঞেস করল:

'জলাটা সাফ করবেন, না করবেন না? জেলা কার্যবাহী কমিটির নির্দেশ আপনার কাছে কিছু নয়?'

'নয় আবার!' হেসে জবাব দিল সভাপতি।

"গব্দামুখোটা ইয়ার্কি করছে," চটে উঠে মনে মনে বলল জারিক।

সভাপতির পাশে দণ্ডায়মান খামারের পার্টি সংগঠন সচিব ক্ষুদে চোখে জারিকের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। তার চোখদুটো খুব কাছাকাছি বসানো।

"এখানে সবাই দেখছি এক গোয়ালের গরু," জারিক পেঁছল এ সিদ্ধান্তে।

শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কবে কাজে লাগবেন?'

'যখন তোমরা, আমাদের পেয়ারের পড়শীরা লাগবে ঠিক তখন।'

'আমাদের ফসল তোলা চলেছে। তাছাড়া, জলাটা আপনাদের এলাকায়!'

'জমিটা আমাদের অবশ্য, সেটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু নির্দেশে জারেভশান ও আভানলুর লোকদের এক সাথে কাজ করার কথা বলে। কাজটা আমরা একলা করব কেন? সেটা ন্যায্য হবে না। এদের জিজ্ঞেস কর না কেন, এরাই বলবে।'

হাত নাড়িয়ে আশেপাশের লোকদের এমনভাবে দেখাল যেন সবাইকে বলছে তার কথায় সায় দিতে। তাদের মুখের চাপা হাসি দেখে জারিকের মনে হল লোকটাকে সে ঘৃণা করে।

'কাজটা করতেই হবে, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি এক মত,' সভাপতি বলে চলল। 'তোমাদের লোকে শুরু করুক, তক্ষুণি আমরা হাজিরা দেব, সঙ্গে সঙ্গে! তোমরা ফসল তুলছ বা তুলছ না, সেটা তোমাদের ব্যাপার। তোমরা কাজ করলে আমরা কাজ করব। একেবারে হক কথা। আপনি কী বলেন, ডাক্তার?'

প্রশ্নটা ডাক্তার বাগ্রাতের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঘুরে জারিক তাকে দেখার আগেই সে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল জারিকের। হাওয়ায় একটা তাজা ভাব, একটা উজ্জ্বল আভা। সাত সকালে শাশুড়ী উঠে কাজে লেগেছে। জীবনে কখনো তার আগে বিছানা ছাড়তে পারেনি জারিক। সকালের খাবারের জন্য একটা জগ থেকে সুগন্ধি ভেষজ দেওয়া ঝাঁঝালো কড়া পনীর বৃদ্ধা এরিমধ্যে বের করতে শুরু করেছে, জল ছিটোচ্ছে

একগাদা ‘লাভাশের’ উপর। আর লম্বা টার্কিশ তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে আর্শো বাড়ির পেছনের ঝর্ণাটা থেকে ফিরে আসছে।

“সকালের খাবার সেরেই আবার ও সারা দিনের জন্য চলে যাবে,” ভাবল জারিক। “ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ যে কবে পাব ?”

জারিকের দিকে তাকিয়ে হেসে আর্শো তাড়াতাড়ি কাছে এল। দুজনে একলা থাকলে ও বৌকে জড়িয়ে একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিত নির্ঘাৎ, কিন্তু মা’র সামনে এমনকি ওর হাত পর্যন্ত ছোঁবে না সে। তবু নিচু হয়ে জারিকের চোখে চোখ রেখে নরম গলায় ডাকল, ‘জারো!..’

উস্কোখুস্কো চুলে, ঘুম চোখে কারিনকা বারান্দার কাঠের পাটাতনের উপর টলমল করে এল দুজনের দিকে, খালি পায়ে সপাৎ সপাৎ শব্দ করে। ধীরে সুস্থে, বেশ গম্ভীরভাবে উঠল বাপের কোলে। সস্নেহে তাকে চুমু খেয়ে আর্শো খাবারের বাছাই বাছাই টুকরোগুলো গুঁজে দিতে লাগল ওর মুখে। ওরা খেতে খেতে জারিক তাড়াতাড়ি গত দিনের ঘটনাগুলো বলল।

‘দাঁড়াও না, মজাটা টের পাবে লোকটা!’ আভানলু খামারের সভাপতির কথা শুনে সে বলল। ‘নিজের খামারকে কোটিপতি কী করে করবে এ ভাবনা ছাড়া ওর মাথায় আর কিছু নেই। ওর সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত হয়নি। তোমার মনে ব্যথা দেয়নি তো লোকটা?’

আর্শো ভুরু কোঁচকাতে জারিক তাড়াতাড়ি তার সার্টের আস্তিনে হাত বুলিয়ে দিল। স্বামীর দারুণ মেজাজের কথা কি তার জানা নেই!

অল্পক্ষণের মধ্যে কিন্তু আর্শো ধাতস্থ হল।

‘এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা তোমার চলবে না, জারিক। তোমাকে কথা দিচ্ছি যে ফসল তোলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে জলাসাফের কাজে তোমাকে সাহায্য করব, আমার ট্রাকটরটাও নিয়ে আসব। কী, বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?’

‘না,’ জবাব দিল জারিক। ‘তোমাদের সবাইকে আমার চেনা! ফসল তোলা

শেষ হবে, তখন শুরু হবে মেরামত, মেরামত শেষ হলে বীজ বোনার পালা। আর শুধু এ কথাটাই সব নয়! মরতে আমি কেন জারেভশানে প্র্যাকটিস করতে রাজী হলাম। এখানে আমার কোনো খাতির নেই। আর আভানলুর সেই ক্যান্সার রোগীটা! ওর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না ...'

'ওখানে ওদের নিজেদের ডাক্তার আছে। ওদের ব্যাপারে তুমি নাক গলাবে কেন?'

'তোমার কথাটা শুনে সেই পুরনো গল্পটা মনে পড়ছে — একটা লোক ডাকাতের হাতে পড়ে সাহায্যের জন্য চেঁচাচ্ছে আর পুলিশ চেঁচিয়ে তাকে বলছে, "দুঃখিত। এটা আমার এলাকার বাইরে।" '

'কী জানি,' বলল আর্শো। 'অন্য কারখানার মিস্ত্রী আমাদের ট্রাকটর স্টেশনে এসে হুকুমবাজী শুরু করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব! আর দেখ, অন্য কোথাও কাজের কথা আমাকে বল না — বাজে কথা সব! এ বিষয়ে আর একটিও কথা শুনতে চাই না। আর কোথায় কাজ করবে? তোমার বাড়ি এখানে, সংসার এখানে। তোমাকে আমরা যেতে দেব ভাবছ? আর খাতির নেই যে বলছ — সেটা তোমার দোষ।'

ট্রাকটর আর তেলের গন্ধ ভরা কাজের জ্যাকেটটা সে চড়িয়ে কারিনকাকে চুমো খেল, জারিকের গালে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

প্রবেশদ্বারের সিঁড়িতে বসে তার দিকে তাকিয়ে রইল জারিক। শাশুড়ী এসে পাশে দাঁড়াল। চুপচাপ অক্লান্ত এই স্ত্রীলোকটি একা বাড়ির সমস্ত কাজ চালায়, কারিনকাকে মানুষ করেছে সে, তবু জারিকের বরাবর মনে হত যে তার শাশুড়ী নিজের বড়ো ছেলেমেয়েদের একটু সঙ্কোচ করে। তাই মাথায় তার বুড়োটে শুকনো হাতের স্পর্শ অনুভব করে অবাক হয়ে গেল জারিক।

'লোককে ভালো করে তোলা ডাক্তারের কর্তব্য,' শান্তকণ্ঠে বলল বৃদ্ধা। 'তুমি তো জানো সেটা। তাই করো।'

জারিক বুঝল আর্শোর সঙ্গে তার কথাবার্তা শাশুড়ী শুনতে পেয়েছে।

'কিন্তু ও লোকটা থাকে আভানলুতে, ওদের তো নিজেদের ডাক্তার আছে।

ওদের ব্যাপারে আমার হাত দেওয়া চলবে না। এটা অনেকটা কানুনের মতো—লোকে বলে পেশাদারদের নীতি।'

'নীতি বটে!' বলে উঠল বৃদ্ধা। 'জীবন বড়ো সরেস জিনিস বাছা, বিদেয় নেওয়া সুখের কথা নয়। রুগ্ন লোকটি কিছু বোঝেনি। যখন বুঝবে তখন টের পাবে কত বোকামি করেছে। ওকে সত্যি ব্যাপারটা বুঝিয়ে তোমাকে দিতেই হবে!'

কী একটা আবেগের উত্তেজনায় জারিক তার গাল ঘষল শাশুড়ীর হাতে। কিন্তু অযাচিত আদরে যেন চমকে উঠে বৃদ্ধা আস্তে আস্তে জারিককে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

ডিসপেন্সারিতে সকাল-সকাল এসে জারিক ঠিক করল রোগী আসার আগেই জায়গাটা ঝাঁটিয়ে সাফ করতে হবে। যে মেয়েটি সাধারণত সাহায্য করে তাকে মাঠে ফসল তুলতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই একটা বুরুশ দিয়ে জানলার কাচ আর মেঝে ঘষে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল, ওষুধের আলমারিটা গুছিয়ে রাখল, অন্যভাবে সাজাল দেরাজের ভিতরের যন্ত্রপাতি। এবার ডাক্তার বাগ্রাতের ডিসপেন্সারির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তার ডাক্তারখানা!

সযত্নে হাত ধুয়ে কোট আর ক্যাপ পরল জারিক। আর মনমরা লাগছে না। পুরোনো প্রবচনটা সত্যিই ঠিক: "মন অস্থির লাগলে নিজের বাড়িটা গোছাও আগে।"

দরজা খুলে গেল, টোকা না দিয়েই ঢুকল সনা খুড়ি। এবারে মুখে আর হাসি নেই। এখন তো ভদ্রতা করে দেখা করতে আসেনি, তাই গম্ভীর নির্লিপ্ত হওয়া চলে। কিন্তু জারিকও অবস্থা বুঝে চলতে পারে। সনা খুড়ির দিকে দৃষ্টিপাত না করে সে ঝকঝকে যন্ত্রপাতিগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখল—এটা হল একটা সেয়ানা ফিকির। সনা খুড়ির ওপরে এটা যথোচিত কাজ করল, কিছুক্ষণের মধ্যেই জারিকের সমস্ত প্রশ্নের জবাব বিনীতভাবে দিতে লাগল সে। জারিক রক্তচাপ দেখার সময় রবারের বাল্ব আর হাতে বাঁধা ফেটিটায় দারুণ ভয় পেয়ে কানে তালা লাগানো চীৎকার করল সনা খুড়ি কয়েকবার।

কিন্তু একেবারে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের মতো কঠোর মুখে জারিক বাধা দিয়ে ধমকে বলল, 'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়!'

এরপর সনা খুড়ি একেবারে হার মেনে ইঁদুরের মতো শান্তভাবে বসে রইল। রক্তচাপ বেশি বটে, তবে ভয় পাবার মতো নয়।

'তুমি কাজে যেতে পারো,' জানাল জারিক। 'কাজ করলে ভাল হবে।'

কাতরে উঠে সনা খুড়ি বলল, 'ওঃ, আমার যা সাংঘাতিক অসুখ! অসুখের নামটা এক টুকরো কাগজে লিখে দাও ত! সহরে বড়ো ডাক্তারের কাছে হয়ত যেতে হবে।'

'তার দরকার নেই!'

'তবু লিখে দাও।'

তার কথা মেনে নিয়ে রোগের নাম আর রক্তপ্রেস যন্ত্রটায় যা দেখেছে সেটা এক টুকরো কাগজে লিখে দেবার পর শুধু সনা খুড়ি বিদায় নিল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নোটটা খুঁটিয়ে দেখে আর নিজের প্রতি দুঃখে মাথা নাড়ে।

ডিসপেন্সারিতে রোগী দেখার সময় শেষ হলে জারিক গেল কিণ্ডারগার্টেন আর দিবা-নার্সারিতে, তারপর দেখতে গেল শয্যাশায়ী রোগীদের।

ট্রাকটর-চালক আমো বাড়িতে নেই।

'সভাপতি এসেছিল সকালে, আমো তার সঙ্গে গেল,' আমো'র মা জানাল। 'ওকে থাকতে বললাম, তোমার নোটটা দেখালাম সভাপতিকে, কিন্তু কেউ কান দিল না।'

"জলা সাফের সময় লোকটার টিকি দেখা যায় না, অথচ রুগ্ন লোককে বিছানা থেকে টেনে কাজে নিয়ে যাবার বেলায় নিজে হাজির হয়," গ্রামে ফিরে যেতে যেতে ফুঁসতে লাগল জারিক।

এত রেগে গিয়েছিল জারিক যে ঠিক সামনে দীর্ঘ দেহ, একটু কুঁজো সভাপতিকে দেখতে পেয়ে সে ভারিক্কি দেখাবার চেষ্টা না করেই ছুটে গেল তাকে ধরার জন্য।

'গালুস্ত খুড়ো!' ছোটবেলা থেকে এই নামে সে তাকে ডাকে, অন্য কোন যুৎসই সম্বোধন ভেবে বের করতে পারেনি।

'আর কত কাল এভাবে চলবে বলুন তো? জলা সাফের জন্য দলটা পাঠাবেন না? আপনি কি চান আমাদের সমস্ত লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগুক!'

পাহাড়ীসুলভ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সভাপতি, মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে, ঠোঁট চেপে। তার সঙ্গে তাল রেখে যেতে ছুটতে হল জারিককে। সভাপতি নিজের ছোট অফিস-ঘরে না পেঁছিন পর্যন্ত তার কোনো কথার জবাব দিল না।

'জেলা পার্টি কমিটিকে আমি খবর দেব,' সবকিছু যুক্তিতর্ক ফুরিয়ে যাবার পর শেষ পর্যন্ত বলল জারিক।

ডেস্কে ক্যানভাসের ব্রিফ-কেস রেখে গালুস্ত ফিরে তাকাল কঠোর কটা চোখে।

'বেশ তো, দাও,' নরম গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল। 'এক্ষুণি দাও। কিম্বা আমার এই জায়গাটায় বসে ভার নাও ফসল তোলার, শীতকালীন গোয়াল বানানোর, স্কুল বাড়ি মেরামতের, ভার নাও আমাদের উঁচু জায়গার জমিগুলোর, সবকিছুর দায়িত্ব নাও। ডেস্কে বসে কাজ কর।'

লোকটি ক্ষেপে গিয়েছে বুঝল জারিক, কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী সে নয়।

'আপনার হয়ে আপনার কাজ হয়ত করে দিতে পারব, গালুস্ত খুড়ো,' শান্তকণ্ঠে সে বলল। 'কিন্তু আমার কাজ আপনি পারবেন না মনে হয়। মিছিমিছি আমরা সময় নষ্ট করছি।'

'তুমি সবকিছু পারো,' ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে বলল গালুস্ত, 'এমন কি আমার কাজে ব্যাঘাত দিতে পারো। ঘুরে ঘুরে লোককে অসুখের ছুটি দেবার ব্যবস্থা করছো, এ দিকে প্রত্যেকটি লোককে আমার একান্ত দরকার।'

টিউনিকের বুক-পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকটা দোমড়ানো কাগজের টুকরো বের করে ডেস্কে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

'তাতে অন্যায়টা কী শুনি?' আমো'র সার্টিফিকেটটা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল জারিক। 'কাল রাতে লোকটার জ্বর ছিল চল্লিশ ডিগ্রি, আর আপনি ওকে হেঁচড়ে নিয়ে গেলেন ক্ষেতে! ম্যালেরিয়ার আর একপ্রস্ত জ্বরে ও কাল পাহাড়ে বেহুঁস হবে, তখন কী করবেন? আর সবকিছুর মূলে হল জলাটা, যেটা সাফ করতে আপনি চাইছেন না। একে কি রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা বলা চলে?'

তার দিকে পিছন ফিরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল গালুস্ত। দ্বিতীয় নোটটার ভাঁজ ঠিক করল জারিক। আজ সকালে কিছু না ভেবে সনা খুড়িকে দিয়েছিল এটা।

সভাপতির কাছে গেল জারিক।

'সনা খুড়িকে আমি কাজে পাঠাব,' বলল সে। 'আর জলাটা, হেমন্ত কালের মধ্যে ওটা আমাদের সাফ করা চাই।'

'ফসল তোলা পর্যন্ত সবুর কর,' শান্ত কণ্ঠে বলল সভাপতি, এবার কিন্তু ফিসফিসিয়ে নয়। 'তুমি কি ভাবো আমি বুঝি না?' ফিরে জারিকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে। 'কী কাণ্ড দেখ তো? সাকো সারোয়ানের মেয়ে আমাকে শেখাচ্ছে কী করে রাষ্ট্র স্বার্থের তদারক করতে হবে!'

'কেন শেখাব না!' বলে মাথা উঁচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জারিক।

দুপুরের পর আবার আভানলুতে চলল জারিক। এবারে পায়ে হেঁটে: পাহাড়ে রাস্তাটা সরু, মাঝে মাঝে আচমকা নিচে নেমেছে। পাথর থেকে নামতে নামতে ও পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে যেতে যেতে সে চেষ্টা করল তার দুশ্চিন্তাগুলো নিয়ে মাথা না ঘামাতে। ভোলার চেষ্টায় ভাবতে লাগল ছেলেবেলাকার কথা।

সে কি অনেক দিন আগেকার কথা — যখন খালি পায়ে, রোদে-তামাটে শরীরে সে সমানবয়সীদের সঙ্গে এই পথ ধরেই ছুটে যেত নিচের নদীতে? মাঝে মাঝে যেত আরো দূরে — আভানলুর ফল বাগানে। বুড়ো পাহারাদার

আদর করে ওদের খাওয়াত গন্ধ ভুরভুর ছোট্ট ফুটি — সেগুলোর নাম 'শামাম,' আর লতা থেকে সবে ছাঁটা ঠাণ্ডা আঙুরের গোছা। এ তো বেশি দিনের কথা নয়, আর আজ সে ডাক্তার, তার বাচ্চা আছে, জীবনের প্রথম অর্ধেকটা হয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে এরিমধ্যে। যদি মারা যায়, মারা যায় এই মুহূর্তে? কী ভয়ঙ্কর সে কথাটা, মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব! ইয়েগিশে খুড়োর অবশ্য বয়স হয়েছে, কিন্তু তারো কাছে কথাটা সমান ভয়ঙ্কর আর অগ্রহণীয়। যদি তার রোগটা সারানো যায়, অন্তত পক্ষে আয়ু আরো কয়েক বছর বাড়ানো যায় — সে চেষ্টা না করাটা কি অপরাধ নয়? কিন্তু বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ — তাকে নিয়ে কী করা যায়? ডাক্তার বাগ্রাত তার জন্য অনেক করেছে, তাকে সাহায্য করতে কখনো ইতস্তত করে না। আভানলুতে সে যাচ্ছে কেন? হয়ত বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল ...

কিন্তু থামতে সে পারে না। সর্পিল পথে, খাড়া জায়গায় উদ্যত পাথর আঁকড়ে সে চলল, এ সব জায়গার লোকেদের মতোই খরা রোদে তার কোনো হুঁশ নেই। হঠাৎ পথটা মোড় নিল, সামনে প্রসারিত চওড়া সড়ক। পথচলতি প্রথম গাড়ি তাকে তুলে নিয়ে পেঁৗছিয়ে দিল আভানলুতে।

পোষাকে অনেক ভাঁজ-পড়া জারিককে দেখাচ্ছে কিশোরীর মতো। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের ছিমছাম, গালিচা-টাঙানো ঘরে যখন সে ঢুকল তখন ডাক্তার একটা বই নিয়ে ব্যস্ত।

তার হঠাৎ আবির্ভাবে অবাক হল না ডাক্তার। সে কিছুতে অবাক হয় না।

বই থেকে চোখ তুলে সে বলল, 'যাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। পাঁকাটির মতো রোগা, সর্বাঙ্গে ধুলো — দেখলে খারাপ লাগে ...'

কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছে যে তার সেটা বোঝা গেল। বই বগলে মুখ ধোবার কলে সে গেল জারিকের সঙ্গে।

'এখানে কী লিখেছে দেখ — যমের দাড়ি চেপে ধরেছে একেবারে — টিবি'র বিষয়ে নতুন জিনিস!'

'সেটা তো চমৎকার ব্যাপার,' বলে উঠল জারিক। মুখ ধুয়ে লম্বা বিনুনি তখন সে মাথার চারদিকে জড়াচ্ছে।

'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু লেখা, যা ইচ্ছে লেখা যায়।'

'বেশ, কিন্তু আপনি নিজে তো নতুন সব ওষুধ ব্যবহার করেন, করেন না?'

'অবশ্য করি। তুমি কি ভাবো আমি কূপ-মণ্ডূক?'

'ক্যান্সারের বিষয়ে নতুন কিছু লিখেছে?' তার আসার উদ্দেশ্যের কাছে বিষয়বস্তুটা নিয়ে যাবার চেষ্টায় জিজ্ঞেস করল জারিক।

'কাজের মতো এমন কিছু লেখেনি, অন্তত আমার তাই ধারণা। ক্যান্সার চিকিৎসার একমাত্র উপায় হল ছুরি চালানো, আরো ভেতরে, আরো বেশি করে ছুরি ঢোকানো।'

'আমারো তাই মনে হয়,' তাড়াতাড়ি সায় দিল জারিক। 'এই ধরুন, ইয়েগিশে খুড়ো। ওর বয়স এত বেশি বা শরীর এত দুর্বল নয় যে অপারেসনে ফল হবে না। হয়ত বেঁচে উঠবে ...'

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর গলার সুর বদলে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ বলল:

'এই জন্যই বুঝি তোমার আসা? আমার ব্যাপারে নাক গলিও না, জারিক!'

'নাক গলাতেই হবে, না গলিয়ে উপায় নেই!'

বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হালকাভাবে আঙুল রেখে জারিক বলল, 'মনে আছে বুড়ী জলোর মরার কথাটা? নব্বই বছরের বুড়ী, বাঁচতে চায়নি, কিন্তু একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আপনি ঠায় বসে রইলেন, অক্সিজেন দিলেন। যতক্ষণ বাঁচানো যায় তার চেষ্টা করলেন। কেন করেছিলেন?'

'অন্য ডাক্তাররা যা করত আমি তাই করি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ, 'ওটা আমার কর্তব্য।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল জারিক। 'আর তিন মাস, বড়ো জোর, ছ মাস পরে আপনাকে যেতে হবে ইয়েগিশে খুড়োর মৃত্যু শয্যায়। যাতে ঘণ্টা খানেকও

বাঁচে তার জন্য কর্পূরের ইনজেকসন দেবেন। আর আপনার মনে শান্তির অভাব হবে না — কর্তব্য পালন তো করেছেন!'

শেষের কথাগুলো বলা উচিত হয়নি জারিকের। আহত বোধ করল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। মনে হল কথাগুলোয় এমন কি ঠাট্টার একটা খোঁচা আছে। একরত্তি মেয়েটার সাহস দেখ, ওর চেয়ে কত উঁচু স্তরের লোক, তার সমালোচনা করছে!

'আমাকে বক্তিমে দিতে হবে না!'

'বক্তিমা দিচ্ছি না,' জারিকের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা। 'আমি চাই আপনি বুড়োকে বুঝিয়ে অপারেসনে রাজী করান। এটা আপনি সহজেই পারেন।'

'কী বাজে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ। 'বাচ্চার মতো বুদ্ধি!'

'বেশ, তাহলে আমিই ওর কাছে যাব,' বলল জারিক।

'সেটা যে ভালো দেখাবে না তোমার মনে হয়নি?'

'মনে হয়েছে,' উত্তরে বলল জারিক। 'মনে হয়েছে বইকি। এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু আপনি সঙ্গে এলে ব্যাপারটা অন্য রকম হবে।'

'শয়তান জানে কী ব্যাপার,' দ্রুতভাবে হলের স্ট্যান্ডে গিয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ এক ঝটকায় নিজের ক্যাপটা টেনে নিল।

জারিক দ্রুত পায়ে তার পিছু পিছু বাইরে গেল। ছোট হলে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ডাক্তার বাগ্রাতের মা, যা কানে গিয়েছে তাতে তার চক্ষু বিস্ফারিত। এই প্রথম তার মুখে হাসি নেই, নেই আদরের ভাব, সে মুখ চেনা যায় না। জারিককে অভ্যর্থনা সে করল না। ছেলের দিকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টিতে কঠোরতা ও অভিযোগ।

জারিক ও বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ চুপচাপ রাস্তা হয়ে চলল। কোনো কথা না বলে দুজনে থামল ভার্তান আরুৎসিয়ানের দোরগোড়ায়। জারিক দরজায় ধাক্কা দেবার সময় বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইল অন্য দিকে।

ইয়েগিশে খুড়োর ছেলে ভার্তান যুদ্ধে ছিল, ইউরোপে সে অনেক ঘুরেছে। নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশায় সে অভ্যস্ত, তাই এভাবে দুজন ডাক্তারের আগমনে সে বিস্মিত বা উৎকণ্ঠিত বোধ করল না। কিন্তু তার স্ত্রী লুসিক তৎক্ষণাৎ আঁচ করে নিল যে কিছু একটা গড়বড় ঘটেছে। ব্যস্ত হয়ে সশব্দে সে টেবিলে ঢাকনা পাতল, খাবার সাজিয়ে রাখল। তারপর চট করে একবার পাশের ঘরে গিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে ফিসফিসিয়ে পরামর্শ করে নিল তাড়াতাড়ি।

টেবিলের পাশে বসে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের দিকে চেয়ে রয়েছে জারিক। ডাক্তারের সুশ্রী মুখে অসন্তোষ ও বিদ্বেষের ভাব লেগে আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছে, দেখে মনে হল কোনো কিছু বলার এতটুকু অভিলাষ তার নেই। ভার্তানের আরো কাছে সরে কথা বলতে শুরু করল জারিক। ঠিক যা ভেবেছিল তাই — ইয়েগিশে খুড়ো রোগের কথা বাড়ির কাউকে বলেনি।

ভার্তানের মুখ কালো হয়ে উঠল। উদ্দেশ্যহীন এলোমেলোভাবে টেবিল-ঢাকনায় সে হাত বোলাতে লাগল কালো বড়ো হাতে, ছুরিটা তুলে আবার ফেলে দিল, এদিক-ওদিক সরাতে লাগল প্লেট আর গেলাস।

'বাবা কি মারা যাবেন?' হঠাৎ ভেঙে-যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, যদি না অপারেসন করা হয়,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জারিক।

ভার্তান ফিরে তাকাল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নাড়ল ডাক্তার।

ভারি পায়ে ঘরে ঢুকল ভার্তানের মা। বৃদ্ধা দেখতে ভালো, মুখটায় স্পষ্ট একটা ভাব আর মমতায় ভরা। মর্যাদার সঙ্গে অভিবাদন করে টেবিলের পাশে বসে সে ডাক্তারদের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

'মা, বাবা কেমন আছেন?' অস্বস্তিভরে জিজ্ঞেস করল ভার্তান। 'আজকে তাঁকে দেখিনি।'

'মন্দ নয়। দেখে মনে হয় একটু ভালো আছেন। বাগানে গিয়েছেন। আমাকে একটা ওমলেট করতে বললেন, কিছুটা খেয়েছেন।'

বৃদ্ধা ধীরে সুস্থে কথা বলছে, কিন্তু বলার ধরনে প্রত্যাশার, চাপা আশঙ্কার একটা ভাব।

ভার্তান বলল, 'চলুন, আমরা বাবার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

গম্ভীরভাবে অভিবাদন জানাল ইয়েগিশে খুড়ো, কিন্তু আনন্দের আভাস মিলিয়ে গেছে তার মুখ থেকে। তাকিয়া লাগান উঁচু একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল সে। সামনে ছোট্ট একটা টেবিল, তাতে ঠাণ্ডা হয়ে-যাওয়া ওমলেট, মধু মেশানো মাখন আর কয়েকটা সুস্বাদু চাপাটি। পুষ্টিকর ভালো খাবার খেয়ে রোগটা সারাবার আশা তার। সরল ফিকিরটা বুঝতে পেরে বৃদ্ধের জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করল জারিক।

ফৌজে থেকে ভার্তান শিখেছিল দৃঢ় ও খোলাখুলি হতে।

'বাবা, শুনুন, ডাক্তাররা বলছেন আপনার অপারেসন দরকার। কাল আপনাকে সহরে নিয়ে যাব।'

বিরক্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ।

'ওখানে আমার কিছু করার নেই।'

'ডাক্তাররা বলছেন চিকিৎসা না করলেই নয়।' ভার্তানের ধরনটা চটপটে, হালকা, যেন সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনাটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাতে এত ক্লিষ্ট লাগল জারিকের যে মনে হল কিছু একটা বলে স্তব্ধতাটা ভাঙা দরকার। কিন্তু সে মুহূর্তে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ সামনে পা বাড়াল। একটা চেয়ার ঠেলে বৃদ্ধের দিকে সরিয়ে তাতে বসে, হাঁটুতে হাত রেখে, কথা বলতে শুরু করল সে। স্পষ্ট ও সহজভাবে ইয়েগিশে খুড়োকে বুঝিয়ে দিল তার কী হয়েছে। রঙ না চড়িয়ে বা বিপদের দিকটা অবহেলা না করে রোগের গতি সে বর্ণনা করল — ছোট্ট একটা টিউমর হওয়া থেকে শুরু করে টিসুর ধ্বংস প্রাপ্তি পর্যন্ত।

'সহরে যাবার জন্য তোড়াজোড় করুন, দোস্ত, আমরা সবাই তো বাঁচতে চাই!' দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সে।

"কাজটা সেরেছে চমৎকার ভাবে!" মনে মনে তারিফ করল জারিক। "আমি হলে এত ভালোভাবে পারতাম না।"

পুঁতিগুলো আস্তে আস্তে ঘোরাতে ঘোরাতে বসে রইল ইয়েগিশে খুড়ো। এবার কথা বলল তার গৃহিণী।

'ভার্তান!'

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সামনে দাঁড়াল তার ছেলে।

'সভাপতিকে গিয়ে বল কাল সকালে গাড়ি চাই। লুসিক, "লাভাশের" জন্য ময়দার তাল বেল তো।'

নির্দেশগুলো শান্তভাবে দিল বৃদ্ধা, কিন্তু কপালে দুঃখের একটা নতুন রেখা চোখে পড়ল জারিকের।

উসখুস করে, কাতরে, উঠে বসল ইয়েগিশে খুড়ো। তার কাঁধে হাত রেখে স্ত্রী বলল, 'আমরা যাব, ইয়েগিশে। যেতেই হবে — তুমি জানো।'

ম্লান হাসি হেসে তার দিকে তাকাল ইয়েগিশে খুড়ো।

'বেশ, আচ্ছা... যেতেই যখন হবে, আমার কী আপত্তি?..'

বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের কাছে গিয়ে বৃদ্ধা বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তার, আমরা সবাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!'

অল্প মাথা নাড়াল বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ।

'ওঁর যত্ন নেবেন এখন। বিশেষ করে অপারেসনের পর।'

জারিক ও বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ আবার পাশাপাশি চলল। আগেকার মতোই দুজনে চুপচাপ। অত্যন্ত ক্লান্ত জারিক তিক্তভাবে ভাবল ডিসপেন্সারির পাশের সেই আরামি ছোট্ট বাড়িতে আগেকার মতো আর তার আদর আপ্যায়ন মিলবে না। ঠিক সামনে, যেখানে পথটা দু ভাগ হয়ে গিয়েছে সেখানে তাদের গন্তব্য আলাদা হয়ে যাবে। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ মোড়

ঘুরে যাবে নিজের বাড়িতে, আর সে যাবে সড়ক হয়ে, পথচলতি কোনো গাড়িতে যদি তাকে তুলে নেয় সেই আশায়। কিন্তু জারিকের মনটা হালকা — নিজের কর্তব্য সে পালন করেছে।

যেখানে পথটা দু ভাগ হয়ে গিয়েছে সেখানে দেখা দিল কয়েকজন লোক — তাদের মধ্যে আছে আভানলু খামারের পার্টি সচিব। জারিক ও বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে দেখে হাত তুলে তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। মোড় নিতে গিয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ থমকে দাঁড়াল। জারিকের মনে হল পার্টি সচিব তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য হাত নাড়েনি। বাগ্রাত সের্গেয়েভিচকে বিদায় জানাবার জন্য সে থামল।

কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখ, বেঁটেখাটো পার্টি সচিব বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের দিকে সসম্মানে মাথা নাড়িয়ে জারিককেই সম্বোধন করল:

'চটবেন না, ডাক্তার। শেষবার আমাদের যখন দেখা হয় তখন যা বলেছি তার জন্য আমি দুঃখিত। কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। আমরা ঠিক করেছি আপনারা যখন ফসল তুলছেন তখন আমরা জলা সাফ করতে যাব। আমাদের লোকেরা যত সময় কাজ করবে তার একটা হিসেব রাখা হবে, পরে আপনাদের লোকেরা ঠিক তত সময় কাজ করবে। ব্যাপারটা তাহলে ন্যায্য হবে।'

'আমরা জারেভশানকে চ্যালেঞ্জ করছি,' দাঁত বের করে হেসে বলল একটি ছোকরা; তার মাথায় ককেশাসের হালকা-লোম একটা টুপি।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' সাগ্রহে বলে উঠল জারিক। 'কথাটা বেশ! জারেভশান আপনাদের পথে বসাবে না। আমরা একটা ট্রাকটরও পাব।'

সবাই কথা বলতে শুরু করল একসঙ্গে। অসময়ে থেমে পড়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচের মনে হল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা তার পক্ষে হাস্যকর, সবায়ের আগ্রহ উৎসাহের বাইরে সে।

'দেখ, গেরাসিম,' কী বলবে অতি কষ্টে ভেবে সে বলল, 'সে দিন

তোমার বউ বড়িগুলো চাইছিল। ওকে বোলো আমি তৈরি করে রেখেছি ওগুলো।'

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাতটা নিজের বুকে ছোঁয়াল পার্টি সচিব, আর বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ শেষ কথাটা বলতে পেরে ধীরে সুস্থে চলে গেল।

"ওতে আমার কিছু এসে যায় না," ভাবল জারিক। "আমার জাঁক নেই, ডাক্তার বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ, আপনার কাছে আমি আবার আসব।"

সে যে তাকিয়ে আছে তা যেন টের পেয়ে বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ ঘুরে দাঁড়াল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে নাটকীয় একটা ভঙ্গীতে টুপিটা তুলল।

জারিক তার দিকে তাকাল গম্ভীর ও চিন্তান্বিতভাবে। না, বাগ্রাত সের্গেয়েভিচ, আপনি ভুল করছেন, আপনার এই অহংভাব যুৎসই হয়নি, একেবারে হয়নি!

টুপিটা তাড়াতাড়ি কান পর্যন্ত নামিয়ে ডাক্তার বাগ্রাত গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়ল।

পাতলা লোমের টুপি-পরা লোকটি বলল, 'আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, জারিক। আমাদের দল জলায় যাচ্ছে। আপনাকে গাড়িতে তুলে নেব। ড্রাইভারের সঙ্গে যেতে পারেন।' চোখ হাতের আড়ালে রেখে আকাশে তাকিয়ে বলল, 'আজ আরো ঘণ্টা তিনেক কাজ করা যেতে পারে।'

সায় দিয়ে বলল পার্টি সচিব, 'হ্যাঁ। আজকাল তো দিনগুলো বড়ো ...'

আর গাঁয়ের চওড়া, রোদে-ভরা রাস্তা হয়ে জারিক চলল ওদের সঙ্গে।

আকাকি বেলিয়াশভিলি

তুষারচূড়া ও কাঠফাটা রোদের দেশ, প্রাচীন ও চিরনবীন জর্জিয়া কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত।

সুরা, ফল আর চায়ের জন্য প্রসিদ্ধ এ দেশের লোকজন হাসিখুসি আর বিজ্ঞ।

জর্জীয় জনগণের প্রতিভার প্রতীক শতা রুসতাভেলির জন্মভূমি বিশেষ গুণে ধনী।

সুপরিচিত জর্জীয় লেখক আকাকি বেলিয়াশভিলি (জন্ম ১৯০৩) রেখাচিত্র ও ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন সতেরো বছর বয়সে। তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প সংগ্রহে বর্ণিত হয়েছে প্রাক-বিপ্লব ও আধুনিক জর্জিয়া।

কয়েকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস "বেসিকি", আঠারো শতকের প্রখ্যাত জর্জীয় কবি ও নাগরিক ভিস্‌সারিওন গাবাশভিলির জীবন কাহিনী এটি। তাঁর ছদ্মনাম ছিল "বেসিকি"।

অন্যান্য সুপরিচিত উপন্যাস হল আঠারো শতকের জর্জিয়ার বিষয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস "সোনালি তাঁবু", আজকের ধাতুকর্মীদের নিয়ে লেখা "রুস্তাভি" এবং মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ নিয়ে "সন্ধিক্ষণ"।

আকাকি বেলিয়াশভিলির প্রখর ব্যঙ্গবোধ বিশেষভাবে ধরা পড়ে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে।

অদৃষ্টের পরিহাস

মেঠো পথে অন্যমনস্কভাবে চলেছে কারামান মুখেইজে, নানা চিন্তার ভিড় তার মাথায়। রাস্তাটা তার নখদর্পণে, প্রতিটি আঁটঘাট। চালি থেকে পিৎসুন্দা আর লাতফার থেকে উৎভিরি পর্যন্ত রাস্তায় এমন কোনো পথ নেই যাতে সে একবার না একবার চোরাই ঘোড়া নিয়ে যায়নি। পুরনো খাসা সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়াতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। সারা মুলুকে তার মতো ঘোড়াচোর আর ছিল না! তার তুলনায় মাৎসি খ্ভিতিয়া* নগণ্য। খাস শয়তানও কারামান মুখেইজে'র মতো ধূর্তভাবে ঘোড়া লুকোতে পারে না! ঘোড়া হারিয়ে গেল, পাত্তা আর মিলল না — সবাই বুঝত এটা কারামানের কারসাজি। কিন্তু করবার কিছু তাদের ছিল না, কারামান মুখেইজে'র বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার মুরোদ কার?

সত্যি, কারামানের পক্ষে দিনগুলো ছিল খাসা, নেচে কুঁদে বেড়াবার দিন!

এখন ওরা ঘোড়া গণনার একটা ব্যবস্থা চালু করেছে। টাকার শ্রাদ্ধ! টাকাটা পেলে কারামান বড় লোক বনে যেত। গণনার বালাই না করে আশেপাশের অনেক দূরের প্রতিটি ঘোড়ার কথা বলে দিতে পারত সে — কার কত বয়স, কী রং, কী ছাপ গায়ে। প্রত্যেকের বংশাবলী, ক'বার

---

* মাৎসি খ্ভিতিয়া — আন্তন পুরৎসেলাজে লিখিত এই নামের উপন্যাসের বিখ্যাত ঘোড়াচোর।

ঘুড়ীগুলো বাচ্চা দিয়েছে, সব তার জানা। এমন কি কারা বাচ্চা দেবে সেটা পর্যন্ত। যা কিছু জানার আছে সব তার নখদর্পণে!

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল কারামান। সময় বদলেছে! পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে বছর দশেক হল। জোর কদমের ঘোড়া তো দূরের কথা, জিরজিরে কোনো ঘোড়াতে হাত দেবার উপায় নেই এখন। তখন ঘোড়া হাতানো আর হাতানোর সমস্ত চিহ্ন ঢেকে রাখা ছিল সহজ ব্যাপার — এখন চেষ্টা করে দেখুক দিকি! বলশেভিকরা বড়ো ভারিক্কি লোক, তাদের ব্যবস্থাপনা অন্য ধরনের। এখন কারামানের কাছে পড়ে আছে শুধু মধুর স্মৃতি। তার ব্যবসার ধ্বজা ছিন্নভিন্ন।

এ ধরনের চিন্তায় মশগুল হয়ে কারামান ভারি পায়ে চলেছে। নাবার্‌দেভ পাহাড়ের মাথা পেরোচ্ছে এমন সময় বনের ধারে চোখে পড়ল একটা অশ্বতর, ডিমের মতো সুডৌল আর মসৃণ।

অভ্যাসবশে চট করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কারামান। কেউ নেই। তারপর ভালো করে তাকাল জানোয়ারটার দিকে।

ওটার তাকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঘাস ছিঁড়ে চলেছে।

কাছে এসে পাছায় হাত বুলিয়ে পা দুটো পরীক্ষা করে দেখে কারামান তারিফের চোটে পিছিয়ে গেল এক পা।

“ওরে বাবা! কী নিরীহ বুদ্ধিমান জীব!” মনে মনে বলে উঠল কারামান। “কী চকচকে আর হৃষ্টপুষ্ট! তাছাড়া কাঁচা বয়স। অবশ্য খচ্চরের বয়সে কিছু এসে যায় না, তবু ...”

জন্তুটা তখন লেজের ঝাপটে মাছি তাড়িয়ে ঠিক ভেড়ার মতো শান্তভাবে ঘাস চিবোতে ব্যস্ত। আর একবার চারদিক দেখে নিল কারামান। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। চুরির জন্য নিজেকে এগিয়ে দিয়েছে এমন একটা জানোয়ার আগে সে দেখেছে বলে মনে হল না।

কথাটা ঝিলিক দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ঘোড়াচুরির সেই পুরনো আবেগ যেটা দশ বছর তাকে বিচলিত করেনি।

"হতচ্ছাড়া খচ্চরটাকে নেকড়েরা খায় না কেন! কেন বেটা আমার পেছনে লেগেছে! আমাকে দিয়ে চুরি করাতে চায়? কী করি? বুকটা দুমড়ে দিচ্ছে একেবারে। ওটাকে ছেড়ে চলে যাব? কিন্তু তাহলে আজ রাতেই বুক ফেটে যাবে! দশটা বছর কোনো জানোয়ার চুরি করিনি, সৎ হয়ে গিয়েছি ভেবে সবাই আমাকে সমীহ করে। আর এটার জন্য মুখে চুন কালি দেব! না! থাক বেটা এখানে, খুনে কোথাকার!"

কারামান রাস্তায় ফিরে গেল। জন্তুটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোচ্ছে। পাঁচ পা ফেলার আগেই কিন্তু কারামানের হাঁটু দুমড়ে যাবার জোগাড়, ঘুরে আবার জন্তুটার মুখোমুখি হল সে।

'বেটা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে কোথাকার! আর কেউ একটা এসে পড়লে বাঁচি!' অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাল কারামান। 'তাহলে আমার মনটা স্থির হয়। বসে কিছুক্ষণ দেখি। হয়ত কেউ এসে পড়বে।'

বসে ঘাম মুছে সিগারেট ধরাল সে। কিন্তু কপাল খারাপ, রাস্তায় কারোর দেখা নেই। জানোয়ারটা ঘাস খেয়ে চলেছে। দু একবার সামনের পা বাড়িয়ে নাকটা ঘষে নেওয়া হল। ফিরে দেখল কারামানকে, যেন এই প্রথম নজরে পড়েছে। তারপর আবার ধীরে সুস্থে ঘাস চিবোতে লাগল।

'বেটার ধর্মভয় বলে কিছু নেই!' ফেটে পড়ল কারামান। 'ভিখিরির মতো বসে দূর থেকে তোকে দেখছি বলে মস্করা করা হচ্ছে? আমাকে নিয়ে মস্করা করতে দিলে সারা দুনিয়ায় আমার বদনাম রটবে। বেটা দেখছি আমাকে দিয়ে চুরি করাবেই। দোষটা ওর, আমার নয়।'

তড়াক করে উঠে কারামান কয়েকটা পাতলা ডাল কেটে পাকিয়ে দড়ি গোছের করল, সেটা এবং নিজের বেল্ট দিয়ে লাগাম গোছের একটা জিনিস দাঁড়াল। তারপর সেটা নিয়ে গেল জানোয়ারটার কাছে।

ঘাস চিবোনো বন্ধ করল না সে।

'পালা বেটা! দেখছিস না আমার হাতে লাগাম! পালা বলছি! পালাবি

না? বেশ, তাহলে আর কী! আহা মরি, বাছাকে দেখ একবার! লাগামটা পড়ালে মাথাটা অন্তত একবার ঝাঁকা! এত ভালোমানুষ হওয়া ভালো নয়! সেটা অবশ্য তোর ব্যাপার! বেশ, তোর যা মর্জি! চল, তাহলে!'

নিমেষের মধ্যে কারামান জন্তুটার পিঠে চেপে চলল বনের মধ্যে।

"আহা, কী দারুণ জানোয়ার! কী নধর! দাম হবে অন্তত পাঁচ হাজার। টাকাটা বলতে গেলে পকেটস্থ। জীবনে এমন ভালোমানুষ দেখিনি। আর চলার ভঙ্গিটা দেখ দিকি! আর কী চকচকে! বেটার জন্য অবশ্য পাপী হতে হল, কিন্তু এরকম একটা খাসা জিনিসের জন্য পাপ করাটাও পাপ নয়।"

প্রত্যেকবার ঘোড়া চুরি করে যে সমস্যায় কারামান পড়েছে সেটা হল কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব নিয়মকানুন আছে: যদি আবখাজিয়ায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে যাবে বিপরীত দিকে, যেন যাচ্ছে কাখেতিয়ায়। যদি রাচে'তে বেচবার মতলব থাকে তাহলে ভান করবে বাগদাদিতে যাচ্ছে।

এবারও তাই করল কারামান। সটান রাস্তার দিকে না গিয়ে গেল বনের পথে; ঠেকে তার শেখা যে পাশ পথ অনেক নিরাপদ, তাতে গন্তব্যে যতটা তাড়াতাড়ি পেঁছিনো যায় ততটা হয় না সড়কে। যে পথটা ধরল সেটা তার খুব চেনা। পথটা একটা কাঁটা ঝোপ পেরিয়ে, বহুদিন পরিত্যক্ত একটা শীতের রাস্তা ছেড়ে নেমেছে দ্জেভরভ ব্রিজে। আসল কথা হল ব্রিজটা পার হওয়া। পার হলে নিশ্চিন্তি।

চুরির পরিকল্পনা আগে থেকে করলে কারামানের মন ধীরস্থির থাকত, কেননা পালিয়ে যাবার পথ নিয়ে তখন মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় জানোয়ার পাকড়ালে প্রথমে জানা দরকার সেটা কার, তাহলে কোন দিক দিয়ে ওটার খোঁজে লোক আসবে বোঝা যায়। মালিক কে জানা না থাকলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

তাই বন হয়ে যেতে যেতে কারামান ভেবে বের করার চেষ্টা করল জন্তুটার মালিক কে হতে পারে।

একটা ব্যক্তিগত সওয়াল দিয়ে সে শুরু করল: 'তুই কার? জবাব দে। কালা নাকি তুই! তোকে কে খাইয়েছে, জল দিয়েছে? তোর আস্তাবল কোথায়? নাঃ, মুখে রা পর্যন্ত কাটছে না দেখছি। গায়ে তো কোনো ছাপ দেখছি না, জানার উপায় নেই ... দেখছি দশ বছরের আলসেমিতে ঘুণ ধরেছে আমার। কার হতে পারিস তুই? হেঁয়ালি বটে!.. দাঁড়া, দাঁড়া! ধরে ফেলেছি মনে হচ্ছে! বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো কিছু আছে দেখছি। তোকে চিনেছি, দোস্ত! তুই হচ্ছিস আমব্রাসি পাদরীর খচ্চর! পাদরী বেশ গুছিয়ে নিয়েছে দেখছি; তাই না? এরকম একটা মাল বাগিয়েছে! দেড়ে শয়তানটা তাহলে নিজের পেশা ছাড়েনি। সময় বদলেছে, কিন্তু তাতে ওর কী? এ মুলুকের সব পাদরী লম্বা চুল কেটে ফেলেছে অনেক দিন, কিন্তু আমব্রাসি ঠাকুর কাটেনি, বেটা নাস্তিক! আজকালকার দিনে খচ্চর নিয়ে ওর ফয়দাটা কী? গির্জেয় বিয়ে হয় না, নামকরণ হয় না, পুজোর যেতে হয় না, তবু তোকে ছাড়বে না, আগেকার দিনের হোমরা-চোমরা লোক যেমন কখনো নিজের ছোরা হাতছাড়া করত না। তোকে দেখে তো যে-কেউ বলতে পারে তুই একদম বেকার, চেহারাটা তো দেখছি রাজকুমার সেরেতেলির বিধবা বউয়ের মতো নধর!'

এইসব চিন্তায় মগ্ন হয়ে কারামান পাহাড়ের বন-ছাওয়া ঢালু বেয়ে নেমে পেঁছিল প্রনা নদীর তীরে। জানোয়ারটা বেশ কদমে পা চালিয়েছে, যেন পিঠে কাউকে চাপিয়ে বেশ খুসি। কারামানের পুলক দেখে কে!

'কী সুন্দর জন্তু! জীবনে তোর মতো খচ্চর হাতে পড়েনি। ট্রেনের মতো? না, ট্রেন নয়। মোটরগাড়ি? না, তাও নয়। ও সবের সঙ্গে তোর তুলনা করা মানে তোকে হেনস্থ করা। তুই হচ্ছিস একটা হাওয়াই-জাহাজ, ঠিক তাই, হাওয়াই-জাহাজ! তুই তো কদমে পা ফেলিস না, উড়ে যাস! তুই চুরির মাল না হলে তোকে কখনো ছাড়তাম না, দুনিয়ার কোনো কিছুর বদলে ছাড়তাম না!'

ঝোপঝাড় এত সুকৌশলে ঠেলে, লেয়ানার মধ্য দিয়ে এত হালকাভাবে ভেসে জন্তুটা এত উৎসাহে চলতে লাগল যে গতিবেগ কমল না মুহূর্তের জন্য।

'বেটা নির্লজ্জ, তোকে বেচতে গিয়ে যে কেঁদে ফেলব তাতে তোর সরম হচ্ছে না? দাড়িওয়ালা একটা মানুষ কেঁদে ফেলবে দেখে লোকে বলবে কী? তোর সরম হচ্ছে না? না?'

দ্‌জেভরভ ব্রিজে পথটা শেষ হল। ব্রিজ পেরোলে কারামানের পিছু ধাওয়া কেউ করবে না, কেননা ওখান থেকে চতুর্দিকে রাস্তা গিয়েছে, কোন রাস্তা সে নিয়েছে তা কেউ জানতে পারবে না।

বেশ ভরসা নিয়ে ব্রিজ পর্যন্ত গেল কারামান, ওপারে গিয়ে কখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু হঠাৎ ওর হাওয়াই-জাহাজের মতো অশ্বতর থেমে গেল।

'কী হল? ক্লান্ত বুঝি?' স্তোক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কারামান। 'এই তো ব্রিজটা শুধু পার হব, তারপর তুই জিরিয়ে নিস। ওখানকার ঘাস এত মিষ্টি যে আমারো মুখে বেশ রুচবে মনে হচ্ছে।'

হালকাভাবে গাছের ডালটা তুলল সে। তার কোনো সন্দেহ নেই যে কয়েক মুহূর্ত পরেই ওপারে পেঁাছিয়ে যাবে, পেঁাছবে গভীর বনে তীক্ষ্ণ সব দৃষ্টির আড়ালে।

একচুল নড়ল না জানোয়ারটা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কারামান।

'ওহে, থেমে যাবার মানেটা কী শুনি? ও, বুঝেছি! একটু ইয়ার্কি করা হচ্ছে! কিন্তু দোহাই বাপু, ওটি করিস না, তোর মায়ের দিব্যি! ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় নয় এটা। কেউ হয়ত এসে পড়বে এখ্‌খুনি। চল্‌, সাঁকোটা পার হই, চল!'

এমন কি কান পর্যন্ত নাড়াল না জন্তুটা। সামনের পা দুটো ব্রিজের পাটাতনে রাখল। এখান থেকে নড়ার মতলব যে নেই সেটা স্পষ্ট।

'অনেক হয়েছে! খোলামেলা জায়গায় আমাকে চেঁচাতে হবে নাকি? তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? সারা পথ তোর তারিফ করেছি, করিনি?' জুতোর ডগায় জন্তুটাকে হালকা সুড়সুড়ি দিয়ে, স্তোক দিতে দিতে বলল কারামান।

লেজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জন্তুটা।

'হয়েছে! চল! ভাবিস না আমি চটতে পারি না!' এবার গলা উঁচিয়ে বলল কারামান। 'যদি আমাকে ভালোবাসিস তো চটাস না বলছি! চল!'

কিন্তু জন্তুটা নাছোড়বান্দা হবে বলে ঠিক করেছে। কানদুটো নড়িয়ে লেজটা আরো জোরে ঝাঁকাল সে।

'তুই চাস বুঝি এখানেই রাত কাটাই? কানদুটো মোড়া হয়েছে দেখছি। নিজেকে কী ভাবিস বল তো? শোন, আমি একবার রাজকুমার সুলুকিজের ঘোড়াকে চাবকেছিলাম! চল বেটা, যা বলছি কর!'

ধৈর্য হারিয়ে কারামান গাছের ডাল দিয়ে জন্তুটাকে বেশ জোরে এক ঘা বসাল।

রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে আরো জোরে পাটাতনে পা ঠেসে দাঁড়াল।

'বেটা বেইমান! তোর সঙ্গে রাগারাগির ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুই বাঁধাচ্ছিস সেটা। চল বলছি! নইলে এমন একটা পেঁদানি খাবি যা আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুরও যেন কখনো খেতে না হয়! তবে রে?'

মিনিট দশেক কারামান সপাসপ মেরে চলল জন্তুটাকে, কিন্তু তাতে জানোয়ারটা আরো একরোখা হয়ে একচুল নড়ল না।

কারামান একটু জিরিয়ে নিল। চাবকে কিছু লাভ হবে না জেনে আবার মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা করল সে।

'দেখ, আমার দশাটা দেখ। তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? আমার গর্ব আছে আর তুই দুনিয়ার সামনে আমাকে অপদস্থ করছিস! আয়, ব্রিজটা পার হই! ডরাবার কিস্সু নেই। পড়বি না। আচ্ছা, আমিই প্রথমে যাচ্ছি,

যদি তাই চাস তুই। ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রাক চলে আর তোর ভার সইতে পারবে না এটা?'

জন্তুটার পিঠ থেকে নেমে যেমন-তেমন সেই লাগামটায় টান দিতে লাগল কারামান। একবার ধমকায়, একবার মিষ্টি কথা বলে। কোনো লাভ নেই। নড়ল না জন্তুটা।

মেজাজ চড়ে গেল কারামানের। ভীষণ চোখ পাকিয়ে সে তাকাল তার দিকে, লড়িয়ে মোরগের মতো।

'তুই ভাবছিস আমি লম্বা-চুলো পুরুতঠাকুর, লোক হাসাবি? তোকে ব্রিজ পার না করাতে পারলে আমার নাম কারামান মুখেইজে নয়। আমাকে এখনো চিনিসনি দেখছি।'

চারদিকে তাকাতে একটা শক্ত লাঠি নজরে পড়ল রাস্তার মাঝখানে, ঝট করে সেটা তুলে নিল কারামান। সে যাতে পিঠে না চাপতে পারে তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করল জানোয়ারটা। পা ছুঁড়ে শুরু করল লাফাতে। কিন্তু এ ধরনের ছেলেমানুষী ফিকিরে ঘাবড়াবার পাত্র নয় কারামান। কিছুক্ষণ পরে কষ্টে সে তার পিঠে চেপে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল।

'এইবার দেখ!' চেঁচিয়ে বলে প্রাণপণ শক্তিতে লাঠিটা বসাল জন্তুটার পাছায়।

কাতরে উঠে জন্তুটা পেছনের পা দুটো ছুঁড়ল।

'চল বেটা!' আর এক ঘা বসাল কারামান।

আবার কাতরে উঠল সে, কিন্তু নড়ল না একচুল।

কারামান তখন পাগল হয়ে গিয়েছে, প্রাণপণে মারতে লাগল তাকে।

শুয়োরের মতো চেঁচিয়ে উঠে পিঠ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য পা দাপাতে লাগল জন্তুটা। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে এত জোর ঝটকায় ঘুরল যে আর একটু হলে কারামান পড়ে যেত। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল সে। চড়াই উতরাই, খানা-খোঁদল আর বন, কিছুতে এসে যায় না, জোর কদমে সে দৌড়ল। ঝুলে পড়া ডালপালায় চোখ উপড়ে না যায়,

শুধু সেটা দেখা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই কারামানের।

জন্তুটাকে থামাবার যত চেষ্টা সে করছে তত জোরে দৌড়চ্ছে সেটা। শেষে ওটার সামনের পাগুলোর নিচে পায়ের ডগা বসাতে পেরে আগের চেয়ে নিরাপদ বোধ করে হাঁফ ছাড়ল সে।

'দৌড়, দৌড়, আহাম্মক কোথাকার!' বিড়বিড় করে সে বলল। 'থামতেই তো হবে তোকে। কতক্ষণ আর দম থাকবে। আমার হাত থেকে ছাড়ান পাবি না!'

হঠাৎ একটা ভাঙা পাথরের দেয়াল হালকা পায়ে পার হয়ে জন্তুটা একটা বাড়ির খিড়কিতে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এসে আমভ্রসি পাদরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কারামানের দিকে।

হতভম্ব হয়ে বসে রইল কারামান।

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত তার কাছে এল পাদরী। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি নাকি, কারামান?'

"হায়, কারামান না হয়ে যদি আর কেউ হতাম," মনে মনে বলল ঘোড়াচোর।

'বেশ করেছ, বাছা! হতচ্ছাড়া জানোয়ারটাকে কোথায় পেলে? মাসখানেক হদিস মেলেনি। কত জায়গায় না খুঁজেছি ... নামো, নেমে পড়। বেটা তোমার ধকল করেছে দেখছি। বেজায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।'

নেমে কারামান পাদরীর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল, পরাজিত জেনারেলের মতো আবছা সে দৃষ্টি। সত্যি, চোরাই খচ্চর নিয়ে হাতেনাতে ধরা না পড়াটা হাঁফছাড়ার মতো ব্যাপার, তবে লজ্জাকর পরাজয়ের একটা বোধ তাকে পেড়ে ফেলেছে।

'বেটা বদমাসকে পেলে কোথায়?' আনন্দে বকবক করে চলেছে আমভ্রসি। 'দেখ তো, নিজে চরে চরে কেমন নধর চেহারাটা বাগিয়েছে! একগুঁয়ে

জন্তুটাকে বাড়িতে কী করে ফিরিয়ে আনতে পারলে বল তো? তাজ্জব কাণ্ড!.. অনেক ধন্যবাদ, বাছা! তোমার এ উপকার কখনো ভুলব না!'

অশ্বতরের দিকে তাকাল কারামান, বলল না কিছু। ব্যাপারটা কী ভাবে ঘটে তার নিজেরো ঠিকমতো জানা নেই।

আর জানোয়ারটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোতে চিবোতে লেজ দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াতে লাগল।

সাদ্রিদ্দীন আইনি

প্রাচীন কাল থেকে তাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে পারস্য ও ভারতের সংস্কৃতির।

সাদ্রিদ্দীন আইনি (১৮৭৮ — ১৯৫৪) ছিলেন মহাপণ্ডিত ও ধ্রুপদী কবি এবং তাজিক গদ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচনাবলী তাজিক জনগণের উপকথা বিশেষ।

বারো বছরের সাদ্রিদ্দীন বোখারায় আসেন জ্ঞান পিপাসার তাগিদে। কিন্তু মাদ্রাসার দুঃস্থ ছাত্রটির বেশির ভাগ সময় কাটত অন্য লোকের কাপড়জামা ধোওয়ায়, পড়াশুনোয় নয়। সুদীর্ঘ রাত্রে ঘুমের কথা ভুলে সে সাগ্রহে পড়ত হাফিজ, সাদি, কামল খুজান্দি এবং আহমেদ দানিশ'এর মতো মহাকবিদের রচনা।

বিপ্লবের পর বোখারা আমিরের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সাদ্রিদ্দীন আইনি, তাঁর নিজের ভাষায়, "অক্টোবর বিপ্লবের পাঠশালায় চল্লিশ বছর বয়সের পড়ুয়া হলেন," নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেন সাহিত্য সেবায়। তাজিক সাহিত্যের বিষয়ে সমালোচনামূলক প্রথম বৈজ্ঞানিক লেখার স্রষ্টা তিনি।

তাঁর উপন্যাস "অনাথ", "ওদিনা", "বোখারার জল্লাদ", "একটি সুদখোরের মৃত্যু", "দোখুন্দা", "দাস" এবং তাঁর "স্মৃতিকথা"র কয়েকটি খণ্ড খ্যাতিলাভ করেছে।

এ সংগ্রহে যে গল্পটি নেওয়া হয়েছে সেটি "স্মৃতিকথা"র প্রথম খণ্ডে আছে।

মাদ্রাসায় আমার শেষকটি দিন

১৮৯১ সালে স্কুল শুরু হবার কিছুদিন পরে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মোল্লা আবদুসালম তাঁর দলের পড়ুয়া লাতিফজান মাখদুম এবং কয়েকটি অন্তরঙ্গ সহপাঠীর জন্য একটি প্রীতি ভোজের বন্দোবস্ত করেন। রান্নাবান্না এবং পরিবেশনের ভার ছিল আমার উপর।

মোল্লা আবদুসালম থাকতেন মাদ্রাসার একটা সেরা কুঠরিতে; এক খিলানের ঘরটি বড়োসড়ো, অন্যান্য কুঠরির মতো নয়। অগ্নিকুণ্ড আর জলের কল ছিল দরজার পাশে। তাই আমরা সবাই বেশ কাছাকাছি ছিলাম, পোলাও বা চা বানাবার সময় কথাবার্তায় আমিও যোগ দিতে পারি।

বন্ধুদের সঙ্গে ঘরে ঢুকেই আমাকে চিনতে পারলেন লাতিফজান মাখদুম। আবদুসালমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটিই না বয়েতবারাকে* হামবড়া মির্জা আবদুল ওয়াহিদকে হারিয়ে দেয়?'

'হ্যাঁ,' বললেন আবদুসালম।

'এখানে পড়তে এসে ও ভালোই করেছে,' বললেন লাতিফজান মাখদুম।

পার্টিটা আমার খুব ভালো লাগে, কেননা কথাবার্তা প্রধানত চলে কবিতা ও সাধারণভাবে সাহিত্য নিয়ে। অতিথিদের অধিকাংশই হয় কবি নয় কবিতারসিক। যাঁরা কবিতার বিষয়ে বিশেষ জানতেন না তাঁরা ভালো গল্প-বলিয়ে, কোন সময়ে কী গল্প বলতে হবে সে বিষয়ে তাঁদের টনটনে জ্ঞান।

---

* কবির লড়াই। প্রতিযোগী যে কবিতা আবৃত্তি করে তার শেষ অক্ষর নিয়ে অন্যজন তাকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

মজার মজার গল্প তারা করলেন, একে অন্যের স্টাইলে দ্বিপদী বানালেন, আগেকার কবিদের চার-পদী শ্লোকের আবৃত্তি ও মহাজনপন্থা অনুসরণের যে ব্যর্থ চেষ্টা সমকালীনরা করেছে তার সমালোচনা চলল। সমকালীন কবিরা প্রায়ই মহাকবির অনুসরণ করে, কিন্তু মহাকবির প্রতি পদে সর্বদা থাকে খুব স্পষ্ট বক্তব্য। অনুসরণকারীরা শুধু রূপ নিয়ে ভাবে, বিষয়বস্তু ও মনন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

অতিথিদের একজন, দপ্তরী মোল্লা নাজরুল্লা লুতফি আমার মনে সবচেয়ে গভীর দাগ কাটেন। পরে শুনি দপ্তরীর কাজ তিনি ছেলেবেলায় করতেন; তারপর তালিম নিতে নিতে পড়াশুনো শুরু করেন, সাহিত্যে মন দেন। এখন তাঁর বয়স তিরিশের কাছাকাছি, মাদ্রাসায় পাঠ শেষ করছিলেন। যেমন জ্ঞান তেমন চেহারা: ফরসা রঙ, খয়েরি দাড়ি, বড়ো বড়ো কালো চোখ, বাঁকা ভোমা, টানা ভুরু। দোহারা ছিমছাম গড়ন, হাত আর পা সুগঠিত। দেখে মনে হয় জীবন্ত কবিতা।

লুতফি হস্তলিপিবিশারদ, এত সুন্দর তাঁর লেখা যে এমন কি যারা নিরক্ষর তারা পর্যন্ত অপরূপ শিল্পসৃষ্টি বলে এর তারিফ করত। বই নকল করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

লুতফির কবিতা রূপের দিক দিয়ে সাধারণ, বক্তব্য তুচ্ছ। কিন্তু লোকটি এত অমায়িক, প্রত্যুত্তরে এত চটপটে ও সরস যে তাঁর কথাবার্তা শোনাটাই একটা আনন্দ। এমন সব দ্ব্যর্থক শব্দ তিনি ব্যবহার করতেন যেগুলি মনে হত সরল কিন্তু যাতে ছাপ থাকত ব্যঙ্গ বা প্রশংসার। তাছাড়া অন্যদের বক্তব্যের অর্থ যেভাবে তিনি করতেন তা স্বয়ং বক্তার কাছে অভিনব মনে হত।

অতিথিদের আর একজন হলেন নাপিত মোল্লা রহমত। বাল্যকালে নাপিতের কাজ শুরু করেন, মাদ্রাসায় ঢোকার পরও ছাড়েননি — এতেই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হত। আরো পরে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধনী সওদাগরদের ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বয়স

প্রায় তিরিশ, লুতফি ও লাতিফজান মাখদুমের সহপাঠী। পড়াশুনোয় মন কখনো দেননি, সাহিত্যের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ তাঁর ছিল না। মেজাজটা নরম, মোল্লাসুলভ দম্ভের ছিটেফোঁটা নেই। আত্মসন্তুষ্ট আত্মাভিমানী গোঁড়া লোকদের তিনি দু চক্ষে দেখতে পারতেন না, বলতেন তাঁর একমাত্র ধর্মগুরু হল পোলাও।

জীবিকার সন্ধানে বা আনন্দলাভের জন্য যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই নানা মজার গল্প জোগাড় করতেন বা অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এসে বন্ধু ও সহপাঠীদের বেশ রসিয়ে সে সব কথা বলতেন। লাতিফজান মাখদুম বলেন, 'তুমি দেখছি চুল ছাঁটা ছেড়ে গল্প ছাড়তে শুরু করেছো।'

দলের আর একজন ছিলেন মোল্লা ওকিল। বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কথা একেবারে তাঁর অজানা, রসালাপে কোনো মজা পেতেন না। একমাত্র গুণ তাঁর নম্র ও হাসিখুসি স্বভাব। কোনো কিছুতেই চটতেন না। তাঁকে নিয়ে সহপাঠীরা যা কিছু ইয়ার্কি করুক, হাসিমুখে সব সহ্য করে শুধু হাত নাড়তেন।

উপস্থিত ছিলেন কুলাবের মোল্লা বুরহান, বছর তিরিশেকের মোটাসোটা লোক, গোলগাল শ্যামবর্ণ মুখে প্রকাণ্ড কালো দাড়ি। চোখ সর্বদা জ্বলজ্বলে। চমৎকার গল্প বলতেন, পাহাড়িয়ার রুক্ষতার সঙ্গে বোখারাবাসীর সুমধুর মার্জিত আদব-কায়দার সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

এককালে তিনি 'মুশতকি'* ছদ্মনামে অতি সাধারণ কবিতা লিখতেন। কিন্তু লুতফি ইচ্ছে করে 'মুশি তগি' ('পাহাড়ে ইঁদুর') উচ্চারণ করাতে নাম বদলে তিনি রাখেন 'বিসমিল' ('গলা কাটা'), এই মর্মে যে লুতফি জিহ্বার আঘাতে তাঁকে 'কেটেছেন'।

পাহাড়ের মানুষ, সেখানে ফিরে যাবার জন্য দু বছর আগে পড়াশুনো ছেড়ে দেন। মাত্র কিছুদিন আগে মাদ্রাসায় ফিরেছেন। কিন্তু মাদ্রাসায়

---

* আকাঙ্ক্ষা।

পড়াশনোয় পিছিয়ে পড়ার মানে সহপাঠীদের দল ছাড়া নয়, তাই দলে আবার আসতে দেওয়া হয় তাঁকে।

দু বছর কেন আসেননি সে প্রসঙ্গে বুরহান নিচের গল্পটি বলেন।

'একটি গ্রীষ্মে ঠিক করলাম যা পড়েছি তা ঝালিয়ে নেবার এবং ভবিষ্যৎ পাঠের প্রস্তুতির জন্য কোনো নিরালা জায়গায় চলে যাবো। সেখানে আবার মাগনা খাবারের ব্যবস্থা থাকা চাই। লোকে বলল খোজা উবন'এর সমাধিমন্দির ঠিক আমার লাগসই জায়গা। জায়গাটার বর্ণনা করি। গল্পটির নাম দিতে পারি:

তীর্থযাত্রীর পাদুকা

জানেন তো, জায়গাটা মরুভূমিতে, বোখারার চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে।

রাস্তার অর্ধেকটা চষা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, বাকিটা ঊষর মরুভূমিতে। দুরূহ পথ। কোনোক্রমে গন্তব্যে পেঁছিলাম।

কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই, জল ঘাস বা গাছের চিহ্ন নেই। দালান বলতে শুধু সমাধিমন্দির, তাতে খোজা উবনের কবর ছাড়া মাত্র আর একটি ঘর 'চিল্লাখানা'*। নোনা জলের একটা গভীর কুয়ো, সে জলে শুধু রোগীর চিকিৎসা হত, কিন্তু এ জল খেলে সুস্থ লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ত। খাবার জল গাধা বা ঘোড়ার পিঠে ভিস্তিতে আনতে হত দূরের একটা গ্রাম থেকে।

সমাধিমন্দিরের বাইরে আরাধনার ঘর, বারান্দা ও খাবার জায়গা। খাবার জায়গার নাম ছিল 'মহান পীরের বৈঠকখানা'।

সমাধিমন্দিরের উত্তরে উঁচু দেয়াল-ঘেরা বড়ো একটি মহাল। সমাধিমন্দিরের অছির সম্পত্তি।

---

* এ রকম কুঠরিতে লোকে চল্লিশ দিন উপবাস ও প্রার্থনায় কাটাত।

বছর সত্তরের লোকটি বেঁটে মোটা, গোল লাল মুখ, সাদা দাড়ি। ইনি একাধারে মোল্লা এবং ধর্মবক্তা, এবং অন্যান্য সমস্ত কাজও করতেন। কয়েকটি লোক খাটত তাঁর জন্য।

সমাধিমন্দিরের চারিপাশে লাল বালির টিলা পাহাড়ের মতো এক দিকে গিয়েছে চাজ্জেী পর্যন্ত আর অন্য দিকে খোরেজ্ম। উত্তরে কিজিল-কুম মরুভূমি পর্যন্ত তাদের বিস্তার।

আশেপাশের জায়গা অনুর্বর, ভেড়ার পাল নেই, কিন্তু সমাধিমন্দিরের খাবার জায়গায় কখনো খাসা খাদ্যের অভাব হত না। খাবার আনত তীর্থযাত্রী, রুগ্ন লোক আর অছির শিষ্যরা।

শুনলাম অগুনতি উপহার আর দানের দৌলতে অছির ভাঁড়ার-ঘর ময়দা গম চাল আর যবে প্রায় ফেটে পড়ছে, ঘড়াগুলোয় তেল উপছে পড়ছে, চারণভূমিতে গাদা গাদা ভেড়া। তাছাড়া আশেপাশের গ্রামের অনেকখানি জমি তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন, তাঁর অনেক চেলা বেগার খাটে ক্ষেতে।

খাবারের বৈচিত্র্য প্রথমে দেখে মনে হল নরকের গভীরে একটা স্বর্গে এসে পড়েছি।

পরে বুঝতে পারলাম যে এ 'স্বর্গে' তিন দিনের বেশি ঠাঁই কারো মেলে না, হোক না কেন সে তীর্থযাত্রী, ভবঘুরে বা ভিখিরী। চমৎকার খাবার দেখে তাদের চোখ জ্বলে উঠত, জিভ দিয়ে জল গড়াত, লোভে ভরে যেত বুক, কিন্তু তাদের পাততাড়ি গুটোতে হত। লোকে বলত পীর চান না তারা তিনদিনের বেশি থাকে। পীরের জন্য নৈবেদ্য নিয়ে-আসা চাষীদেরও বেশিক্ষণ থাকা হত না, তাদের কাজে ফিরে যেতে হত তাড়াতাড়ি। নৈবেদ্য দিয়ে, কয়েক ঘড়া মঙ্গল বারি নিয়ে বেশির ভাগ চাষী সেই দিনই ফিরে যেত।

পীরের ইচ্ছের কথা না ভেবে চল্লিশ দিন ওখানে থেকে যাব ঠিক করলাম। 'চিল্লাখানা'য় উঠে, দিনে তিনবার চেলা ও তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যেতাম খাবার জায়গায় পেট ভরে খেতে।

তিনদিনের দিন ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে দেখলাম আমার জুতোজোড়া

বাইরের দিকে মুখ করে রাখা, পা গলালেই হল। প্রথমে ব্যাপারটায় বিশেষ নজর দিইনি, ভাবলাম আমাকে চাকরটা যে সমীহ করে তার চিহ্ন এটা। কিন্তু ব্যাপারটা বারবার হচ্ছে দেখে বিব্রত লাগল।

'শোনো দোস্ত,' চাকরকে বললাম, 'তুমি আর আমি দুজনেই মানুষ। আমার জুতোজোড়ার যত্ন আর করো না, তাতে আমি লজ্জা পাই।'

'কিন্তু আমি তো আপনার জুতো বাইরে রাখি না,' সে বলল।

'তাহলে কে রাখে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'পীর।'

'কোন পীর?'

'এখানে যাঁর সমাধি, সেই খোজা উবন।'

এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল যেন পীরকে জুতোজোড়া বাইরে রাখতে স্বচক্ষে দেখেছে।

লোকটির উত্তরে আমার আরো অবাক লাগল। বুঝতে পারলাম এর পেছনে কোনো রহস্য আছে। সেটা বের করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহে তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

'মহান পীর আমার জুতো বাইরে রাখবেন কেন? আমাকে কি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন?'

'না, অসন্তোষ জানাবার জন্য করছেন। চলে যাবার সময় হয়েছে কাউকে বোঝাতে হলে খোজা উবন জুতো বাইরে রেখে দেন।'

'লোকটা যদি তখনো না যায়?'

'তাহলে তার কুষ্ঠ হবে।'

এবারে জুতোর রহস্যটা জানা গেল। জানা গেল কেন তীর্থযাত্রী, ভবঘুরে বা ভিখিরীরা তিন দিনের বেশি এখানে আস্তানা গাড়তে পারে না। মনে মনে হেসে নিজেকে বললাম, "এখানে চমৎকার খানা মিলছে, সেটা ভাঁওতায় পড়ে এত সহজে ছাড়বার পাত্র আমি নই। চাকরবাকরদের দিয়ে আমাকে ঘাড় ধরে অছি বের না করে দেওয়া পর্যন্ত নড়ছি না এখান থেকে।"

সেই রাত্রে নৈবেদ্যদাতা ও ভক্তরা সবাই প্রার্থনা-কক্ষের বারান্দায়, বৈঠকখানায় এবং অন্যত্র গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে পড়লে আমি তাদের জুতো বাইরে রেখে ঘুমোতে গেলাম।

ভোরবেলায় বেরিয়ে দেখলাম অতিথি আর ভক্তরা সবাই চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কেমন যেন ক্ষুব্ধ বিমর্ষ চেহারা প্রত্যেকের। বোধহয় ভাবছে, "আমাদের থাকায় পীরের যখন অনিচ্ছা তখন আমাদের কপালে কী আছে কে জানে।"

তখন থেকে রোজ রাত্রে সবায়ের জুতো বাইরে রেখে দিতাম।

ফলে গ্রামে গ্রামে গুজব রটে গেল যে অছি, তার চাকরবাকর এবং আমি ছাড়া আর কাউকে চান না খোজা উবন। সমাধিমন্দিরে নৈবেদ্যদাতাদের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন স্বয়ং অছি হাজির হলেন চিল্লাখানায়। মুখটা এত লাল কখনো দেখিনি, চোখ বাঘের মতো জ্বলজ্বলে। ভাবলাম এবার মানে মানে কেটে না পড়লে গলাধাক্কা দিয়ে ভাগাবে।

নমস্কার জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ইঙ্গিতে বসতে বললেন, এমন কি জোর করে বসিয়ে দিলেন আসনে। তারপর গুরুর সামনে চেলা যেমন সসম্ভ্রমে বসে ঠিক তেমনভাবে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তিনি মুখটা আমার মুখের খুব কাছে এনে, যেন গোপন কিছু বলছেন, কথা বলতে শুরু করলেন। মুখে মদের গন্ধ। কখনো ভাবিনি এরকম একটা পবিত্র স্থানে এ গন্ধ পাব। বুঝলাম বাড়িতে তৈরি যে মদ শারিয়া মতে পানযোগ্য তা খেয়ে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুখ দেখে মালুম হল শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নয় আমার সঙ্গে আলাপের সাহস পাবার জন্য মদ্যপান করেছেন।

'দেখে মনে হচ্ছে মহান পীরকে আপনি ভয় পান না!'

খেঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'না!' তাঁকে বাগে পেয়েছি মনে হল। আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেই যাবার আগে চাকরবাকর চেলাদের, সবাইকে পাদুকার গোপনকথাটা ফাঁস করে দেব বলে মনস্থির করেছিলাম।

কিন্তু অছি বললেন, 'তাহলে এটা পীরের সমাধিমন্দির নয়, আপনার নিজের বাসা। কিন্তু একটা অনুরোধ — পীর যে জুতো বের করে দেন সেটার ওলটপালট করবেন না। আর, গোপনকথাটা কাউকে বলবেন না। কথায় বলে না, "গোপন যা তা গোপন থাকাই ভালো"।'

দেখলাম আমার সঙ্গে ঝগড়া নয়, একটা বোঝাপড়া করতে চান।

'এখানে এসেছেন, সেজন্য আপনার এটা প্রাপ্য আমার কাছে,' বলে তিনি বাণ্ডিল বের করে আমার সামনে রাখলেন। 'সহরে ফিরে যাবার আগে এ ছাড়া একটা আলখাল্লা ও পাগড়িও পাবেন আপনার হিতৈষীর কাছ থেকে।'

অছি বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে।

বাণ্ডিল খুলে দেখলাম একশ বোখারা টাঙ্গা, অর্থাৎ পোনেরো রুবল।

সেদিন থেকে আর খাবার জায়গায় যেতে হত না। চিল্লাখানায় আমার জন্য আসত সেরা খাবার। অন্যদের মিলত হাতে-গড়া রুটি, আমার কাছে আসত ময়দার সবচেয়ে ভালো কেক। আমার জামাকাপড় ধোওয়ার জন্য একটি ঝি রাখা হল। তখন আর অতিথি নই, স্বয়ং অছির বাড়ির লোক। চাকরবাকরেরা দারুণ খাতির করত আমাকে। এক কথায় 'বাঘের ঘরে ঘোগ' হয়ে দাঁড়ালাম।

মোল্লা বুরহান চা শেষ করে আর একটা গল্প আমাদের শোনালেন। তার নাম দেওয়া যেতে পারে:

মরুভূমির সেই মেয়েটি

মেয়েটি বলল, 'মা মারা যান আমি যখন আঠারো বছরের। বাপমায়ের একমাত্র সন্তান আমি। মা লিখতে পড়তে জানতেন, আমাকেও শিখিয়েছিলেন। যখন ষোলোয় পা দিলাম মা ভাবলেন এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি সারা দেশে সুপাত্রের তল্লাস করেন। কিন্তু পাত্তা মিলল না কারো। ব্যাপারটা এই যে আমার বাবা, খোজা উবনের সমাধিমন্দিরের

যিনি আছি, তিনি নিজে খোজা এবং খোজারা জ্ঞাতিবর্গের বাইরে মেয়েদের বিয়ে দেয় না। আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে কমবয়সের পাত্র পাওয়া গেল না, তাই মায়ের আশ মেটার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

'বছর ঘুরতে না ঘুরতে বাবা আবার বিয়ে করলেন।

'সৎমা আমাকে দিয়ে সংসারের সব ভারি আর বাজে কাজ করাতেন। কাজের পর বই পড়ছি, তিনি আমাকে খোঁটা দিতেন এই বলে যে বই পড়ায় মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, পড়া বন্ধ করার জন্য অন্য একটা কাজ বের করতেন আমার জন্য। রাত্রে শুনতাম বাবার কাছে নালিশ করছেন:

'"আপনার মেয়ে গুচ্ছির বাজে কবিতা পড়ে। পড়া বন্ধ করুন, ওকে আর পড়তে দেবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন বিয়ে দিয়ে দিন।"

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করার ইচ্ছে আমারো ছিল। বর সত্তর বছরের বুড়ো হলেও ক্ষতি নেই, জঘন্য সৎমার হাত থেকে তো রেহাই পাবো। কিন্তু পাত্র কই, আমাদের জ্ঞাতিবর্গ যেন লোপ পেয়েছে!

'জ্ঞাতিরা সবাই চেলা আর ভক্তদের মেয়েদের বিয়ে করে, প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য মেয়েদের সঁপে দেওয়া হয় তাদের হাতে, যেন গরু ভেড়া। এমন অবস্থায় মরুভূমিতে পড়ে-থাকা আমার মতো দুর্ভাগা মেয়ের বর জুটবে কেমন করে?

'চার বছর পর সৎমা মারা গেলেন। কিছুদিন পরে বাবা আবার বিয়ে করেন।

'এটি এবার আগেকারটির চেয়েও এক কাঠি সরেস। আমার জন্য নতুন জামাকাপড় কিনতে বাবাকে বারণ করে দিলেন শুধু তা নয়, দুর্ভাগা মায়ের জামাকাপড়ও আমাকে পরতে দিতেন না।

'তিনি বলতেন, "বউ'এর জিনিস অন্য বউ পাবে, মেয়ে নয়।"

'বাড়ির জিনিস চুরি করে তিনি আত্মীয়স্বজনদের দিতেন। বাবার সেটা সহ্য হল না, বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন তাঁকে। তখন থেকে আমিই গৃহকর্ত্রী।

'সিতোরাকে আমার ঝি করলাম। তখন ও ন বছরের মেয়ে। অনাথ মেয়েটিকে বোনের মতো ভালোবাসি। আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু ও।

'বোখারায় পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি বিপত্নীক থাকতেন, খোজা উবনের বংশধর। বাবার কাছে ঘটক পাঠালেন তিনি।

'শুনলাম বাবা ঘটককে বলছেন, "আমি বুড়ো হতে চলেছি। বউ নেই, ও আমার একমাত্র সন্তান। সংসারের ভার ওর হাতে। তাই এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেব যে আমার বাড়িতে থাকতে রাজী।"

'পানিপ্রার্থীর নিজের বাড়ি, সহরে ব্যবসা। তাই সে রাজী হল না।

'বুঝলাম আমাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হবে। খোজা উবনের কোনো বংশধর সহর ছেড়ে মরুভূমিতে কঞ্জুষ আর লোভী শ্বশুরের বাড়িতে থাকতে রাজী হবে না।

'প্রেম দূরে থাক, কৌতূহলভরেও কোনো মরদের দিকে কখনো তাকাইনি। কিন্তু একদিন এমন একটি মানুষ এল যে খোজা উবনের বংশধরের হালচালের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে সাহস করে। এই হালচালের ভুক্তভোগী আমি, হালচাল ভাঙ্গতে পারে এমন লোকটির সাহস ভালো লাগল। বাড়ির দেয়াল আর দরজার আড়াল থেকে নজর রাখলাম তার ওপর। ক্রমেক্রমে তার প্রতি অনুরাগ বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম সেই দশায় যাকে কবিরা বলে প্রেম আর যাতে সাপে কাটা লোকের মতো তারা গোঙায়।'

কথাটা মনে পড়াতে বেশ বিচলিত হয়ে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল মেয়েটি।

'আমার মনে হয় তরুণ হৃদয়মাত্রেই প্রেম আছে,' সে বলে চলল। 'কিছুদিন সে প্রেম চুপচাপ থাকে বাঁধের জলের মতো। তারপর বেরিয়ে আসার পথ বের করে সেদিকে চলতে থাকে, প্রথমে ক্ষীণ ধারায়, তারপর স্রোতে, সে স্রোত ক্রমশ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে কেউ রুখতে পারে না, সমস্ত বাধা ঝেঁটিয়ে সাফ হয়ে যায়। আমার প্রেম সেরকম।'

আমার দিকে এমনভাবে মেয়েটি তাকাল যেন জবাব চায়।

'সেই ভাগ্যমন্তটি কে?' শুধালাম।

মেয়েটি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'আমার হাবভাব বা এইমাত্র যা বললাম তা থেকে যদি আঁচ না করে থাকেন, তাহলে মুখ ফুটেই বলি: আপনি!' হাসিতে তার দাঁত ঝিকঝিকিয়ে উঠল। 'আপনিই জুতোর চালাকিটা ফাঁস করে বাবাকে হাস্যাস্পদ করেন, ফাঁদে ফেলেন। আপনাকে দেখেই আমার আশা হল কয়েকটা উবনী রেওয়াজ ভাঙা সম্ভব। আমাকে আপনিই জীবন্ত করে তোলেন, অন্তরে জাগান যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা। আমার যৌবনবাসনা আপনার কাছেই মাথা নত করে বশ্যতা মেনেছে।'

ভেবে পেলাম না কী বলি, কী করি। শুধু জানতাম ওর প্রেমে আমি পাগল।

'সবাইকে সাক্ষী করে আপনার ধর্মপত্নী হওয়া আমার ইচ্ছে। লুকোচুরি কিছু আমার দ্বারা হবে না,' মেয়েটি বলল।

'আমি সর্বান্তঃকরণে তৈয়ার,' জবাবে বললাম। 'কিন্তু তোমার নাছোড়বান্দা বাবাকে কী করে বোঝাই?'

'ফিকির একটা আছে, কিন্তু তাতে আপনাকে বেশ একটা প্রয়াস করতে হবে।'

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?' ব্যাপারটা বুঝিনি। 'জান কবুল করতে রাজী!'

'আপনার জান গেলে সে ফিকিরে আমার কী লাভ?' হেসে সে বলল। 'শুনেছি খোজারা কেউ কেউ জ্ঞাতিদের মধ্যে পাত্র খুঁজে না পেলে মোল্লাদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দেয়; ওদের মতে খোজার চেয়ে মোল্লারা খারাপ নয়। বাবাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে রাজী করাতে পারে এমন ঘটককে আপনার খুঁজে বের করতে হবে।'

ঘাগী নেকড়েকে ঠকাবার মতো শেয়াল কোথায় খুঁজে পাব ভাবতে লাগলাম।

আমার দ্বিধা দেখে মেয়েটি বলল, 'আপনি হয়ত মরুভূমিতে থাকতে চান না। বাবার সর্ত মেনে নিচ্ছেন, শুধু তার ভান করা দরকার। বিয়ের পর শারিয়া মতে আমি আপনার দাসী হয়ে যাব আর আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন, যা আপনার খুসি। বোখারায় আমাকে নিয়ে গেলে সেলাই করে বা মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু রোজগার করতে পারব।'

তার বাবাকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মেয়েটিকে বললাম তাই করব।

মাথার উপর দিয়ে কখন চাঁদ চলে গেছে, পূব আকাশে মিনারের মতো একটি আলোর রেখা ফুটে উঠেছে।

উঠতে উঠতে মেয়েটি বলল, 'আপনি আমার যৌবনের সমস্ত বাসনাকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। আজ থেকে আমার ভাগ্য আপনার হাতে। মনে রাখবেন:

> আমার ভাগ্যে আর কী আছে?
> দুটোর মধ্যে কোনটা:
> তোমার হাতের কোমল পরশ
> না সে হাতে আমার সর্বনাশ?

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ওকে জড়িয়ে ধরাতে কাছে সরে এল। অধরে অধরের স্পর্শ। কালের যাত্রার কথা ভুলে গেলাম। ভোরের ফিকে আলো তখনি দেখা দিয়েছে মাথার উপর।

'সত্যি খারাপ কিছু করার আগে ছাড়াছাড়ি হোক,' সে বলল। আমাকে ছেড়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

ঘুরপথে সমাধিমন্দিরে ফিরে চিল্লাখানায় বসে রইলাম।

পরের দিন সহর থেকে ফিরে এলেন অছি।

দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিই প্রথম। তাঁর সঙ্গে মুলাকাতে, তাঁর আলাপে খুসি হবার একটা ভান করলাম, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিনি, যদি বিরক্ত ও ক্লান্ত বোধ করেন।

তখন থেকে সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতাম।

কিন্তু ঘাগী শেয়াল তিনি, অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিতেন, পারিবারিক বিষয়ে কিছু খোলাখুলি বলতেন না। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার কোনো সুযোগ হত না। দিন কাটতে লাগল, আমি কিন্তু এগোতে পারলাম না মোটেই।

সিতোরা মাঝে মাঝে এসে মেয়েটির শুভেচ্ছা জানাত, জিজ্ঞেস করত ব্যাপারসাপার কেমন চলছে। কিন্তু বুড়ো জায়গা ছেড়ে কোথাও না নড়াতে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত না।

একদিন খোজা বাহাউদ্দিনের বংশধর ষাট বছরের একটি বিপত্নীক ঘটক পাঠাল, কিন্তু অছি অসম্মতি জানালেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর অসম্মতির কথা যেন কিছু জানি না এমনভাবে বিবাহপ্রস্তাবের জন্য আনন্দ প্রকাশ করলাম। তিনি জানালেন যে রাজী হননি, এবং কেন হননি সেটা খুলে বললেন:

'আমরা হলাম গিয়ে মহম্মদের তৃতীয় বন্ধু মহান ওসমানের বংশধর। আর বাহাউদ্দিনী খোজাদের পূর্বপুরুষ হল বাহাউদ্দিন নাখ্সবান্দ — তিনি মাত্র পাঁচশ বছর আগে দরবেশদের একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই খোজারা উপাধিটা গ্রহণ করে। বাহাউদ্দিন নাখ্সবান্দের ঠাকুর্দার নাম কেউ জানে না। যদি শুনি যে ও বোখারার প্রাক-ইসলাম অগ্নিউপাসকদের বংশধর তাহলেও অবাক হব না। বাহাউদ্দিনীরা আমাদের মেল নয়, ওদের ঘরে আমাদের মেয়েকে দেবো কেমন করে?'

'শুনেছি আপনার মেয়ে এখন অরক্ষণীয়া,' আমি বললাম। 'শারিয়া মতে মেয়ের বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপের উচিত তার বিয়ে দেওয়া।'

'অনেকদিন মাদ্রাসায় যাইনি বটে কিন্তু শারিয়া আমারো জানা আছে,' উত্তরে তিনি বললেন। 'অবস্থা বুঝে ব্যতিক্রমের কথা শারিয়ায় আছে। একটা জায়গায় বলেছে, "প্রয়োজন হলে করা চলে।" মেয়ের যোগ্য পাত্র পেলে আমি

চাই সে যেন আমার এখানে থাকে। কিন্তু সবি অদৃষ্টের হাতে। আমার মেয়ের বয়স যা জানেন সেটা ভুল, ও সবে সতেরো পেরিয়েছে। অবশ্য, শারিয়া মতে ন বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে। নিয়মটা ভালো, কেননা তাতে ওদের অচেনা লোকের নজরের বাইরে রাখা যায়।'

'শারিয়া মতে,' আমি বললাম, 'খানদানীতে মোল্লারা খোজার সমান। খোজাদের মধ্যে সুপাত্র না মিললে ভালো দেখে মোল্লা জোগাড় করতে পারেন।'

কথাগুলোর কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্য থামলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অছির মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। তবু বলে চললাম, 'অবশ্য সব মোল্লাকে বিশ্বাস করা যায় না, যে মোল্লা আপনার জামাই হতে চায় তার আপনাকে বান্দার মতো সেবা করা চাই। সহরে বাড়ি থাকবে না, এখানেই বরাবর আস্তানা গাড়বে। তাছাড়া এখানকার রহস্য সে গোপন রাখবে, অলৌকিক ক্রিয়াসাধনে সাহায্য করবে আপনাকে। এ ধরনের গুণী মোল্লা পেতে আপনার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। আর ধনী জামাই নিয়ে কী হবে আপনার, আপনার নিজেরি তো যথেষ্ট ধন — আল্লা করুন পোয়া বারো হোক। এ সব গুণ যার আছে সেরকম গরিব জামাই পেলে আপনার ধনসম্পদ বাড়বে।'

ঠিক নিজেকে জামাই করার প্রস্তাব জানানো হল, কেননা গুণের তালিকাটি আমার সঙ্গে পুরো খাপ খায়। আমার মতলব বুঝে বুড়ো শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিরাগ ঢাকার জন্য খুসির একটা মুখোস চাপাল। কিন্তু আমার তীক্ষ্ন দৃষ্টি সে মুখোস ভেদ করল।

কার কথা বলছি তা না বোঝার ভান করে প্রসন্নমুখে তিনি বললেন, 'সত্যি, এরকম মোল্লার হদিস যদি পেতাম! তাহলে খুব ফলাও করে বিয়ে দিতাম, সব খরচা আমার। আপনি যে সব গুণের কথা বলছেন সেরকম কোনো মোল্লাকে সহরে গিয়ে বের করে বলে কয়ে ঘটকালির জন্য খানদানী বংশের কোনো মানী লোককে পাঠাতে বলবেন? ..'

তাঁর ইচ্ছেটা শুধু আমাকে প্রত্যাখ্যান নয়, বাড়ি থেকে বিতাড়ান করা।

নিশ্চয়ই ভাবলেন, বিয়েপাগলী অতি সোমত্ত মেয়ের কাছাকাছি বিবাহপ্রার্থী কোনো যুবকের থাকা বড়ো বিপজ্জনক। ঘটকের হওয়া চাই খানদানী বংশের মানী লোক! ভালো করে তিনি জানেন যে আমার মতো গরিব বাউণ্ডুলের জন্য ঘটকালি করতে এমন লোক রাজী হবে না।

কথাবার্তার ফলে বেজায় দোটানায় পড়ে গেলাম। সুপাত্রের খোঁজে যত শীঘ্র পারি সহরে যাওয়া দরকার, কিন্তু আমার মতলব মেয়েটিকে না জানিয়ে কী করে যাই?

শেষ পর্যন্ত একটি চেলার বিয়েতে অঁছি গেলেন জন্দর জেলায়। চিল্লাখানা থেকে একচুল নড়লাম না, কখন সিতোরা আসে। আসতে দেরি হল না তার।

'আপনাকে সেলাম জানাচ্ছেন বিবি,' সে বলল। 'ওঁর বাবা আজ রাত্রে ফিরবেন। উনি আপনাকে বলছেন অন্ধকার হলেই পাশ-দরজায় যেতে। আপনার জন্য ইন্তাজার করবেন।'

আবার প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা হবে। হৃদয় নেচে উঠল। কিন্তু জানতাম, এইই শেষ দেখা। ভেবে অসহ্য লাগল। তাছাড়া ওকে মিথ্যে বলতে হবে। ওর বাবা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে জানতে পারলে ওর স্বাস্থ্য এমন কি ওর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হবে।

তাড়াতাড়ি রাত হয়ে এল। আমাদের ভবিষ্যতের মতোই কালো রাত্রি। মহালের উঁচু বাইরের দেয়াল বরাবর আস্তে আস্তে চললাম নির্দিষ্ট জায়গার দিকে।

পাশ-দরজায় পৌঁছবার সঙ্গেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। পরনে সাটিনের কালো পোষাক, অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে! মাথা অনাবৃত, বেণী না বাঁধা চুল কালো ঢালে নেমেছে হাঁটু পর্যন্ত।

তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার আগেই সে আমার কব্জি চেপে ধরে দেয়ালের কাছে টেনে নিল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম, বিবর্ণ নিস্পন্দ।

খুসিমুখে ও বলল, 'বাবাকে কী বলেছেন শুনেছি। বেশ চালাকের মতো

বলেছেন। মনে হল আপনাকে বাবা বুঝেছেন, আর মনে মনে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেটা সহজে স্বীকার করতে তো পারেননি, তাই আপনাকে ঘটক পাঠাতে বললেন। কবে যাচ্ছেন? কবে ঘটক পাঠাবেন? এখনো এখানে রয়েছেন কেন? বাবার সঙ্গে কথাবার্তার পরেই যদি যেতেন তাহলে এতদিনে আপনার ঘটক সব ঠিকঠাক করে ফেলত। শুভ কাজে দেরি করা উচিত নয়, "দেরি করলে ফসকে যায়," প্রবাদ আছে।'

আমাকে বলা অছির কথায় বিশ্বাস করেছে, পরিষ্কার বোঝা গেল। সব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু জানালাম কেন তখনো যাইনি।

'তক্ষুণি চলে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করা উচিত, তাই নয়?'

'বেশ। এখন তো আমার সঙ্গে কথা হল, আমার সম্মতি পেলেন। কবে যাচ্ছেন?'

'তোমার বাবা ফিরে এলেই তাঁর মত নিয়ে রওনা হবো।'

'বাবা তো এলেন বলে। সিতোরাকে নজর রাখতে বলেছি। ঘোড়ায় চেপে ফটকে এলেই ও গলা খাঁকারি দেবে। একটা ভালো খবর আছে। বাবা আপনার জন্য নতুন একটা আলখাল্লা, একটা টুপি আর একটা পাগড়ি করিয়েছেন। মনে হচ্ছে ভাবী জামাইকে ঘটকের কাছে পাঠাবার আগেই সাজগোজ করাতে চান।'

যে বেশভূষা ওর কাছে শুভ লক্ষণ মনে হয়েছে তা আর কিছু নয়, পাদুকা রহস্য গোপন রাখার দাম। কিন্তু ওকে হতাশ করার ইচ্ছে হল না, ভালো খবরের জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

'কাল সকালে তোমার বাবাকে বলবো আমি যাচ্ছি।' আমার চোখে জল এসে গেল। হাত ছাড়িয়ে এক পাশে সরে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও যেতে দেবে না আমাকে, আরো কাছে সরে এল। দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরলাম। তখন ও দেখল আমি কাঁদছি।

'কাঁদছেন কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'চোখের জল ফেলার মতো কিছু তো আর নেই।'

'যেতে হবে বলে কাঁদছি। আমাদের মধ্যে দশ ক্রোশের ব্যবধান হবে।'

'কাঁদা আমারি উচিত, আপনার নয়। ছাড়াছাড়িতে আপনার চেয়ে আমার বেশি কষ্ট, কারণ আমি তো অপেক্ষায় থাকব। কিন্তু আমি হতাশ হয়ে পড়ছি না, কেননা সুদিনের আশা আছে। আপনি বেটাছেলে, বেটাছেলের মতো হন।'

আমার কান্না থামল না, তাই ঠাট্টা করে ও বলল, 'আপনি না থামলে আমিও কান্না জুড়বো। তখন দেখবো আপনার কেমন লাগে।'

বুকে আমাকে চিপে রইল ও। পরমুহূর্তে সিতোরার গলা খাঁকারি কানে এল। প্রিয়তমা তাড়াতাড়ি চুমু খেয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, 'তাহলে আসি। ঘটক পাঠাতে দেরি করবেন না, আর তার পিছু পিছু চলে আসবেন! আপনার অপেক্ষায় থাকব।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সব শেষ।

পরের দিন সকালে বোখারায় রওনা হলাম।

জানতাম বুড়ো শয়তানটা আমাকে কিছুতেই আমল দেবে না, তবু সহরে পেৌঁছিয়েই ঘটকের খোঁজ শুরু করলাম। ঘটক একজনকে পাঠাতেই হবে, নইলে মেয়েটি ভাববে আমি বেইমান। তার চোখে অবিশ্বাসী হতে চাইনি।

ঘটক পেলাম একজন। শেখরানগেজ পরিবারের খোজা। তাকে পাঠালাম -- অছির মনোমত সে 'খানদানী বংশের মানী লোক'।

পরের দিন ঘটক ফিরে এল, বাজারে অগছানো গরুর মতো ঢিমে চাল, ঠিক সেরকম ক্লান্ত বিমর্ষ মুখ। দীর্ঘ যাত্রায় ততটা বিষণ্ণ হয়নি যতটা হয়েছে যে অপমানজনকভাবে অছি তাকে ভাগিয়ে দেন তাতে।

অছি ঘোষণা করেন, 'এরকম বোকামি কখনো করব না আমি। আমি এমন জামাই চাই যে বিয়েতে পুরো এক সপ্তাহ ধরে আশেপাশের সমস্ত লোককে খানাপিনা করাবে, তাতে আমার মর্যাদা আরো বাড়বে।'

প্রত্যাখ্যানে অবাক হলাম না, ওটা তো আমি ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু

মনে হল ঘটককে আছি কী বলেছেন সেটা আড়ি পেতে নিশ্চয়ই মেয়েটি শুনেছে। তাই উবনী খোজার পরিবারের লোকদের কাছে দুর্ভাগা মেয়েটির খোঁজ নিলাম। তারা বলল সে পাগল হয়ে যায়, নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

মেয়েটির করুণ সমাপ্তিতে ভয়ানক আঘাত পেলাম। অবশ্য এরকম একটা জিনিস যে ঘটবে বরাবর আমার আশঙ্কা ছিল। এবারে অসুখে পড়লাম, মনে হল রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে খালি মাথায় মজনুর মতো কেঁদে কেঁদে ঘুরি। আমারো বুদ্ধিভ্রংশ শুরু হল। তারপর ভাবলাম বোখারার রাস্তা মজনুদের পক্ষে যথেষ্ট চওড়া নয়। ফিরে গেলাম দেশের পাহাড়ে। এক বছর লাগল অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে, দ্বিতীয় বছর গেল শক্তি ফিরিয়ে আনতে। আর এখন আবার আপনাদের মাঝে হাজির, বন্ধুগণ!'

মোল্লা বুরহানের কাহিনী শুনে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম আমরা। আমাদের মন ভালো করার উদ্দেশ্যে নাপিত মোল্লা রহমত মার্গেলানের একটি মেয়ের প্রেমে-পড়া এমন একজন সওদাগরের গল্প শোনালেন যার গোমস্তা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে মিলনস্থলে এসে তাকে বোকা বানায়।

গল্প শুনে সবাই হেসে উঠল।

রাত দুটো পর্যন্ত পার্টি চলল। বোখারায় এই প্রথম সাহিত্যানুরাগী লোকেদের সরস আলাপ শুনলাম। মাদ্রাসায় সাধারণত যা শোনা যায় তা থেকে অনেক তফাৎ। এঁদের তুলনায় আবদুসালম আর তার সহকর্মীদের মনে হল যেন লাস।

অতিথিরা উঠেছেন, আমাকে দেখিয়ে লাতিফজান মাখদুম আমার শিক্ষক আবদুসালমকে বললেন, 'যদি ওর মনে হয় মাদ্রাসায় স্থান সংকুলান হচ্ছে না তাহলে ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবেন। আমাদের সেবা করবে আর পড়াশুনো চালিয়ে যাবে।'

'বেশ,' বললেন আবদুসালম। পরের দিন আমি লাতিফজান মাখদুমের বাড়িতে উঠলাম। শেষ হল মাদ্রাসায় আমার দিন যাপন।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union